নারায়ণ সান্যাল

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদপট
কানাই পাল

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.

প্রীতিনিলয়েষু,

চিত্রজগতে তোমার আবির্ভাব এবং বাক্‌-সাহিত্যে আমার এই নতুন পদক্ষেপ সমসাময়িক। আমাদের জীবনের এ দুটি ঘটনাকে একসূত্রে বেঁধে দিতে চাই

। শ্রীশোভন লাহিড়ী ॥

রচনাকাল : শারদীয়া ১৯৫৯

অন্তর্লীনার অগ্রজ :

বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প (২য় মুদ্রণ)

বল্মীক

ব্রাত্য

মনামী

বাস্তুবিজ্ঞান (২য় সংস্করণ)

অন্তর্লীনার অনুজ

নৈমিষারণ্য

দণ্ডক শবরী (১ম ও ২য় পর্ব) (২য় মুদ্রণ)

হাতে আজ আর কোন কাজ ছিল না। য়ুনিভার্সিটি বন্ধ, এক যাওয়া যায় ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। কিন্তু কেন জানি ইচ্ছে করছে না আজ কোথাও যেতে। মেসের আর কটি ছাত্র গ্রীষ্মের ছুটি হতে যে যার বাড়ি চলে গেছে। একলা পড়ে গেছে কৃশানু। বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট যেখানে এসে থমকে থেমে গেছে ট্রাম-রাস্তার কোলাহল দেখে, সেখানেই ওদের দু-কামরার মেসবাড়ি। এক-তলায় একমাত্র দোকান—কাগজের আড়ত, ফটো-বাঁধাইওলা, আর একটা রেস্তোরাঁ। ঐ আপ্যায়ন-কেবিনের পাশের পলেস্তারা-খোলা পানের পিক-রঞ্জিত সরু একটা প্যাসেজ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে ভিতরের ছোট্ট উঠানে পৌঁছে। এক চিলতে একটু উঠান, কোণে একটা চৌবাচ্চা, অত্যন্ত পিচ্ছিল তার চারপাশ। পাশে কল—আধফালা একটা বাঁশের চোঙা লাগানো। ডান দিক দিয়ে উঠে গেছে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি—ভাঙা-শিক ফোগলা দাঁতের মত তার চেহারা। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে দো-তলায়। পাশাপাশি দুখানি ঘর দ্বিতলে। মোট চারজন মেম্বার। সবাই মফস্বলের ছেলে। স-কলেজের সুব্রত দাস ছিল মেসের ম্যানেজার। কৃশানুর রুমমেট। সুদর্শন বলিষ্ঠ চেহারা, মেসের চারটি প্রাণীর দায়িত্ব গ্রহণ করবার মত অন্ততঃ চওড়া ওর কাঁধটা—একেবারে বৃষস্কন্ধ না হলেও। পাশের ঘরে থাকে সমর আর সুখেন্দু। একজনের বি-কম, অপরজন ওরই সঙ্গে পড়ে।

এখন সব কলেজই ছুটি। যে যার দেশে চলে গেছে—মফস্বলের ছেলেরা যেমন যায়। কৃশানুর ও বালাই নেই; অর্থাৎ দেশ তারও একটা আছে কিন্তু দেশে যাবার তাগিদ নেই—তাই পড়ে আছে মেস কামড়ে। আর আছে ওদের কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড রামনন্দন কাহার।

নিষ্কাজ সকালে মুখ হাত ধুয়ে কৃশানু গিয়ে বসেছে জানলার ধারে। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় একমুঠো নীল আকাশ, আর গলির ফাঁক দিয়ে চুরি-করা একচিলতে হ্যারিসন রোড। দু পাশের বাড়ির খাড়া

দেওয়ালের ফ্রেমে বাঁধানো রাস্তার একটা খণ্ডাংশ। দূর আকাশে ভাসছে দু-একটা চিল। চক্রাকারে পাক খেয়ে ঢুকছে ঐ একচিলতে আকাশের রঙ্গমঞ্চে, আবার পাক খেতে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে খাড়া দেওয়ালের উইংসের আড়ালে।

এক পেয়ালা ধূমায়িত চায়ের কাপ আর খবরের কাগজটা নামিয়ে রাখে রামনন্দন। আর নামিয়ে রাখে খানকতক চিঠি। এই এক বাড়তি কাজ হয়েছে কৃশানুর, চিঠিগুলি আসে ওর বন্ধুদের নামে। ঠিকানা কেটে সেগুলি পুনর্নির্দেশিত করতে হয়।

রামনন্দন চলে যাচ্ছিল—তাকে ফিরে ডাকে কৃশানু, তোর চিঠি আছে একখানা।

চিঠিখানা হাতে নিয়েও রামনন্দন চলে যায় না। কৃশানু ততক্ষণে খুলে ফেলেছে খবরের কাগজের প্রথম পাতাটা। আড়চোখে ওকে একবার দেখে নিয়ে ফের বলে,—কিছু বলবি?

জবাব দেয় না রামনন্দন। নীরবে বাড়িয়ে দেয় পোস্টকার্ডখানা। কৃশানু একটু অবাক হয়। মনিঅর্ডার লিখিয়ে নিতে রামনন্দন মাঝে মাঝে আসে বটে কিন্তু চিঠি পড়াতে কখনও বিরক্ত করেনি। ওর এক দেশওয়ালি ভাই এতদিন এ কাজটা করত। পোস্টকার্ডখানা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করে বুঝতে পারে কেন বেচারি ওর দ্বারস্থ হয়েছে। এবার হিন্দি হরফের বদলে বাংলায় লেখা চিঠি এসেছে রামনন্দনের দেশ থেকে। একটু অবাক হল কৃশানু। রামনন্দনের ঘর-সংসারের কথা মোটামুটি জানা ছিল তার। লোকটা কী চোখে ওকে দেখেছে বলা শক্ত—কিন্তু কৃশানুর প্রতি যে তার একটা পক্ষপাতিত্ব আছে এটা স্বীকার না করে উপায় নেই। সমর আর সুশ প্রায়ই এ নিয়ে ঠাট্টা করে, বলে, রামনন্দন কৃশানুর প্রেমে পড়ে গেছে! ঝোলের যে মাছখানা আকারের বড়, অথবা মুড়োটা প্রায়ই নামত কৃশানুর পাতে। তবে নাকি নিম্নমধ্যবিত্ত ছাত্রদের এ মেসে মাছ আসে সপ্তাহে দুদিন, আর এলেও প্রতি গ্রাসে মুড়ো খাওয়ার আকারে মাছ আসে, তাই সেটা রোজ টের পাওয়া যায় না। কিশুবাবুর তদবিরে কখনও ত্রুটি হত না রামনন্দনের তরফে। অনেক কর্মহীন সান্ধ্য অবকাশে সে এসে বসত কিশুবাবুর কাছে, গাঁয়ের গল্প করতে। পাটনার কাছে কি এক ফুলওয়ারি গাঁয়ে ওর বাস। ঘরে আছে ওর পঁচিশ বছরের বউ ফুলেশ্বরী, একটি ছেলে

আর গরু। এক বৃদ্ধা পিসিমাও ওর আশ্রিত। এসব গল্প সে কলকাতায় এসে শুনিয়েছিল একমাত্র তার কিশুবাবুকেই।

রামনন্দনের এবম্বিধ পক্ষপাতিত্বের একটা কারণও আছে অবশ্য। সেই কারণটার সন্ধান করতে হলে ওর চাকরি-জীবনের আদি ইতিহাস শোনাতে হয়। রামনন্দন বয়সে ওর চেয়ে বছর ছয়-সাতের বড়ই হবে। সে ছিল ভাগচাষী। জাতে ওরা কাহার। পর পর কবছর অজন্মায় ঋণগ্রস্ত হয়ে ভাগ্যান্বেষণে শেষ পর্যন্ত বেচারি চলে আসে কলকাতায়। বেকার অবস্থায় পথে পথে ঘুরছিল চাকরির সন্ধানে। তারপর একদিন সুপ্রভাতে এসে হাজির হল ওদের মেসে। প্রথমে এ লোকটিকে আশ্রয় দিতে রাজী হয়নি কেউ; কিন্তু আগের চাকরটা পূর্বরাত্রেই মাইনে হাতে পেয়ে কেটে পড়েছে। সকালবেলা ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। সমর উনানটা ধরাবার চেষ্টায় সকাল থেকে যে পরিমাণ হাওয়া করেছে তাতে শালগাছ উপড়ে পড়ার কথা, সুখেন্দু থলিটা নিয়ে বাজারে বেরিয়ে গেছে—আর ম্যানেজার সুব্রত দাশ কলতলায় দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ছে,—কাল রাত্রে কে কোন্ থালায় খেয়েছ হে, এসে ধুয়ে দিয়ে যাও।

সবাই বুঝতে পেরেছে আজ পার্সেন্টেজ রাখার নির্গলিতার্থ হচ্ছে পেটে কিল মেরে বেরিয়ে পড়া—ঠিক এমনই শুভলগ্নে এসে হাজির হল রামনন্দন কাহার, তার বিশাল বপুখানি বিনয়াবনত্র করে। লোকটি একটা কাজ চায়।

সুব্রতবাবু আপত্তি করেছিলেন, সমরও 'অজ্ঞাতকুলশীলস্য' বলে কি যেন এক চাণক্য শ্লোকও আওড়ে গেল, কিন্তু কৃশানু ওসবে কান দেয়নি। তারই আগ্রহে আর উৎসাহে শেষ পর্যন্ত বহাল করা হল ওকে। লোকটি আজও সে কথা ভোলেনি নিশ্চয়, সেই খাতিরেই এই শূন্যপ্রায় মেসেও একা কিশুবাবুর জন্যেই সে দেশে যাবার নাম করেনি।

হাত বাড়িয়ে পোস্টকার্ডখানা নিয়ে কৃশানু পড়ে শোনাল—"শ্রীচরণ-কমলেষু, তোমার মনিঅর্ডার পেলাম। এবার টাকা পাঠাতে বেশ দেরি করেছ তুমি। চিঠি দিতে এত দেরি কর কেন? প্রতি সপ্তাহে আমাকে একটা করে চিঠি দেবে। কলকাতা শহরকে আমার বড় ভয়। তোমার চিঠি না পেলে মন বড় চঞ্চল হয়। মাসান্তের ওই মনিঅর্ডার-কুপনের এক-চিলতে চিঠিতে কি আমার মন ভরে? মুংলির আর একটা বাচ্চা হয়েছে।

রামাওতার এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। পণ্ডিতজী বলছিলেন ওকে তাঁর পাঠশালায় ভর্তি করে দিতে—মাসে আট আনা করে লাগবে। আমাদের জীবনে যে অসুবিধা হয়েছে ও বেচারী কেন তা ভোগ করে? তবু আমার একার ইচ্ছাই তো সব নয়, তোমার মতামত জানিও।

"মুংলি রোজ সাত-সাড়ে সাত সের দুধ দিচ্ছে। দুধটা বিক্রি করেও কিছু পাচ্ছি। তুমি এ মাস থেকে আরও পাঁচ টাকা কম করে পাঠিও। যতদিন মুংলির দুধ হবে ততদিন আর কোন অসুবিধা নেই। তুমি বরং ওই টাকায় কিছু কিনে খেও। মেসের খাওয়াতে নিশ্চয়ই তোমার পেট ভরে না। আমার মনে হয় তুমি বোধহয় আরও রোগা হয়ে গেছ। শরীরের যত্ন নিও। আমরা সবাই ভালো আছি। রামাওতার আর তার ঠাকুরমা ভালো। আমিও। সহেলির বর কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। ওর মায়ের অসুখ হয়েছিল বলে। এখন সহেলির মা ভালো আছে—ওর বর দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে যাবে। আমার প্রণাম নিও—ইতি তোমার ফুলেশ্বরী।"

চিঠিখানা রামনন্দনের হাতে ফেরত দিয়ে কৃশানু বলে, কি রে, তোকে আমরা ভালো করে খেতে দিই না?

রামনন্দন লজ্জা পেয়ে বলে, ওকরাশে বাৎ ছোড় দিহ। পাগলি হ!

রামনন্দন চলে যায়।

খবরের কাগজে আর মন বসে না। ভাবুক প্রকৃতির মানুষ সে। শুয়ে শুয়ে ফুলওয়ারি গাঁয়ের একটি গৃহস্থালীর চিত্র আঁকতে থাকে। ফুটো-চাল এক কামরা একখানা ঘর। বারান্দার একটা পাশ গত বর্ষা থেকেই কাত হয়ে আছে। মাথা নীচু করে উঠতে হয় ঘুঁটের দাগে ভরা দাওয়ায়। প্রায়ান্ধকার খুপরিটায় ঢুকলে কয়েক মিনিট সময় লাগে চোখের ধাঁধাটা কাটাতে। তারপর নজরে পড়ে দড়ির চারপাইটা। গোটানো বিছানা। ওপাশে খানকয় পিতলের বাসন আর দড়িতে টাঙানো পিরাণ-শাড়ি। দাওয়ায় বসে একনাগাড়ে কাশছে রামনন্দনের বুড়ি পিসিমা। ন্যাংটো ছেলেটা খেলা করছে উঠানে আপন মনে। গোয়ালে শিং নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে মুংলি; তার গলায় বাঁধা ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে ঠুন্ঠুন্। ফুলেশ্বরী এইবার দুধ বেচতে বের হবে। ফেনায়িত দুধের বালতিটা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে সে ঘরে ঢোকে। কানে বড় বড় গোলাকৃতি মাকড়ি, হাতে রূপার মোটা বাজু। গলায় লাল পলার একছড়া মালা। মনে করা যাক ওটা রামনন্দনই

কিনে এনেছিল মজিলপুরের হাট থেকে । শহরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয় সে। ছিন্ন বসনখানি ছেড়ে শহরে যাবার উপযুক্ত একটি মাত্র শাড়ি এবার জড়িয়ে নেবে গায়ে।

হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ায় কৃশানু—যেন এইমাত্র কিছুতে কামড়েছে তাকে। মুখটা হয়ে ওঠে বেদনার্ত। অশান্তভাবে কিছুটা পায়চারি করে ছোট ঘরটিতেই। ইচ্ছে করছে নিজের গালেই টেনে এক চড় মারে! না, আর সাহস হচ্ছে না ফুলওয়ারি গাঁয়ের অসমাপ্ত ছবিটা আঁকতে। পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে অকারণেই বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

কৃশানুর জন্যে আমার দুঃখ হয়। আপনাদেরও হত, যদি জানা থাকত ওর বিচিত্র ইতিহাস। তা হলে ওর এই বিকৃত চিন্তাধারার জন্যে, অশান্ত মনের অন্তর্দাহে ওর এই মর্মপীড়ার জন্যে শুধু ঘৃণার বদলে হয়তো একটু সহানুভূতিও জাগত আপনাদের।

অতি শৈশবেই কৃশানু মাতৃহীন। বিমাতা ওকে মানুষ করেনি—সে বড় হয়ে উঠেছিল মতির মায়ের হাতে। বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী রাগী মানুষ। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন তিনি। প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকতেই প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করেছিলেন—কৃশানুর মাকে। আগের পক্ষের দুটি ছেলেও ছিল। কৃশানুর মাকে বিয়ে করে তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন একটু—প্রথম পক্ষের সঙ্গে জীবনটাকে কি করে খাপ খাওয়াবেন বুঝতে পারেননি। সৌভাগ্যক্রমে বিড়ম্বনার হাত থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়ে গেল নববধূ প্রথম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়েই। ওঁর জীবনের এই দুটি বছরের চিত্তচাঞ্চল্যের ইতিহাসকে একেবারে অস্বীকার করতে পারলেই হয়তো প্রথম পক্ষের সঙ্গে পুনর্মিলনটা হত নিঃশেষে নিদাগ—কিন্তু উপায় ছিল না। একফোঁটা একটা বাচ্চা সারাদিন ট্যাঁ ট্যাঁ করে মনে করিয়ে দিত তাঁকে প্রৌঢ় বয়সে তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের লজ্জাকর ইতিবৃত্ত। মতির মা তাই সারাদিনই ওকে আগলে রাখত সবার দৃষ্টির আড়ালে।

এ সব কথা কেউ ওকে বলেনি। ও নিজেই আন্দাজ করেছে। পড়াশুনায় কিন্তু খুব ভালো ছেলে ছিল কৃশানু। বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পেয়েছে। বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কাছে সেটা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। বিমাতার ইচ্ছা ছিল বেশী লেখাপড়া না শিখে যা হোক কাজকর্মের

মধ্যে ও ঢুকে পড়ুক, কিন্তু ওদের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই ততদিনে চিনে ফেলেছেন ছেলেটিকে। নিঃসন্তান এবং বিপত্নীক ভদ্রলোক। জোর করে ওকে নিয়ে এসে রাখলেন তাঁর কাছে। তাঁরই প্রচেষ্টায় একদিন স্কলারশীপ নিয়ে প্রবেশিকা পাস করল কৃশানু।

তারপর কলকাতায় এসে এই ছটা বছর উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। সংসারের সঙ্গেই শুধু নয়, গ্রামের সঙ্গেও সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছে ক্রমে। শেষ বন্ধন ছিলেন হেডমাস্টারমশাই—তিনিও গত হয়েছেন বছর-খানেক। দুনিয়ায় তাই ওর কোন বন্ধন নেই। সকালে আর সন্ধ্যায় একগণ্ডা পড়ুয়ার কাছে বাঁধা রাখতে হয়েছে নিঃশ্বাস ফেলার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত। সিক্সথ ইয়ারে উঠে ওর ভাগ্য সম্প্রতি ফিরেছে একটু। ভালো একটি ছাত্রী পেয়েছে! অর্থাৎ ছাত্রী তাকে আশ্বস্ত করেনি, করেছেন তার বাবা, আরও সঠিক ভাবে তাঁর নিজে থেকেই অফার করা বেতনের অঙ্কটা। চলতি বাজারদর অনুপাতে যথেষ্ট বেশী। হয়তো বি. এ.তে ওর রেজাল্ট দেখেই এত বেশী মাইনে দিতে রাজী হয়েছিলেন ভবতারণ ঘোষাল। অর্থকৃচ্ছ্রতাটা অনেক কমে এসেছে। ক্লাস থেকে চলে যায় ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। সেখান থেকে হেঁটেই চলে যায় ঘোষাল সাহেবের হাজরা রোডের বাড়িতে। যদিও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়, তবু সান্ধ্য চা-জলখাবারটা সেখানেই সারে! প্রথম প্রথম একটু বাধো বাধো লাগত—তারপর সেটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। ইলা পড়ে গোখেলে; তার কাছেই শুনেছিল ভবতারণ ঘোষাল বিপত্নীক। ইলারা তিন বোন, ভাই নেই ওদের। বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, মেজ বোন এখানে থাকে না। প্রথম দিন খাবারের থালাটা যখন এলো তখন কৃশানু ভেবেছিল এটা পাঠালো কে! গৃহিণীহীন বাড়িতে এটা আশা করা একটু বিচিত্র নয়? মিস্টার ভবতারণ ঘোষাল বেঙ্গল পুলিসের একজন অত্যন্ত উঁচু মহলের অফিসার। হাজরা রোডে বেশ বড় বাড়ি হাঁকিয়েছেন রিটায়ার না করেই। সন্তান সংসার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংবাদ তিনি রাখতেন না। অথচ গৃহশিক্ষকের নিত্য আপ্যায়নের এ ব্যবস্থায় তাঁর সাংসারিক জ্ঞান আর বদান্যতায় কৃতজ্ঞ হয়েছিল সে। অর্থকৃচ্ছ্রতাটাও অধুনা কমেছে। মন দিয়ে পড়াশুনা করার সময় পাচ্ছে একটু। ফার্স্ট ক্লাসটা আশা করা অন্যায় হবে না তা হলে। এটুকু আত্মবিশ্বাস ওর আছে।

কিন্তু সমস্যা তো সেখানে নয়। সমস্যাটা ওর মনের গহনকোণে।

সেখানে ও নাগাল পায় না। কোথা থেকে কেমন করে এসব উদ্ভট চিন্তা ওর মনে জাগে তা ও জানে না, কিন্তু জাগ্রত মনকে সে সর্বদা সজাগ রাখে ঐ সব অশান্ত অশ্লীল চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

কৃশানু মাঝে মাঝে ভাবে—আচ্ছা, সকলেরই কি এমন হয়? ফুলস্পীডে ছুটন্ত মনের টাই-রড কি সকলেরই এভাবে কেটে যায়? স্টিয়ারিং হঠাৎ হয়ে পড়ে অকেজো? টলমল করে বেতালা ছুটতে থাকে বাঁধনহীন মনটা কোন গাছের গুঁড়িতে গিয়ে ধাক্কা খেতে? সে কথা কাউকে ও জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। বন্ধু বলতে যা বোঝায় তা নেই কৃশানুর।

তার একটা কারণ আছে অবশ্য। কৃশানু রীতিমত আত্মকেন্দ্রিক। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে আশপাশের মানুষকে এড়িয়ে চলতে শিখেছে, বাবাকে, মাকে, বৈমাত্রেয় ভাই তুটিকে। শৈশব থেকেই একা থাকতে ও অভ্যস্ত। স্কুলে ভর্তি হয়েও সে সঙ্গী পায়নি। ওর স্বভাবলাজুকতা আর আত্মকেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও হয়তো ছেলেরা ওকে টেনে নিত যদি না তুর্ভাগ্যবশতঃ ক্লাসে ও ফার্স্ট হত। ওরা মনে করল এটা স্বভাবলাজুকতা নয়, দাম্ভিকতা। ক্রমে একাকীত্বই ওর কাছে স্বাভাবিক জীবন বলে মনে হল। ছেলেবেলা থেকেই সহজাত একটা প্রতিভা ছিল ওর ছবি আঁকায়। সঙ্গীহীন অবকাশে সেদিকেই ঝোঁক পড়ল ক্রমে। পড়াশুনার অবসর সময়ে এখনও মাঝে মাঝে স্কেচ আঁকতে বসে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে ওর ঝোঁক নেই, মোহ নেই স্টিল্-লাইফে; ওকে আকৃষ্ট করে হিউম্যান-ফিগার, পোর্ট্রেট! ওর স্কেচের খাতায় শুধু মানুষের ছবি—ঝাঁকাওয়ালা মুটে, ফুটপাতের ধারে নিদ্রালস ভিখারী, ফেরিওয়ালা, মুচি, পথ-চলতি মানুষ।

সুখেন্দু বলত, তুই আর্ট কলেজে ভর্তি হ কৃশানু।

যোগেন বলত, হলেও লাভ নেই, অমন কানা আর্টিস্টের কোনো দাম নেই।

কানা আর্টিস্ট মানে?—জিজ্ঞাসু সুখেন্দুর প্রশ্ন।

মানে ও একচোখ দিয়ে তুনিয়ার 'ওয়ার্স-হাফটা'কেই দেখে। সত্যি কিনা ওই বলুক।

কৃশানু শুধু হাসত। জবাব দিত না।

ভবতারণ ঘোষাল বাংলা পুলিসের একজন উঁচুদরের অফিসার। ব্যক্তিগত

নৈতিক জীবন তাঁর খুব নিষ্কলুষ ছিল না;—অন্ততঃ যৌবনে রীতিমত উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন তিনি। তবু অফিসার হিসাবে তিনি সুনামই কিনেছেন। স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে বহুদিন—দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি। বড় মেয়ে ইভার বিয়ে দিয়েছেন শ্রীরামপুরের এক বনেদী জমিদারের ঘরে। সে বিয়ে সুখের হয় নি। জামাই ধনবান বাপের একমাত্র সন্তান, অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। লেখাপড়াও শিখেছে সে, কিন্তু ব্যাস-বশিষ্ঠের চেয়ে শ্বশুরের সঙ্গেই তার নৈতিক চরিত্রের সাদৃশ্য ছিল। ইভার শ্বশুর জীবনানন্দবাবুর অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু একমাত্র পুত্র সুকান্তকে তিনি বাঁধতে পারেননি। খেলাধূলায় সে চৌকস, অভিনয়ে তার প্রতিভার বিকাশ, শিকারে সে অব্যর্থ সন্ধানী—কিন্তু সংসারের ভিতরে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি। বাপের মত স্ত্রীর সঙ্গেও তার বনিবনাও হয়নি। মদ্যপানটাকে হয়তো সহ্য করতে পারত ইভা, কিন্তু তার অসামাজিক ব্যবহারে সে লজ্জিত বিরক্ত, ক্রমে মর্মাহত হয়ে উঠল। মতান্তর হল মনান্তর। কাদামাটির বদলে রক্তমাংসই আছে ইভার শরীরে। সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ইভা ফিরে এসেছে বাপের আশ্রয়ে। ঘোষাল সাহেব অবশ্য এখনও আশা রাখেন—এ শ্রাবণের মেঘ একদিন সরে যাবেই। কিন্তু ইভার ধারণা অন্য রকম। বাধাবন্ধনহীন সুকান্ত আরও অধঃপাতে যাবার সুযোগ পেয়েছে—সে নাকি তার বাপের সঙ্গেও সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে এতদিনে।

মেজ মেয়ে আইভিকে দার্জিলিঙে একটা কনভেণ্টে রেখে পড়াচ্ছেন। সিনিয়র কেম্ব্রিজ। ছোট মেয়ে ইলা থাকে বাপের কাছে। ইচ্ছা ছিল ইলাকেও তার মেজদির স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবেন, কিন্তু সম্প্রতি মধ্যমা কন্যার নামে কিছু জনশ্রুতি কানে আসায় তিনি মতটা বদলেছেন, স্থির করেছেন এবার বরং আইভিকেও কনভেণ্ট থেকে ছাড়িয়ে নিজের কাছে এনে রাখবেন।

ভবতারণবাবু অবশ্য সবকিছুর জন্যে নিজেকেই দায়ী করেন। বড় মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের যে মতবিরোধ তাও যেন তাঁরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যৌবনে তিনি ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ। থিয়েটার অথবা শিকারে অবশ্য ঝোঁক ছিল না—ছিল মদে আর আনুষঙ্গিক আর একটা কিছুতে। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁরও বনিবনাও হয়নি। ইভার মত সরমা অবশ্য স্বামী ত্যাগ করে তার আচারনিষ্ঠ বাপের কাছে ফিরে যায়নি। কিন্তু যুগটা পালটে গেছে,

ভাবেন ভবতারণ। ওঁরা যে যুগের মানুষ তখন তিল তিল করে এ অত্যাচার সহ্য না করে হয়তো উপায় ছিল না সরমার মত হতভাগিনীদের। এখন মেয়েরা অপেক্ষাকৃত আত্মনির্ভর। পতিদেবতার অবহেলা, আর অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়ার লক্ষহীরার যুগ এ নয়। তাই ইভাকে চলে আসতে হয়েছে স্বামীর ঘর ছেড়ে। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা চলে হয়তো, কিংবা হয়তো চলে না। ইভা ঠিক জানে না। কিন্তু এসব কেস কোর্টে উঠলে বড় বিড়ম্বনা। স্বামী কি তোমার গায়ে হাত তোলে? সে কি তোমার সঙ্গে শোয়? আদর করে? মারে? না, দরকার নেই বাপু। কিন্তু ওর ম্লান আত্মগত রূপ দেখে স্থির থাকতে পারেন না ভবতারণ—প্রতিনিয়তই মনে হয় এ বুঝি তাঁরই পাপের প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন।

ইভা বাপের উচ্ছৃঙ্খলতা পায়নি, পেয়েছে মায়ের স্নিগ্ধ-শান্ত মনের ছোঁওয়া। মনকে সে বাঁধতে জানে। সমস্ত সংসারের দায়িত্ব সে তুলে নিয়েছে অনায়াসে নিজের স্কন্ধে। বাপকে বলেছে ভুলে যেতে যে তার কোনদিন বিয়ে হয়েছিল। সময়মত বাড়ির ইলেকট্রিক বিল, বাপের জীবনবীমার প্রিমিয়াম দেওয়া থেকে শুরু করে লণ্ড্রির হিসাব পর্যন্ত রাখে সে। এদিক থেকে ভবতারণ নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন। এসব খবর কৃশানু ক্রমে জানতে পেরেছিল, তার নিত্য বৈকালী ভোগের উৎস সন্ধানের সূত্র ধরে।

আইভি কিন্তু একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে। ইভার সঙ্গে তার পার্থক্যটাকে শুধু আকাশ-পাতাল বললেও যেন যথেষ্ট হয় না —বলতে ইচ্ছে করে আশমান্ জমিন্! আকৃতি এবং প্রকৃতিতে ওরা যেন ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। ইভা যেন প্রবাল দ্বীপের অ্যাটল—গাঢ় নীল অচঞ্চল জলে মুখ দেখে এক আকাশ তারা, সার দিয়ে দাঁড়ানো স্থির নারকেলের গাছের সারি। সবার ছায়াই পড়ে ওর কাকচক্ষু জলে—কিন্তু অ্যাটল তাদের ধরে রাখে না। প্রতিবিম্ব শুধু ছায়া, কায়া নয়। রাতের অন্ধকারে মুছে যায় সেসব ছায়া নিস্তরঙ্গ অ্যাটলের বুক থেকে। ইভার মনেও তাই কেউ স্থায়ী আসন পাতে না। লবণাক্ত উদ্দাম সমুদ্রের আবেষ্টনীতে কেমন করে প্রবাল দ্বীপের এই কাকচক্ষু হ্রদ বাঁচিয়ে রেখেছে তার স্বাদু জলের শুচিতা, তার স্বাতন্ত্র্য, তার পবিত্রতা—সে প্রশ্নের কেউ জবাব দিতে পারে না। পারলে হয়তো জবাব দিতে পারত কালো কার্বন স্তূপের মধ্যে খনিগহ্বরের একান্তবাসী হীরের ছোট টুকরোটা।

আর আইভি যেন প্রবাল দ্বীপ বেষ্টনকারী উদ্দাম উচ্ছল সমুদ্র! বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্ষিপ্ত দু-বাহু আকাশে তুলে বারে বারে আছড়ে পড়তে চায় তটভূমিতে। কী সে চায়, তা সে নিজেই জানে না। হয়তো বিশ-ত্রিশ হাজার লীগ অতলের গোপন কন্দরে তারও লুকনো আছে অমূল্য রত্নরাজী—রত্নাকর সে, কিন্তু দুনিয়া তার সন্ধান পায় না। লোকে দেখে শুধু তার নিয়ত উচ্ছ্বাস, তার লবণাক্ত কটু স্বাদ, তার অশান্ত তরঙ্গভঙ্গ। তার রক্তের মধ্যে চঞ্চলতার নিক্কণ কান পেতে শুনেছেন ভবতারণ। চিনতে ভুল হয় নি তাঁর—দেখেছেন ওর রক্তে পৈতৃক ঝোড়ো হাওয়ার খেপামি। আইভি ক্ষণিকবাদিনী। সমগ্র জীবনের সত্য সে বোঝে না—তৌল করে প্রতি মুহূর্তটির বাস্তবতা। ওর গাঢ় মদিরার মত লাল রক্তে অন্তর্গূঢ় বহ্ন্যুৎপাতের যে গোপন সঙ্কেত শোনা যায়—ভবতারণবাবু জানেন—তার প্রথম শিখা জ্বেলেছেন তিনিই। যৌবনে যে অশান্ত কামনার বীজ মাথা চাড়া দেওয়ায় সরমা সরে গিয়েছিল নেপথ্যে, যে অশ্বত্থের চারাগাছটিকে নির্মূল করেছিলেন একদিন স্ত্রী-বিয়োগের মর্মান্তিক আঘাতে—আজ লক্ষ্য হয় ক্রমোসমের কোন ফাটল দিয়ে আবার মাথা চাড়া দিয়েছে সেই শিশু মহীরুহ আইভির মাধ্যমে। তাই আইভির নামে কোন কথা কানে এলে তিনি ওকে শাসন করতে পারেন না—অতীত যুগের ভবতারণ এসে দাঁড়ান ওঁর সামনে নতমস্তকে অপরাধ স্বীকার করে; ভবতারণ বিচলিত হন শুধু। দুটি মেয়ের দুর্ভাগ্যের তিনিই যেন 'প্রাইম মুভার'। দুটি মেয়ের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; চিন্তাধারা, জীবনদর্শন সবই পৃথক—তবু ওরা দুজনেই যেন প্রায়শ্চিত্ত করছে তাঁর পাপের। ইভা আর আইভি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মেয়ে। ইভা যেন পঙ্কিল পরিবেশে ফোটা নিষ্কলুষ কমলমণি—যদিও 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের সঙ্গেই তার চরিত্রের কিছুটা মিল। তেমনি আইভি দামোদরের লকগেট-ভাঙা দুরন্ত বন্যা—যদিও 'শেষ প্রশ্নে'র কমলমণির সঙ্গেই তার প্রকৃতির সাদৃশ্য।

ছোট মেয়েটির মন এখনও কাঁচা—ইলা যে কোন্ ছাঁচে গড়ে উঠবে বলা যায় না এখনও। দাদামশায়ের আচারনিষ্ঠা, মায়ের সর্বংসহা শান্ত সহ্যগুণ, বাপের যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা অথবা প্রৌঢ়ত্বের ফ্রাস্ট্রেসান—কোনটি যে তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে তা বলা যায় না এখনও। কিন্তু চোখের আড়াল করবেন না আর তাকে। আইভিকেও বরং নিয়ে এসে রাখতে হবে ওঁর কাছে!

হাজরা রোডের পিতলের নেম-প্লেট-আঁটা গেটটা পার হয়েই একটা ছোট বাগান। ক্যান্টিলিভার একটা পোর্টিকো। ঢুকেই ডানহাতি বড় বৈঠকখানা। বাহুল্যবর্জিত তার আসবাবপত্রের আয়োজন। তার পাশেই একখানা ঘরকে বলা হয় লাইব্রেরী। পাশাপাশি বই-ঠাসা আবলুস কাঠের আলমারি। জানলার 'সিলে' মানি-প্ল্যান্টের টব, পাশে ছোট টেবিলের উপর একটা জাপানী সেজবাতি। দু পাশে দুখানা খুরে-রবারের-নাল-লাগানো খাড়া-পিঠ চেয়ার। কৃশানু এখানে বসেই পড়ায় তার ছাত্রীকে। ঘরের সামনের কার্পেট-মোড়া করিডোরটা শেষ হয়েছে ডবল চাতালওয়ালা তিনমুখ-ফেরা 'ওপন্-নিউয়েল-স্টেয়ার কেসে'। কার্পেট মোড়া বারান্দার ও-প্রান্তে কোনদিন যায়নি কৃশানু—দ্বিতলেও নয়; কিন্তু ও-প্রান্তবাসিনী একজন প্রায়ই আসেন লাইব্রেরী-ঘরে—বই নিতে। আইভিকে কৃশানু কখনও দেখেনি। সে থাকে দার্জিলিঙে। ছুটিছাটায় নিশ্চয়ই আসে বাড়িতে, কিন্তু ছুটি হলে কৃশানুও বেরিয়ে পড়ে যেদিকে দু চোখ যায়। তাই ঘোষাল সাহেবের মধ্যমা কন্যাকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আজও। দেখেছে ইভাকে। অনায়াস গতিভঙ্গে সে প্রায়ই আসে লাইব্রেরীতে—চাবি খুলে বই নেয়, বই রাখে, ধীরপদে চলেও যায়।

কৃশানুর একটা চরিত্রগত দোষ মেয়েদের মুখের দিকে সে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। তাই ইলাকে পড়াবার অবকাশে যদিও ইভা বহুবার এসেছে এ ঘরে তবু তাকে ভালো করে দেখে নি কোনদিন। মনে আছে, ইভাই প্রথম উপযাচক হয়ে আলাপ করতে এসেছিল। প্রতিদিনের মত চাবি খুলে আলমারি থেকে বই নিয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই চলে যেতে যেতে হঠাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ইভা। অসতর্ক মুহূর্তে চমকে চোখ তুলেই দৃষ্টি নত করেছিল কৃশানু। ঐ এক ঝলকের দৃষ্টিতেই সে দেখতে পেয়েছিল মেয়েটিকে। শ্যামলা রঙ, জোড়া ভুরু, গভীর কালো দুটি চোখের দৃষ্টি—আর কিছু তার নজরে পড়েনি। চোখাচোখি হতেই কান দুটো লাল হয়ে উঠেছিল লাজুক কৃশানুর। মুখ না তুলেও বুঝতে পারে ইভা দেবী চলে যাননি ঘর থেকে।

নীরবতা ভেঙে ইলাই প্রথমে কথা বলে, বড়দি, আমায় কিছু বলবে?

একটু হেসে ইভা বলে, বলবই তো। কেমন কার্টসি শিখছ তুমি

মাস্টারমশায়ের কাছে? আমি প্রায়ই আসি লাইব্রেরীতে, অথচ এতদিনেও তোমার মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে না।

ইলা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাতের তালু দুটো উল্‌টে ফর্মাল ইন্‌ট্রোডাকসন করতে যাচ্ছিল বোধ হয়—তাকে থামিয়ে দিয়ে ইভা কৃশানুর দিকে ফিরে বলে, আপনার সঙ্গে যেচে ভাব করতে এলাম একটা বিশেষ গরজে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল কৃশানু : বলুন, বলুন।

প্রতিনমস্কার করেনি। কারণ চোখ তুলে সে দেখেইনি যে ইভার হাত দুটি বুকের কাছে নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করা। সে শুধু দেখেছিল হাভানা-ঘাসের চটিপরা একজোড়া শ্যামল চরণের অলক্তক রাগ, আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নেল-পলিশের জমাট কাল্‌চে-লাল রঙ। ঊনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর দুটি প্রসাধনচিহ্ন যুগল-প্রণাম করেছে ওর পদপ্রান্তে!

: এই টেবিল-ক্লথে একটা নক্‌শা এঁকে দিতে হবে।

টেবিলের উপর চতুষ্কোণ একখণ্ড আদ্দির কাপড় রাখে ইভা। কৃশানু এবার দেখে মকরমুখো গত শতকের রুলিপরা একখানা নিটোল হাত—চোখা করে আধুনিক ঢঙে কাটা আঙ্গুলের রক্তিম নখ, আর সর্বকালের দ্যুতিময় একটা সাদা পোখরাজের আংটি।

দৃষ্টি না তুলতে পারলেও জড়ভরত নয় কৃশানু, বলে, আমি আঁকতে জানি, তা জানলেন কেমন করে?

ইভা প্রতিপ্রশ্ন করেছিল, জহুরীরা জহর চেনে কেমন করে?

এবারকার প্রত্যাশাটাও ব্যর্থ হল ইভার। মনে হল, বৈকালিক প্রসাধনটার সত্যই কোন প্রয়োজন ছিল না বুঝি। নতনেত্র কৃশানুকে আবার বলে : ইলার বন্ধুর জন্মদিনে যে ছবিখানা সে উপহার দিয়েছে, তার কথা বাড়ির সবাই জানে। বাবা পুলিস-অফিসার হলে কি হয়—একজন চিত্রদরদী মানুষ তিনি। উনি তো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন। সত্যি হিংসে হয় আপনাকে।

কৃশানু জবাব দেয় নি।

এবার বোধ হয় একটু আহত হয়েই ইভা বলে, আপনাকে অসুবিধার ভিতর ফেলছি না তো?

না না—সে কি?—কাপড়ের টুকরোটা তুলে নেয় কৃশানু।

করে বাপের বাড়িতে, তার প্রতি সহানুভূতি জাগাই স্বাভাবিক। কৃশানু এও লক্ষ্য করেছিল—বড় একটা বাড়ির বাইরে যেত না ইভা। এটা ওদের সমাজের পক্ষে দৃষ্টিকটু, অস্বাভাবিক। সম্ভবতঃ কৌতূহলী সোসাইটি গার্লদের প্রশ্নবানের হাত এড়াতেই ইভা বেছে নিয়েছিল এই স্বেচ্ছাবন্দী অন্তেবাসীর জীবন। হয়তো ইভার সেই অসহায়তার জন্যেই কৃশানু সহ্য করত ওর বিদ্রূপের শ্লেষ। প্রায় প্রতিদিনই ইলাকে পড়াতে পড়াতে লক্ষ্য করত, ইভা যথারীতি এসে আলমারি খুলে বই রাখছে, বই নিচ্ছে। মাঝে মাঝে ইভাই আলাপ শুরু করত কোন একটা সূত্র ধরে—সেদিন বই নিয়ে ফিরে যেতে দেরি হত তার। যেদিন করেনি সেদিন নীরবেই চলে যেতে হত তাকে। কৃশানু সাহস করে ওকে ডেকে কোন কথা বলেনি কখনও।

একদিন, মনে আছে কৃশানুর, সন্ধ্যেবেলা গিয়ে শুনেছিল ইলা বাড়ি নেই, কোন মাসির বাড়ি গেছে বুঝি। চাকরের মুখে এই খবরটা শুনেই ফিরে যাচ্ছিল সে। পোর্টিকো পার হয়ে লাল কাঁকরের পথটায় নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল তাকে। চাকরটা নেমে এসে খবর দিল, বড়দিদিমণি আপনাকে ডাকছেন।

ও, আচ্ছা। চল।

ফিরে এসে দেখে লাইব্রেরী ঘরে দাঁড়িয়ে আছে ইভা। তার এক হাতে স্টেনলেস স্টীলের রেকাবিতে সাজানো কিছু লুচি ও মিষ্টি, অন্য হাতে একটা গ্লাসে জল। ওর দিকে আজ না তাকিয়ে পারে নি কৃশানু। জোড়া ভ্রূর মাঝখানে একটা কুমকুমের ছোট্ট টিপ—দু' পাশে দুটি অতল গভীর কালো চোখের তারা নির্নিমেষে চেয়ে আছে ওর দিকে। বিজয়িনীর দৃষ্টি!

হালকা চাঁপা রঙের একখানা সিল্কের শাড়ি পড়েছে ইভা, আগুন রঙের আঁটো ব্লাউস চেপে বসেছে গায়ে! নিটোল দুটি হাতে দুগাছা মোটা মোটা রুলি, গলায় সরু একটা মফচেন— আগ্নেয়গিরি বেষ্টন করে নেমে আসা যুগল লাভাস্রোতের মতো মফচেনের দ্বিধারা এসে মিলিত হয়েছে যেখানে সেখানে ওর মনের কামনা যেন জমাটবাঁধা রক্তের মত ফুটে উঠেছে একখণ্ড চৌকো দার্জিলিঙ পাথরে!

এই প্রথম পূর্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল কৃশানু।

ইভা বিজয়িনীর হাসি হেসে বললে, ছাত্রী পালিয়েছে দেখে এত রাগ কেন বাবুর?

যে সুরে কথা কটা উচ্চারণ করে, তাতে যেন অতি পরিচয়ের ছোঁওয়া লেগে আছে। অতি নিকট-আত্মীয়কে ঐ সুরে কথা বলে মেয়েরা। ইভার দৃষ্টিতেও ফুটে উঠেছিল আত্মপ্রত্যয়ের হাসি—বিশ্ববিজয়িনীর। কিন্তু সে হাসি স্থায়ী হয়নি। ওর কাজলকালো চোখের পর্দায় অতিদ্রুত কতকগুলো ভাবের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে পর পর। 'মণ্টাজ-এফেক্টে'র অসংলগ্ন চিত্র যেন, যার আপাত অর্থ দুর্বোধ্য কিন্তু সবটা মিলিয়ে যার একটা মানে হয়। ইভার হাসি মিলিয়ে যাবার আগেই সুপার ইম্পোস হল একটা বিস্ময়ের অভিব্যক্তি আর সেই বিস্ময়ের ব্যঞ্জনাটা ভালো করে না মেলাতেই প্রক্ষিপ্ত হল একটা আতঙ্কের আভাস! তাড়াতাড়ি খাবার আর জলটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ইভা বলে, আপনি বসুন আমি এখুনি আসছি।

চলে যায় ইভা।

কৃশানু বসে পড়ে একটা চেয়ারে। একটা ছিছিকারে তার অন্তঃকরণ পূর্ণ হয়ে গেছে ততক্ষণে। একটা বোবা কান্না যেন উঠে আসছে ওর কণ্ঠনালী বেয়ে। কী অসহায় সে! মনে মনে একটা অদৃশ্য শত্রুর মুখে ঘুষির পরে ঘুষি চালায় কৃশানু।

মিনিট পাঁচেক পরে ইভা যখন ফিরে এল ঘরে তখন বাঁ কাঁধের আঁচলটাই শুধু ঘুরে আসে নি ডান কাঁধের উপর দিয়ে, হঠাৎ বাতাসটা ঠাণ্ডা বোধ হওয়ার জন্যই বোধ হয় একটা কাশ্মিরী হাফ আলোয়ান জড়িয়ে এসেছে গায়ে। বৈশাখের সেটা আঠারো তারিখ।

প্রয়োজন ছিল না। কারণ টেবিলের উপর তেমনিই পড়ে আছে খাবারের থালাটা। অতিথি চলে গেছে নীরবে।

পরের দিন দুই অসুস্থতার অজুহাতে পড়াতে আসেনি কৃশানু। কলেজ থেকেই টেলিফোন করে দিয়েছিল। অজুহাত কথাটা ঠিক নয় অবশ্য, সত্যই অসুস্থ ছিল সে। মানুষের সুস্থতা কি শুধু থার্মোমিটারের পারা আর ব্লাড-প্রেসারের যন্ত্রই ধরতে পারে? পুরো দুটি দিন তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে অসুস্থ মনের সঙ্গে। অনেক দিন পরে এবার আক্রমণ হয়েছে তার। ওর মনের কোন গভীর কন্দরে আত্মগোপন করেছে শত্রুটা। তার সন্ধান সে পায় না, পাবেও না বোধ হয় কোন দিন। মাঝে মাঝে মনের গুপ্ত গুহা থেকে

যাপ মারে সেই গুনীন—ওর চোখে বুলিয়ে দেয় যাদুকাঠির স্পর্শ। রঞ্জনরশ্মির মত প্রত্যঙ্গকে হঠাৎ পার করে ও দেখতে পায়।

সেদিনও হয়েছিল সেই আক্রমণ। হঠাৎ ইভাদেবীর চাঁপারঙের সিল্কের শাড়িটাকে মনে হয়েছিল কাচের, ব্লাউজটা কর্পূরের মত উপে গিয়েছিল—অন্তর্বাস আর অধোবাস দুটিকে মনে হয়েছিল সেলোফেনের তৈরি। গঁগা অথবা টিশিয়ানের মডেলের মত নিরাবরণ শ্যামলারঙের একটি নারীমূর্তি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল ওর দৃষ্টির সম্মুখে।

এই ওর রোগ। ক্রনিক মানসিক ব্যাধি!

কাউকে এ কথা বলা যায় না। নিজে নিজেই লাইব্রেরী থেকে মনোবিজ্ঞানের বই এনেছে, পড়েছে। নিজেই রোগনির্ণয়ের চেষ্টা করেছে। বুঝেছে ওর নির্জ্ঞান মনে নিশ্চয় গোপন আছে এমন কোন কামনা যার বহিঃপ্রকাশ হয় এইভাবে! পুরো দুটি দিন তারসঙ্গে লড়াই করে খানিকটা মানসিক স্থৈর্য ফিরে পাওয়ার পর তৃতীয় দিনে সে এসেছিল আবার ছাত্রীকে পড়াতে।

ইলা সলজ্জে ক্ষমা চেয়েছিল। ছুটি না নিয়ে মাসীর বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার অপরাধে। ওর মাসিমা থাকেন পশ্চিমে—হঠাৎ দুদিনের জন্য এসেছেন, টেলিফোন করে ইলাকে ডেকে পাঠান। মাস্টারমশায়ের কাছে ছুটি নেওয়া নেই বলে প্রথমে ও যেতে রাজি হয়নি; কিন্তু বড়দিই একরকম জোর করে ওকে পাঠায়। বড়দি ওকে আশ্বাস দিয়েছিল মাস্টারমশাইকে ব্যাপারটা সেই বুঝিয়ে বলবে।

কৃশানু হেসে বলে, আরে, না না। আমি রাগ করিনি। মাসিমা ডাকলে যেতে তো হবেই।

কিন্তু ছুটি নেওয়া ছিল না যে আমার?

তাতে কি হয়েছে?—দ্বারের নেভী ব্লু পর্দার নীচে ঘাসের চটিপরা দুটি পা আগেই নজরে পড়েছে কৃশানুর, তাই হালকা করে বলে, জান ইলা, ছুটি দুরকমের। একটা হল আর্নড-লীভ; তুমি যদি খুব ভালো পড়া বলতে পার তাহলে আমি তোমাকে দু' একদিনের ছুটি দিতে পারি। সেটা হবে তোমার আর্নড-লীভ। আর হঠাৎ কোন কারণে যদি না পড়তে বসতে পার তাকে বলব ক্যাজুয়াল-লীভ—গত মঙ্গলবার যা তোমার হয়েছিল।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে ইভা। বলে, মাস্টারমশাই তোমাকে সবটা

বললেন মি ইলু। ছুটি আসলে তিন রকমের, তৃতীয় রকমের ছুটি নেয় মানুষে শুধু ফাঁকি দেওয়ার আনন্দে, তাকে বলে ফ্রেঞ্চ লীভ। তার উদাহরণও আমি দেখাতে পারি।

ইভা সে কথায় কান দেয় না। মাস্টারমশাই যে রাগ করে নেই এটাই ওর কাছে বড় কথা। বলে, প্রথম যখন কেষ্ট বলল মাস্টারমশাই না খেয়েই চলে গেছেন, তখন সত্যিই ভীষণ ভয় হয়েছিল। তারপর বড়দির কাছে শুনলাম যে কেষ্ট ভুল বলেছে, আপনি রাগ করেননি, খাবারও খেয়েছেন, তখন প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

কৃশানু চমকে ওঠে! সে দিন খাবার খেয়েছে সে? এই কথা বলেছে ইভা? কেন? অপরিসীম কৌতূহলে এবার সে ইভা দেবীব দিকে চোখ তুলে তাকায়।

আর তাকিয়েই তার হৃদয় আনন্দে যেন হাততালি দিয়ে ওঠে। না, তার দৃষ্টি বিশ্বাসঘাতকতা করছে না, আর পাঁচজন যা দেখত সেও তাই দেখছে। তার চোখেব রেটিনাতে যে ছবি পডছে ঠিক তাই দেখছে সে, প্রত্যক্ষকে-পার-করা রণৎজেন রশ্মির দৃষ্টি কোন মোহাবেশ স্বষ্টি করছে না।

সে স্পষ্ট দেখছিল চাঁপা রঙের শাড়ি-পরা ইভা খাবারের থালা হাতে এসে দাঁড়িয়ে আছে অনতিদূরে। ডীপকাট্ আগুনরঙের জ্যাকেটটা চেপে বসেছে ওর পুরন্ত গায়ে। নিটোল দুটি হাতে দুটি মোটা রুলি, গলায় সরু একটা মফচেন। প্রতিমার যুগল-চরণেব মাঝখানে যেমন আটকে থাকে রাঙাজবা তেমনি দুলছে বুকের উপত্যকায় সোনা-বাঁধানো টকটকে লাল একটা দার্জিলিঙ-পাথব।

পূর্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়েও কোন চিত্তচাঞ্চল্য বোধ করল না কৃশানু। এভারেস্ট চূড়ায় দাঁড়িয়েও এতটা উৎফুল্ল হয়নি তেনজিং। স্বাভাবিক, আর পাঁচটা ভদ্রলোকের মতই স্বাভাবিক কণ্ঠে ইভার চোখের উপর দৃষ্টি রেখে কৃশানু বললে, কিন্তু বোজ রোজ আমাকে এখানে জলখাবার খেয়ে যেতে হবে, এটাই বা কি কথা?

ইভা হেসে বলে, রোজ রোজ তো নয়, কাল খাননি, পরশুও খাননি—

তরশু?

তরশু অবশ্য খেয়েছিলেন।

খেয়েছিলাম ?

ইভা একটু বিব্রত হয়ে বলে, পারি না আপনার সঙ্গে নাগাড়ে তর্ক করতে। আমার বইটা এনেছেন ?

ইভাকে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সভ্যা করে দিয়েছে কৃশানু। ওর বাবার আলমারীর যে সব বই ওর বুদ্ধির আর রুচির উপযুক্ত, প্রায় সবগুলিই পড়ে ফেলেছে ইভা। আজকাল তাই কৃশানু লাইব্রেরী থেকে ওর জন্যে বই নিয়ে আসে। ইভারই নির্দেশে।

খাওয়া শেষ হতেই ইভা বলে, এক গ্লাস জল নিয়ে এস তো ইলু।

ইলা জল আনতে চলে যেতেই কৃশানু বলে, ওকে কেন মিথ্যা বললেন ?

ইভা নতনেত্রে বলে, সেদিনকার আচরণের জন্য আমি লজ্জিত, আপনি আমায় মাপ করবেন।

কৃশানুর কথা ফোটে না। মাপ যদি কাউকে চাইতেই হয়, তাহলে তারই চাওয়া উচিত। নির্জন ঘরে সে যে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল একটি অনাত্মীয়া মহিলার দিকে সে দৃষ্টি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নয়—না হলে অনেক ক্লাব-পার্টির অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ইভা অমন ছুটে পালিয়ে যাবে কেন ? কি একটা কথা বলবার উপক্রম করতেই ইভা বলে, থাক। ও প্রসঙ্গটা আমরা তুলব না। ধরে নেওয়া যাক সেদিন সন্ধ্যায় কোন ঘটনাই ঘটেনি।

কৃশানু পূর্ণচ্ছেদ টেনেছিল এ প্রসঙ্গে, ধরে নিলাম।

দিন পনের বাদে রামনন্দন কৃশানুর হাতে তুলে দিল আবার একখানা চিঠি। এবার আর পোস্টকার্ড নয়, ইনল্যাণ্ড খাম। প্রথমটা খেয়াল হয়নি, তারপরেই মনে পড়ল ওর। দিনকতক আগে রামনন্দনের একটা চিঠির জবাব লিখে দিতে হয়েছিল তাকে। এখানা তারই জবাব।

'শ্রীচরণকমলেষু, তোমার পোস্টকার্ড পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। এবার খুব লক্ষ্মী হয়েছ দেখছি, চিঠি পেয়েই জবাব দিয়েছ। কলকাতা শহরকে ভয় পাই বলাতে অত ঠাট্টা কিসের ? পাটনাও বড় শহর, সে জন্যে বলিনি। তবে শুনেছি কলকাতায় নাকি অনেক মায়াবী আছে। তারা নাকি মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখে। তাই ভয় পেয়েছিলাম মাত্র।

দুধের কথাটা তোমার না লিখলেও চলত। ভুলে যেও না, তুমি যেমন রামাওতারের বাপ আমিও তেমনি তার মা। ওই দুধের বাছাকে বঞ্চিত

করে সমস্ত দুধটা আমি বিক্রি করছি, এ কথা ভাবতে পারলে কি করে তুমি? কিন্তু রামাওতার কি সাত সের দুধ খেতে পারে?

বাংলা হরফে চিঠি পেয়ে অবাক হয়েছ, লিখেছ। কিন্তু অবাক হবার কি আছে? বাঙালী কোথায় নেই? নাগরি হরফের চিঠি পড়াতে তোমার অসুবিধা হতে পারে মনে হওয়ায় বাংলা জানা একজনের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর সম্বন্ধে অত কৌতূহল কেন?

মেসের খাওয়া নিয়েও খোঁচাটা না দিলেই পারতে। আমি তো বলিনি যে মেসের বাবুরা তোমাকে খেতে দেন না। তুমি হয়তো মেসের কোন বাবুকে দিয়েই চিঠিখানা পড়িয়েছ, আর জবাব লিখিয়েছ, তাই হাটের মাঝে পড়া কথাটা তাঁর গায়ে বেজেছে। না হলে কোন বক্রোক্তিই করিনি আমি।

আমাদের এখানে এখনও বর্ষা নামে নি। লু বন্ধ হয় নি আজও। কবে যে বর্ষা নামবে তাই ভাবছি। তোমার কথামত রামকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিলাম। যদুনন্দন, তেওয়ারীজী, সহেলী, পীতম, ভগলু সবাই ভালো আছে। ভগলু বলছিল এবার সে বউ আনতে যাবে। কিন্তু তার ইচ্ছা তুমি এলে 'বরাতের' ব্যবস্থা করা। ভগলু জানতে চেয়েছে তোমার পক্ষে শীঘ্র আসা কি সম্ভব হবে? এখন তো গ্রীষ্মের ছুটি চলছে কলকাতার স্কুল কলেজে। তোমাদের মেসের মুখপোড়া বাবুদের কি ঘরদোর বলে কিছু নেই, ছুটিতে বাড়ি গেলেই তো পারে তারা। আমার প্রণাম নিও, ইতি তোমার ফুলেশ্বরী।'

চিঠিখানা পড়ে মনে মনে খুব হেসেছিল কৃশানু। কে এই সুরসিক লিপিকার? ফুলওয়ারি গাঁয়ে কোথা থেকে আবিষ্কার করল তাকে রামনন্দনের প্রোষিতভর্তৃকা? ভাল করে লক্ষ্য করে সে চিঠিখানা। গোটা গোটা মেয়েলি হাতের লেখা। রামনন্দনকে প্রশ্ন করে জানা গেল, না, ওর গাঁয়ের ত্রিসীমানায় কোন বাঙালী নেই। কাকে দিয়ে লেখায় তা রামনন্দন কি করে জানবে?

কল্পনাবিলাসী কৃশানু কৌতুক বোধ করে, কৌতূহলও হয় তার। নিঃসন্দেহে চিঠির লিপিকার একজন বাঙালী মেয়ে। বাঙালী,—না হলে এমন সুন্দর বাংলা লেখা সম্ভব নয়। কোন অবাঙালীনীর পক্ষে মুখপোড়া গালের এমন মধুর প্রয়োগ কল্পনাতীত। মেয়ে নিশ্চয়, না হলে ফুলেশ্বরী কেমন করে বরের

চিঠি পড়াতে যাবে? কিন্তু কে এই মেয়েটি, অথবা মহিলাটি? কেমন করে হাজির হল সে ঐ ফুলওয়ারি গাঁয়ে?

পরের দিন রামনন্দন একটি সাদা পোস্টকার্ড হাতে করে এসে দাঁড়ায়। কৃশানু লিখতে থাকে রামনন্দনের নির্দেশমত। লেখা শেষ হলে রামনন্দন হাত বাড়ায়। কৃশানু বলে, থাক, ঠিকানা লিখে আমিই দিয়ে দেব ডাকবাক্সে।

তারপর রামনন্দন নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলে পোস্টকার্ডটা সে ছিঁড়ে ফেলে। একটা চিঠির কাগজে সে আবার লেখে রামনন্দনের বক্তব্য, তারপর আরও লেখে—'মায়াবী কি শুধু কলকাতাতেই আছে ফুলেশ্বরী, মেয়েমানুষ জাতটাই মায়াবীর জাত। দেখছ না সাড়ে তিনশো মাইল দূর থেকেও কেমন বঁড়শি ক্ষেপন করে লক্ষ্য করে জালে পড়া মাছের ছটফটানি?...তুমি ঠিক আন্দাজ করেছিলে, আমাদের মেসের বাবুকে দিয়েই লিখিয়েছিলাম চিঠিখানা। বাবুর ভারী গর্ব জবরদস্ত চিঠি লিখিয়ে তিনি। এতদিনে টের পেয়েছেন তাঁরও জুড়ি আছে।..তা সে যাই হোক এ হতভাগ্য বাবুর গোটা মুখটা না হলেও কপালটা সত্যিই পোড়া। তিনকূলে কেউ নেই যেখানে গিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিটা কাটিয়ে আসতে পারে। সেই দগ্ধললাটবাবুর জন্যেই পড়ে আছি মেস কামড়ে। না হলে এই ছুটিতেই ছুটে যেতাম যেখানে আমার বিরহিণী ভগলুর 'বরাতে'র ছল খুঁজছে।...তাই বলছি ফুলেশ্বরী, যেতে আমি পারি, কিন্তু ভগলুর পুনর্যাত্রা উৎসবেই শুধু যোগ দিতে নয়। যদি তুমি সত্যি কথাটা স্বীকার কর আগামী ডাকে। আসলে তোমারই মন কেমন করছে আমার জন্য, তাই নয়? পরের ডাকে এই সত্যি কথাটা স্বীকার করলে আমি আমার মেসের বাবুকে গিয়ে ধরে পড়ব। বিশ্বাস আছে বাবু ছুটি দেবেন; কারণ বাবু জানেন কলকাতার মেসের বাবুরা দগ্ধানন হলেও ফুলওয়ারি গাঁয়ের যাবতীয় স্ত্রীরত্নের মুখপঙ্কজ অনিন্দ্য!

একটা কথা। অনেক আজে বাজে কথা লিখি চিঠিতে। পদাধিকার-বলে যিনি তোমার লিপিকার তাঁর পদটা কি ট্রান্সফারেবল? সেটা জেনে রাখা ভাল, না হলে নূতন লিপিকার এ চিঠির মর্মোদ্ধার করতে তো পারবেনই না, উপরন্তু একটা প্রহসনের সৃষ্টি হবে মাত্র।

আমাদের এখানে কিন্তু বর্ষা নেমেছে। এতদিনে তোমাদের ওখানেও

নাকি বোধ হয়, তাই নয় ? প্রথম বর্ষণের অনুভবটা এ বছর কেমন লাগল জানিও।'

কৃশানুর মনটা কী পাগলামী শুরু করেছে। মনটা পড়ে আছে কখন আসবে ফুলওয়ারি গাঁয়ের ফুলেশ্বরীর প্রেমপত্র। বিশেষ একটা কারণে বেশী খুশী হয়েছে সে। তার এই চব্বিশ বছরের জীবনে যে কটি মুষ্টিমেয় মেয়ের সান্নিধ্যে ওকে আসতে হয়েছে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে-নি লাজুকস্বভাব কৃশানু। তাদের কেউ কেউ ওর পা টেনেছে। ও কখনও জুতসই একটা প্রতি-আঘাত করতে পারে নি। পারে নি ওর স্বভাবের দোষে। এই একটি ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত আক্রোশের প্রতিশোধ নিতে সে উদ্যত।

ফুলওয়ারি গাঁয়ের এই অপরিচিতা মেয়েটিকে সে চেনে না, এখানে চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। তাকে প্রত্যক্ষ দেখার সম্ভাবনাও নেই তিলমাত্র। দৃষ্টিবিভ্রমে ওর সম্মুখে কোনদিন বিড়ম্বিত হতে হবে না তাকে। তাই সে একেবারে বেপরোয়া। তাই বেশ সহজ সুরে ফুলেশ্বরীর নলচের আড়ালে ঐ অপরিচিতার অম্বুরী-নেশায় মৌজ করছে অনায়াসে।

জবাব এল চিঠির, এবার পাঁচ দিনের মাথায়। খামেব চিঠি। রীতিমত ভারী খাম। মেসে কৃশানু আর রামনন্দন ছাড়া আর কেউ নেই। চিঠি-পত্র যা পড়ে দেওয়ালে আটকানো কাঠের বাক্সটায, সেগুলি রামনন্দন এনে হাজির করে ওর কাছে। কৃশানুর নিজেব চিঠি আসে না একখানাও, বন্ধুদের চিঠির ঠিকানা কেটে আবার রামনন্দনের হাতেই ফেরত দেয়—রাস্তার মোড়ের ডাকবাক্সে ফেলে দিতে। রামনন্দন এনে দিল খামটা। তার উপরে গোটা গোটা হরফে রামনন্দন কাহারের নাম লেখা। চিঠিখানা হাতে পেয়ে কৃশানু তাড়াতাড়ি খুলে পডতে থাকে।

রামনন্দন একটু অবাক হয়, কিন্তু বাবুর নামে চিঠি আসতে সে দেখে নি কখনও ইতিপূর্বে, বলে, আপ ই কা হ ?

ঈশ্বর কৃশানুকে মার্জনা করুন। একটা ঢোক গিলে অম্লানবদনে জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাটা বলে ফেলে সে, হ্যাঁ, এক পেয়ালা চা।

এক কাপ চা নিয়ে, সিগারেটটা ধরিয়ে মৌতাত করে চিঠি পডতে বসে। রামনন্দন কাহারকে লেখা ফুলওয়ারি গাঁয়ের বিরহতাপিতা ফুলেশ্বরী কাহারনির প্রেম-পত্র। দীর্ঘ চার পৃষ্ঠা।

তাতে আছে রামাওতারের কুশল সংবাদ, ভালু-পীতম্বের খবর, তেওয়ারী-জীর সর্দিজ্বর এবং গত বৃহস্পতিবারের ঝড়ে শিউনন্দনজীর বাগানের আম গাছটার উপ্‌ড়ে পড়ার মর্মবিদারক দুঃসংবাদ। কিন্তু সে তো মাত্র এক পৃষ্ঠার একটি কোণে ঠাসবুনোট হয়ে আশ্রয় নিয়েছে। বাকি সাড়ে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী লিপিকুশলতার পরিচয়। প্রথম বর্ষাগমের খানিকটা বর্ণনা, কিছুটা রবীন্দ্রনাথ, কিছুটা কালিদাসের স্পর্শ আছে সে বর্ণনায়। নিঃসংশয়ে লিপিকার উচ্চ-শিক্ষিতা। বিদ্যাপতির অতি-পরিচিত একটা গোড়া চরণ যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে সে বর্ণনায়, ঘোর যামিনীর চিত্রায়নে, অথির বিজুরিয়ার চকিত চমকে। ফুলওয়ারি গাঁয়ের বিরহিণী বধু ফুলেশ্বরী কাহারনির অন্তরের গুমরানিই যেন শোনা যাচ্ছে সে মেঘগর্জনে।

মন কেমন করার প্রসঙ্গে লিখেছে, তুমি স্বীকার করতে বলেছ যে তোমার জন্যেই আমার মন কেমন করছে। কিন্তু সে কথা কি কাগজের উপর কালির আঁচড় কেটে না লিখলে তোমাদের নজরে পড়ে না? পুরুষ জাতটাই অমনি! মেয়েমানুষকে তারা শুধু মায়াবী বলেই চিনতে শিখেছে—এটুকু জানে না যে ও-জাতের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না! লজ্জা কি অতই সহজে ভাঙে? যার ভাঙে তার ভাঙে, আমার বাপু ভীষণ লজ্জা করে! ধরতে গেলে তোমাকে আমি ভাল করে চিনিই না। তুমি বলবে, সে কি? সাত বছর ঘর করলে এক সঙ্গে, কিন্তু সময়ের গজকাঠি দিয়ে কি মনকে মাপা যায়? যায় না। তা যদি যেত তাহলে কখনই সংশয় থাকত না তোমার মনে কেন ভগলুব পুনযাত্রা উৎসবটা আটকে রয়েছে তোমার অভাবে।

আরও শেষের দিকে ফুলেশ্বরী লিখছে, চিঠি কাকে দিয়ে লেখাই সে কথা জানবার জন্যে তোমার অদম্য কৌতূহল দেখছি! কিন্তু কেন বল তো? কোন কম্পোজিটার অক্ষরগুলো সাজিয়েছে না জেনে বুঝি কোন সাহিত্য-পুস্তকের সমালোচনা কর না তুমি? কথাগুলো যে আমারই এটা বিশ্বাস কর না কেন? যাই হোক তোমার অদম্য কৌতূহল চরিতার্থ করতে সত্য কথাটা জানালাম এবার। পাটনার এক বাবুকে আমি রোজ দুধ যোগান দিই। বাবু পাটনা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তোমার মত দিব্যি পুরুষ্টু একজোড়া নধর গোঁফ আছে। সেই বাবুই লিখে দেন চিঠি। এবার হল তো?

যেন এক অদ্ভুত নেশার ভূত চেপেছে কুশাঙ্কুর ঘাড়ে। ফুলেশ্বরী আর রামনন্দনের প্রেমকূজনের আড়ালে সে নেমে পড়েছে নেশা ধরা এক মজার

খেলায়। ওর সবচেয়ে মজা লাগত এই কথাটা ভাবতে, যে ওই লিপিকারের সঙ্গে তার পরিচয় নেই, হবেও না কোনদিন। ও জানে না সে দেখতে কেমন, কি করে, কি ভাবে। মনে মনে কৃশানু মেয়েটির পোট্রেট আঁকত নিত্য নতুন রঙে। ভাবত, সেও উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, কবে আসবে ফুলেশ্বরী আঁচলের তলায় চিঠির পসরা লুকিয়ে নিয়ে। নিশ্চয়ই স্কুলে-পড়া দোলায়িত বেণী-কিশোরী সে নয়, তার ভাষার গুরুত্বেই সে সিদ্ধান্তের স্বাক্ষর। হাতের লেখাটা গোটা গোটা, মুক্তোর মত ঝরঝরে। একটু যেন বামাগতি আছে তাতে, অর্থাৎ বাঁয়ে হেলানো হরফগুলো। নিঃসন্দেহে ওর মন পরিণতি লাভ করেছে, শুধু রবীন্দ্রনাথের শ্যামগম্ভীর সরসাই নয়, মেঘদুতের পুষ্কর বংশের কুলতিলক বলেও বর্ণনা করা হয়েছে কালবৈশাখীর মেঘকে। একগাদা বইখাতা ইন্সট্রুমেণ্ট-বক্স বুকে চেপে যে মেয়ে দশটা বেলায় দোরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে কখন আসবে স্কুলের বাস, তার কলম অন্ততঃ এখনও বলতে শেখে নি, মেয়েদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না।

কিন্তু তাই বলে কৈশোর অতি-অতীত নয় ওর। বয়ঃসন্ধির উচ্ছলতাকে একেবারে অতিক্রম করে ও যদি পরিপূর্ণ পরিণতমনা হত তাহলে কখনই লিখতে পারত না পাটনা মেডিকেল কলেজের এক গুম্ফগৌরবদীপ্ত দুগ্ধপোষ্য বাবুকে দিয়ে ফুলেশ্বরী তার ববকে চিঠি লেখায়! এটুকু কৌতুক করবার, এটুকু লিখে মজা দেখবার মত ছেলেমানুষী তার আজও ঘোচেনি।

মেয়েটি কি বিবাহিত! সে কি কৃশানুকে নিয়ে খেলাচ্ছে? ওর চিঠি নিয়ে সদ্যবিবাহিত একটি বাঙালী বববধূ কি হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে! কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল বেচারীর। কৃশানুর কি আরও সংযত হওয়া উচিত?

কিন্তু সংযত ও হতে পারেনি। কেমন যেন নেশা ধরে গিয়েছিল। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বোধ করত অপরিচিতার অজ্ঞাত পরিচয়ের জন্যেই। যার সঙ্গে ওর লিপিবন্ধুত্ব হতে চলেছে তাকে সে চেনে না, সেও ওকে চেনে না। এই অপরিচয়ের আকর্ষণই ওকে সবচেয়ে বেশী করে টানত। ছেলেবেলায় মতির মায়ের মুখে শোনা ভূতের গল্পগুলো যেমন নেশা ধরাত এও যেন অনেকটা তাই। রাক্ষসগুলোকে সে দুচক্ষে দেখতে পারত না, তবু রাজপুত্র-রাজকন্যার নিরামিষ গল্পগুলো জমত না যতক্ষণ না হাঁউ-মাউ-খাঁউ রাক্ষসটা এসে হাজির হত মতির মা বর্ণিত তার সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে।

কেমন যেন নেশা ধরে যেত। হাড়ের মধ্যে সিরসির করত ভয়ে; সে সিরসিরানির মধ্যে অদ্ভুত রকমের একটা সুখানুভূতিও মেশানো ছিল যেন। এই অজানিতার সঙ্গে নলচে-আড়াল-দেওয়া প্রেম-পত্রের আদান-প্রদান ছিল তেমনি একটা সিরসিরানির নেশা।

আরও একটা কথা। আর সেটাই সবচেয়ে বড় কথা! এই মেয়েটির নগ্নমূর্তি একবারের জন্যেও ফুটে ওঠেনি ওর মনের ক্যানভাসে। অকাজের অবসরে ও মনে মনে অসংখ্য চিত্র এঁকেছে মেয়েটির নানান পোশে। একটাও ন্যুড-স্টাডি নয়। চোখ বুজে যে মেয়েটিকে দেখতে পেত, সে যেন রক্তমাংসে গড়া নয়, সে যেন একটা আইডিয়া, একটি তন্বী-তরুণীর দেহের আভাস নিয়ে রূপায়িত হয়েছে। সে যেন পুরোপুরি একটা নারীদেহের স্থূলতার মধ্যে আবদ্ধ নয়। তার যেন 'শেপ' আছে, কিন্তু 'ম্যাস' নেই! সূর্যোদয়ের আগে যে ঠাণ্ডা মিঠে-মিঠে একটা হাওয়া বয়, তেমনি হাওয়া দিয়ে যেন সে তৈরি—পাখীর পালকের মত হাল্কা, স্বচ্ছতোয়া নদীর মত নির্মল। টেবিলের উপর চিঠির প্যাড টেনে নিয়ে যখন সে ফুলেশ্বরীর বকলমে মন উজাড় করে দেয় তখন ওর সদ্যস্নাত দু-একগোছা চুল কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, সে কি লিখছে। ধূপছায়া রঙেব একখানি ঢাকাই শাড়ি পরেছে সে, কপালে স্নানের পর দিয়েছে সিঁদুরেব টিপ!

যতবাব চোখ বুজে কল্পনা করেছে, ততবারই ওর অদেখা মানসী এই একই সাজে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। ওই ধূপছায়া রঙের শাড়ি, পায়ে আলতা, কপালে কুমকুমেব নয়, সিঁদুরের টিপ। গৃহস্থালীর নানান কাজে ব্যস্ত মেয়েটিকে সে দেখেছে মনে মনে, আর আশ্চয, কৃশানুর নির্জ্জনলোকের সেই গোপনচারী দুঃশাসন দেখায়নি একবারও ওর আঁচল ছোওয়ার দুঃসাহস।

কৃশানু জবাবে শেষদিকে লিখল, 'ফুলেশ্বরী, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। কালির আঁচড়ে কাগজের উপর না লিখলে তোমার হৃদয়-নিঙড়ানো কথাটা বুঝতে পারব না একথা ভাবলে কেন? আমি কি জানি না—কত ভালোবাস তুমি আমাকে! তবু ওইখানেই তো প্রেমের রহস্য। জানা কথা আবার শোনবার জন্যই প্রেমিকেব প্রাণে নিত্য আকুলি। ওই একটি কথাই মানুষ যুগে যুগে বলেছে, কালে কালে শুনেছে। আমি তো বিরহ-জর্জরিত সামান্য রামনন্দন, নীলিমাহীন আকাশে ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব

নিয়ে' একদিন কবিত্বহীন স্বয়ং বিধাতাকেও হয়তো প্রলয়লজ্জায় বলতে হবে ওই কথা দুটি, বলবেন, বল তুমি সুন্দর ; বলবেন, বল আমি ভালোবাসি।

তোমাকে পুরোপুরি পাইনি। নাইবা পেলেম। একটু ছোঁওয়া নিয়েই যাক না আমার অলসবেলা কেটে। আজ শুধু অনুভব লাগছে তোমার কাপড়ের রঙের আভাস, পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার হাওয়া, চেয়ে দেখার বাণী, ভালোবাসার ছন্দ—

অচেনার লজ্জা? অত সহজে কি এড়িয়ে যেতে দেব তোমায়? অচেনা বলেই তো আমার জোর বেশী, দাবি অমোঘ। সাত বছর ঘর করেও আমি তোমার কাছে অচেনা—কিন্তু তিনটি চিঠির আদানপ্রদানেই তোমার উপর জন্মেছে আমার অপরিচয়ের দুরতিক্রম্য দাবি। সেই দাবির জোরেই বলব—'রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে, যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?'

ধরা তুমি পড়ে গেছ ফুলেশ্বরী! এ মুঠির কবল থেকে তোমার আর উদ্ধার নেই। স্বীকার না করে পালাবে কি করে? 'ঘোর যামিনী', আর অথির বিজুলিয়ার চমক বলেই সরমে সংযত করেছ কলমকে কিন্তু আমি তো জানি ওর পরের চরণটাই বর্ষার রিমি ঝিমি বোলে সেদিন সারারাত তোমার অন্তরে অনুরণিত হয়েছিল।

বড় বাজে কথা লিখছি, নয়? কিন্তু আমার তো সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আমার হৃদয়ের এই অহৈতুকী উচ্ছ্বাস তো বিহারী বিরহিণী কোন সুচরিতাকে শুচিস্মিতা করে তুলবে না, আমার এ চিঠি পাঠ করবেন শুশ্রুগৌরবদীপ্ত পাটনা মেডিকেল কলেজের জনৈক দুগ্ধপোষ্য ছাত্র। তাই আমার তরফে আর লজ্জা কি?

পত্রশেষে গাইতে ইচ্ছে করছে, এবার অবগুণ্ঠন খোল!'

চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে পর্যন্ত কৃশানুর মন এক রীতিমত পাগলামির নেশায় মেতে আছে। কোন কাজে মন বসে না। য়ুনিভার্সিটি অবশ্য বন্ধ, কিন্তু ন্যাশনাল লাইব্রেরী খোলা আছে। ছুটিতে একটু পড়াশুনা করবে বলে মনে করেছিল, ভাল লাগে না। ক্রাইম নভেল পড়ার ঝোঁক ছিল ওর। অপরাধ বিজ্ঞানের উত্তেজক বইগুলোও বাঁধতে পারে না ওর মনকে। সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টাখানেক পড়িয়ে আসে ইলাকে, কিন্তু মনটা পড়ে থাকে মেসের দেওয়ালে আটকানো কাঠের বাক্সটায়। দৈনিক ডাকপিয়নের

সাড়া পেলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। রামনন্দনের নজর এড়িয়ে চিঠিখানা প্রথমেই তাকে হস্তগত করতে হবে।

অবশেষে এল জবাব। নীল রঙের সুদৃশ্য লম্বাটে খাম। উপরে গোটা গোটা হরফে রামনন্দন কাহারের নাম লেখা। খামটা খুলে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল যে চিঠিখানি তাতে এবার আর 'শ্রীচরণকমলেষু' পাঠ নেই। লেখা ছিল—

'অপরিচিতেষু, আপনার নাম ঠিকানা জানা না থাকায় বাধ্য হয়ে খামের উপরে রামনন্দনের নাম লিখতে হল। এ চিঠি রামনন্দনকে লিখছে না ফুলেশ্বরী, লিখছি আপনাকে আমি। আপনি আমাকে রীতিমত বিপদে ফেলছেন। রামনন্দনকে আপনি কি ভাবে ঠাণ্ডা করছেন জানি না, কিন্তু আমার অবস্থা শোচনীয়। আপনার ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠিখানি আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফুলেশ্বরী এসে যখন বসল আমার ঘরের চৌকাঠের উপর তখনও বিপদের গুরুত্বটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। বুঝলাম একটু পরে। যখন চিঠির নির্গলিতার্থ বুঝিয়ে দিতে আমাব আধমিনিটও সময় লাগল না। থামতেই বলে, আউর ক্যা লিখা? সঙ্গত প্রশ্ন! যে চিঠি পড়তে দশ মিনিট লাগে, যে চিঠির বক্তব্য ছয় পৃষ্ঠার বিশাল পরিসরেও শেষ না হয়ে উপচে পড়ে মার্জিনে, সে চিঠির বক্তব্য কি অত শীঘ্র শেষ হতে পারে?

আপনাদের ছাত্রাবাস সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। জানি না কী পরিবেশে রামনন্দন পড়ে আছে। তবু কলকাতার ছাত্রাবাসে একজন ভৃত্যের জীবনযাত্রা আমাকে কল্পনা করতে হয়। মনে মনে বুনে চলি কাহিনীর জাল—বলে গেলাম মুখে মুখে।

...সকালে উঠে বাবুদের চা করতে হয়, দোকান থেকে এনে দিতে হয় ডিম-টোস্ট-বিস্কিট। তারপর বাজার যাওয়া। সাড়ে নটার মধ্যেই রান্না শেষ। ডাইনিং হলে ঘণ্টা পড়ে। হুড়মুড় করে সবাই ছুটে যায় সেখানে। সারি সারি টেবিল পাতা! ব্রাহ্মণ পাচক পরিবেশন করে যায়। রামনন্দন যোগান দেয়, জল, নুন, লেবু। তারপর দশটা বাজে কি না বাজে ঘরে ঘরে তালা পড়ে যায়। ছাত্রের দল উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে পার্সেণ্টেজ রাখতে। দু-একটি ঘরের রুদ্ধদ্বারে অবশ্য তখন বসে তেতাশের আড্ডা। পার্সেণ্টেজ রাখবার জন্য তাদের পরিশ্রম করতে হয় না, প্রক্সির বকলম ব্যবস্থা আছে। রামনন্দন এই সব বাপের সুপুত্রদের খিদমৎ করতে লেগে যায় তখন। বারে বারে

ডবল্-হাফ চা আন, সিগারেট আন, টাকার ভাঙানি এনে দাও। তারপর বেলা গড়িয়ে আসে। বাঁকা হয়ে ঘরে ঢোকে রদ্দুর। এক এক করে ফিরে আসে কর্মক্লান্ত ছেলের দল। ঘরে ঘরে ডবল্-লক তালা খোলার আওয়াজ শোনা যায়। একটি দুটি করে বাতি জ্বলে ওঠে ঘরে। আবার আসে সান্ধ্য চা-খাবার। রামনন্দন তখন পাচক ব্রাহ্মণকে রান্নাঘরে যোগান দিতে ব্যস্ত। গুন্‌গুন্ করে শব্দ ওঠে পড়ুয়া ছেলেদের ঘর থেকে। খাওয়াদাওয়া মিটতে সেই যার নাম রাত এগারটা। তখন ফুলেশ্বরীর নয়নের মণি নয়ন দুটি মুদবার অবসর পায় (যদি না নাইট-শোর আকর্ষণে পড়া কোন বাবুর বাকি থাকে খাওয়া। তা থাকলে, তাকে জেগে থাকতে হয়। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের চোখ এড়িয়ে মধ্যরাত্রে তাকে খুলে দিতে হবে ছোট উইকেট গেটের তালা। একটি অতন্দ্র নিরক্ষর ভৃত্যের সামনে মাথা নীচু করে উইকেট গেটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে আসনে রাত্রিচর বাবু।)

জানি না, আপনাদের ছাত্রাবাসে রামনন্দনের জীবনযাত্রার ছবিটা ঠিকমত আঁকতে পেরেছি কিনা। আপনাদের ছাত্রাবাসের সঙ্গে না মিললেও আমি জানি আমার বর্ণনা সত্য, মহর্ষি নারদের উপদেশ অনুযায়ী রামনন্দনের এ কর্মস্থল অযোধ্যার চেয়েও সত্যি। এতেই কাজ হয়েছিল, আমার শ্রোতার সুর্মা-আঁকা কালো-কাজল চোখ দুটিতে ভরে উঠেছিল স্বাতির মুক্তাবিন্দু! দুধের ঘটিটা তুলে নিয়ে চোখে আঁচল দিয়ে ফুলেশ্বরী খুশী হয়েই ফিরে গিয়েছিল ফুলওয়ারি গাঁয়ে।

রামনন্দনের একটা প্রশ্নের জবাব। ফুলওয়ারি গাঁয়ের ত্রিসীমানায় কোন বাঙালী মহিলা নেই যার কাছে গিয়ে চিঠি লেখাতে পারে ফুলেশ্বরী। বরং কলকাতার মেসে অনেক ছাত্র আছে যার শরণাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে রামনন্দনের। খামের উপর ভবিষ্যতে রামনন্দনের নাম না লিখতে হলে শুধু নিশ্চিন্ত নয়, খুশী হতাম। ইতি—'

চিঠিখানা শেষ করে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল কৃশানু। দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল জানতে, কে এই নারী। ওদের দু-কামরার নোনাধরা মেসবাড়ির সঙ্গে তার বর্ণিত ছাত্রাবাসের তিলমাত্র মিল নেই। রামনন্দনের কল্পিত জীবনযাত্রা আগাগোড়াই ভুল। লিপিকারের ধারণা এটা একটা প্রকাণ্ড ছাত্রাবাস। ধনীপুত্রদের একটা জবরদস্ত আস্তানা। কিন্তু কী নিখুঁত ছবি সে এঁকেছে এমন একটি ছাত্রাবাসের। কোন স্ত্রীলোকের কলমে কেমন

করে সম্ভব হয় একটি হস্টেলের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়ন ? সে ছাত্রাবাসের ছেলেরা কলেজ থেকে ফিরে ঘরের যে তালা খোলে সেগুলি টু-সীটেড ঘরের ডবল্-লক্ নিয়মে আটকানো। সেখানে যে ছাত্র নাইট-শোর আকর্ষণে পড়ে তাকে ঢুকতে হয় উইকেট-গেটের ভিতর দিয়ে, মাথা নীচু করে। সেখানে রুদ্ধদ্বার কক্ষে যখন ক্লাস-পালানো ছেলের দল বসে তেতাশের আড্ডায় তখন ভৃত্যকে সরবরাহ করতে হয়, শুধু চা নয়, ডবল-হাফ চা! আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, চা-সিগ্রেটেই শেষ হয়নি ও অধ্যায়। বলা হয়েছে—ডাক পড়ে ভৃত্যের, টাকার ভাঙানি সরবরাহ করতে। মাঝে মাঝে রেজগির অভাবে তেতাশের আড্ডায় যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয় একথা কোন স্ত্রীলোকের বর্ণনায় আসে কি করে ? অথচ স্ত্রীলোক না হলে ফুলেশ্বরীই বা কেমন করে লেখাতে যাবে চিঠি ?

তবে কি ওর অনুমানই সত্য ? ভদ্রমহিলা বিবাহিত ? স্বামী-স্ত্রী মিলে যুক্তি করে লেখে চিঠি—কৌতুক করতে ? হস্তাক্ষরটা মহিলার, কিন্তু তার পিছনে কি রয়েছে তাঁর স্বামীর ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা।

অ্যানালিটিক্যাল মন কৃশানুর। ছেলেবয়সে গোয়েন্দা হওয়াই ছিল ওর জীবনের স্বপ্ন। সব জিনিস ও খুঁটিয়ে দেখে বিচার করে। সার্ আর্থার কোনান ডয়েলের কম্প্লিট-ওয়ার্কস্-গেলা কৃশানু চিঠিখানা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসল। দীর্ঘ সমীক্ষণান্তে সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে ও আপন মনেই বলল, মেয়েটি কুমারী, ধনীর দুলালী, সম্ভবত ব্রাহ্মণ-কন্যা।

আপনি-আমি উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতাম, কি করে বুঝলে ?

নির্জন ঘরে এই সঙ্গত প্রশ্নটা কেউ ওকে করল না।

তবু সন্দেহবাতিক মনের পূর্বপক্ষকে জবাবদিহি করতে বসল কৃশানু। ব্যাখ্যা করে দেখাল ওর সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি।

কৃশানু লক্ষ্য করেছে গত চিঠিতে সে একটু অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। শেষের কবিতা আর শ্যামলী থেকে অনেক কিছু তুলে ধরেছিল। স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল অপরিচিতার প্রতি একটা অন্ধ অনুরাগের। এই চিঠিখানায় সে কথার কোন জবাব নেই। অচেনা প্রসঙ্গে ও এবার অদ্ভুতভাবে নীরব। কেন ? যদি ওরা স্বামী-স্ত্রী মিলে ওকে উত্তেজিত করে একটা মজা দেখার লোভেই এটা করত তাহলে ওর উচ্ছ্বাসের অগ্নিতে এই সুযোগে নিশ্চয়ই নূতন

সম্বিৎ নিক্ষেপ করত ওরা। তা কিন্তু করা হয়নি। লিপিকার ও বিষয়ে একেবারে নিশ্চুপ। বরং এর আগের চিঠিখানায় 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া'র পূর্ববর্তী চরণটির আমেজ ছিল। যেন ওই চরণটিই সে লিখতে চায়, কিন্তু সরমে বাধে বলে পূর্বচরণের 'অথির বিজুলিয়া' আর 'ঘোর যামিনী'র বর্ণনায় মনের ইঙ্গিত জানিয়েই লজ্জাজড়িতচরণে থেমে গিয়েছিল ওর লেখনি। অথচ এবার ও পথের ত্রিসীমানায় সে যায় নি।

কৃশানুর মনে হল তার একমাত্র কারণ এবার নলচের আড়াল নেই। এবার ফুলেশ্বরীর বকলমে নয়, অপরিচিতা সরাসরি তাকেই সম্বোধন করেছে। তাই কিছুমাত্র প্রগল্‌ভতা করাও অসম্ভব হয়েছে তার পক্ষে। যদি ওরা স্বামী-স্ত্রী মিলে কৌতুকের উদ্দেশ্যে লিখত তাহলে এ সঙ্কোচের কারণ থাকত না। বরং কৃশানুর উচ্ছ্বাসপ্রবণতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে হয়তো আরও এক ধাপ এগিয়ে যেত।

এ থেকেই বোঝা যায় এ চিঠি লেখা হয়েছে কোন কুমারী হাতের কম্পনে।

আর কি বলেছে সে? ধনীর দুলালী!

পোস্টাপিসে যে খাম পাওয়া যায়, সে খামে ও চিঠি লেখেনি। নীলচে লম্বাটে খামে পৃথক টিকিট এঁটেছে। চিঠির কাগজটাও দামী। ওর জীবনযাত্রার মান কাজেই যথেষ্ট উন্নত। এ ছাড়াও ছাত্রাবাসের যে চিত্রটি সে এঁকেছে তাতে সর্বত্রই আর্থিক স্বচ্ছলতার আমেজ। ছাত্রজীবন নাইট-শো সিনেমা দেখা, ফ্লাস-খেলা, ডিম-টোস্ট-বিস্কিটের শ্রাদ্ধ করা ছাড়া অন্য রকমও যে হতে পারে এটা ওর ধারণা নেই। দিনে চারটে টিউশানি করে, কলের জলে নাস্তা সেরেও যে ছেলের দল সারস্বত উপাসনা করে তা ও জানে না। ও ধনীব কন্যা।

শেষ কথা, ও বামুনের মেয়ে।

না, কৃশানু নিজে ব্রাহ্মণ-সন্তান বলে এ কোন উইসফুল থিঙ্কিং নয়। এ অনুমানের পিছনেও যুক্তি আছে তার। রামনন্দনের জীবনযাত্রার বর্ণনায় তাকে সযত্নে হেঁসেলের বাইরে রাখা হয়েছে। সে রান্নার যোগান দেয়, চা-টোস্ট সরবরাহ করে মাত্র। বড়জোর জল, নুন লেবুর পরিবেশন-ভার দেওয়া চলে তাকে। হেঁসেলের বাকি কাজের দায়িত্ব সে ন্যস্ত করেছে পাচক ব্রাহ্মণের উপর।

এ থেকেই মনে হয় সে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পরিবারের মেয়ে।

সবটা মিলিয়ে তাহলে দাঁড়াল, ও হচ্ছে রক্ষণশীল ধনবান ব্রাহ্মণ-পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা একটি অনূঢ়া যুবতী!

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে কৃশানু। শূন্য ঘরে আপনমনেই চেঁচিয়ে ওঠে, দুত্তোর, নিকুচি করেছে!

একখণ্ড কাগজে বড় বড় করে লেখে—'ফুলেশ্বরী, কে তোমার চিঠি লিখে দেন তাঁর পূর্ণ পরিচয় যদি এবার না জানাও তাহলে এর পর থেকে রামনন্দন অন্য লিপিকারের কাছে যাবে চিঠি লেখাতে। ইতি রামনন্দনের পক্ষে কে. রায়।'

গোটা গোটা হরফে এই একটি মাত্র পংক্তি লিখে একটা খামে বন্দী করে নিজে হাতে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসে কৃশানু, খামের উপরে ফুলেশ্বরীর নাম-ঠিকানা লিখে।

আজ রবিবার। ভবতারণবাবুর কাজে যাওয়ার তাড়া নেই—দুপুরে একবার যেতে হবে অবশ্য অফিসে। জরুরী একটা ইন্‌ভেষ্টিগেসন রিপোর্ট এসে পৌঁছবার কথা আছে বারোটা নাগাদ। সকালবেলাতেই ঢিলে পায়জামা আর ড্রেসিং গাউনটা জড়িয়ে অর্ধশয়ান হয়ে খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন তিনি। মনটা কিন্তু তাঁর ঠিক খবরের কাগজে নিবদ্ধ নেই। মনে মনে অনেক কথাই ভাবছেন। কথাটা কদিন থেকেই মনে হচ্ছে। আগামী বছরই এক্সটেনসন না পেলে তাঁকে অবসর নিতে হবে। তারপর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদের কর্মহীন গ্লানিকর জীবনের রেশ টেনে চলতে হবে বাকি জীবন। অর্থকৃচ্ছ্র তা হবার কথা নয়। সঞ্চয় যথেষ্ট করেছেন। পেনসন আর বাড়ি ভাড়া নিয়ে অনায়াসে কেটে যাওয়া উচিত অবশিষ্ট দিনগুলো। জীবনে কিন্তু সুখী হতে পারেননি তিনি। সরমাকেও সুখী করতে পারেন নি। হয়তো সুখী না হতে পারার উপাদান ছিল তাঁর রক্তের মধ্যেই। হয়তো এ প্রবৃত্তি তাঁর সহজাত নয়—যে উত্তেজনাময় জীবনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে, তাতে উত্তেজক কোন নেশার আশ্রয় না নিলে হয়তো জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতেন। মাত্রাতিরিক্ত উগ্র পানীয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন;—কিন্তু শুধু মদিরার নেশাতেই তৃপ্ত থাকতে পারেননি। সরমা প্রথম নেশাটাকে সহ্য করলেও দ্বিতীয়টাকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাঁটি ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। তিল তিল করে শুকিয়ে

গিয়েছে সরমা। অন্নজলের মত আনন্দও জীবনধারণের এক আবশ্যিক উপাদান। সেই আনন্দের প্রায়োপবেশনে আত্মাকে নিঃশেষ করেছিল সরমা—একদিন শেষ পর্যন্ত মুক্তি দিল সত্যিই ঘোষাল সাহেবকে—সরে গেল ওঁর জীবন থেকে।

সরমার জীবিতকালে যা অসম্ভব মনে হত, আশ্চর্য, তার আত্মদানের পর সেটা কত সহজ হয়ে গেল। বুকের একটা পাশ খালি হয়ে গেল যেন। এতদিন চেষ্টা করতে হত সংযমের উদ্দেশ্যে—এখন, আযৌবনের সাথীটির এমন নীরব প্রস্থানে স্বভাববৈরাগ্যই স্তিমিত করে দিল ওঁর উদ্দাম কামনাকে। বুড়ো হয়ে গেলেন যেন কদিনেই, মেয়েদের মুখ চেয়ে বুক বাঁধলেন—কিন্তু মেয়েদের ভাগ্যকে বাঁধতে পারলেন না। ইভার বিবাহ দিলেন, ব্যর্থ হয়ে গেল সে মিলন। আইভির জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা আরও বেশী। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই সে কেমন যেন বদলে গেছে। যেন তার নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না আর। সে ওঁর ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডের বাইরে সরে যাচ্ছে ক্রমে। জোর করে কাছে টানতে চেয়েছেন, ফল শুভ হয়নি। আইভির অন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ তা ওঁর চৌম্বকবৃত্তির আওতায় শান্ত হয়ে ওঠেনি। ফ্লেমিংস্ লেফট হ্যাণ্ড-রুলের আইনে ওঁর ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডের সঙ্গে ট্যানজেণ্ট রচনা করে দুর্বার কেন্দ্রাতিগ গতিতে ছুটে বেরিযে গেছে আইভি। যেমন করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অস্বীকাব করে ছুটে বেরিয়ে যায় মহাশূন্যের দিকে অধিবৃত্তের পথচারী ধূমকেতু!

আইভিকে বাঁধতে হবেই, এই সিদ্ধান্তে এসেছেন ক্রমে। না হলে মহাশূন্যের নেপথ্যে হাবিয়ে যাবে মেয়েটি। আজ সকালের ডাকে এ বিষয়ে একটি চিঠি পেয়েই চঞ্চল হয়ে আছে মনটা।

ইভা এসে দাঁড়ায়। তাব হাতে একটা প্লেটে কিছু মিছরি-দেওয়া ছানা আর ভিজে মুগ, আর এক গ্লাস ওভালটিন। সকালবেলা এগুলি তাঁর নিত্য-বরাদ্দ। স্নান সেরে এসেছে ইভা, ভবতারণবাবু জানেন, শুধু স্নান নয়, পূজাও সেরে এসেছে মেয়েটি। গোপন করবার চেষ্টা করলেও তাঁর অনুসন্ধিৎসু গোয়েন্দা চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি ইভা। ভবতারণবাবু সংবাদ রাখেন অতি প্রত্যুষে স্নানান্তে রুদ্ধদ্বারকক্ষে ইভা ঘণ্টাখানেক পূজা-আর্চা করে। আপত্তি করেননি। মানুষ মাত্রেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। ইভা লাইব্রেরী

করেছে, কুকুর পুষেছে, একগাদা পায়রা এনে রেখেছে ছাদের জালতি দেওয়া ঘরে, বাগানের দিকে দিয়েছে মনোযোগ, কিছুই নজর এড়ায়নি তাঁর। তাই সরমার মত একদিন পূজার ঘরেও যে ঢুকতে হবে ইভাকে এটা স্বতসিদ্ধের মতই জেনে রেখেছিলেন ঘোষালসাহেব।

খাবারের প্লেট আর ওভালটিনের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ইভা চলে যাচ্ছিল। তাকে ফিরে ডাকলেন। ইভা নীরবে এসে দাঁড়ায় ওঁর ইজিচেয়ারের পিছনে।

সামনে এসে এই চেয়ারটাতে বস, কথা আছে।

ইভা এসে বসে চেয়ারটায়, জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়।

কানপুর থেকে চৌধুরীসাহেব চিঠি দিয়েছেন। আইভিকে তিনি দেখতে চান।

ইভা একটু ইতস্ততঃ করে বলে, তুমি কি সত্যিই ওর বিয়ে দেবে বাবা?

সত্যি বিয়ে দেব না তো এতদূর অগ্রসর হলাম কেন রে? চৌধুরীসাহেব একেবারে বিলাতী-কেতার মানুষ। কানপুরে বিরাট ট্যানারির মালিক। সবই পাবে ওঁর দুই ছেলে। ছেলেটি লেখাপড়াও শিখেছে। সব দিক থেকেই পাত্রটি বাঞ্ছনীয়। ওরা নাকি আমাদের চেয়েও উগ্র-সাহেব, আইভির সঙ্গে বেশ মিলবে।

না, আমি বলছিলাম আইভি এখনও একেবারে ছেলেমানুষ। ও আমার চেয়েও দু বছরের ছোট, তাহলে ওর বয়স হল—

বাধা দিয়ে ভবতারণ বলেন, অত হিসাবের দরকার নেই, আইভির এখন যে বয়স সেই বয়সে তুই তোর মায়ের কোল থেকে নেমে হাঁটতে শিখছিস!

কিন্তু সে আজ দু যুগ আগেকার কথা বাবা।

তা হোক। আমি চাই অল্প বয়সেই আইভির বিয়ে দিতে। ওকে সংসারের মধ্যে বেঁধে ফেলতে। ওর মনের মধ্যে একটা ঘূর্ণি আছে। ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। অনেক কিছু আমার কানে আসে। আমি ঠিক সাহস পাই না। মায়ের স্বভাব পায়নি আইভি, সে বরং— তারপর অনেকক্ষণ কি ভেবে বলেন, আমার ছেলে নেই, তুই আমার ছেলে, তাই তোর সঙ্গেই আমাকে খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে। আমার মনে হয় আইভিকে যদি এখনই সংসারের মধ্যে বেঁধে ফেলা না যায় তাহলে ও বিপথে চলে যেতে পারে।

একটু চুপ করে থেকে বলেন, তুই জবাব দিলি না যে?

সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে ইভা বলে, কিন্তু বিয়ে হলেই ওর মন বদলে যাবে, এটাই বা ধরে নিচ্ছ কেন? এটা যদি ওর স্বভাবই হয় তাহলে বিয়ের পরেও তো স্বভাবটা না-ও বদলাতে পারে?

ভবতারণবাবু জোর দিয়ে বলেন, না বদলাবার কোন কারণ নেই। অপরাধ-বিজ্ঞানে বলে মানুষের মনের সঞ্চিত উত্তাপ কোন পথে যদি বহিস্ফুরণের পথ পায়, তাহলেই তার অপরাধ-স্পৃহা স্তিমিত হয়ে আসে। বিবাহ আইভির কাছে সেই সেফ্‌টি-ভ্যাল্ভ। ওর মন এখন নিরবলম্ব বলেই এমন পল্লবগ্রাহী। নিজের ঘর, নিজের স্বামী, নিজের সন্তান পেলে ওর সেই ভাসমান মন নোঙর ফেলবে নিশ্চিত।

ইভা বলে, অপরাধ-বিজ্ঞান পদার্থ-রসায়নের মত এক্স্যাক্ট সায়েন্স নয়—ওর অনেকটাই অনুমানের উপর নির্ভর করে তৈরী করা।

ভবতারণবাবু একটু বিরক্ত হয়েই যেন বলেন, এ কথা কেন বলছিস?

ইভা লক্ষ্য করে ওঁর বিরক্তি, মাথা নীচু করে বলে, আমার শ্বশুরও হয়তো তোমার এই যুক্তির বশবর্তী হয়ে একটা ভুল করেছিলেন একদিন।

স্তব্ধ হয়ে যান ভবতারণ ঘোষাল। মনে পড়ে যায় তাঁর। হ্যাঁ, তাঁর বৈবাহিক একদিন স্বীকার করেছিলেন এ কথা। থিয়েটার, শিকার আর খেলার মাঠ থেকে বারমুখী পুত্রকে ঘরমুখো করবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই পুত্রবধূকে বরণ করে তুলেছিলেন ঘরে। তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, বউ পেলে ছেলের মন ফিরবে, তা ফেরেনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে প্রবীণ ঘোষালসাহেবের। বলেন, তাহলে তুই কি করতে বলিস?

আমি বলি বিয়ে তুমি দাও আইভির, এখনই দাও; কিন্তু বড়লোকের একমাত্র ছেলের সঙ্গে নয়, মধ্যবিত্ত ঘরের হৃদয়বান কোন ছেলের সঙ্গে।

একটু চমকে ওঠেন ভবতারণবাবু, কেন?

আইভির বিয়েতে তুমি খরচ করবেই। মধ্যবিত্ত কিংবা গরীব ঘরের কোন সুপাত্রের সঙ্গে যদি বিয়ে দাও তবু খাওয়া-পরার কষ্ট হওয়ার কথা নয় ওর। শ্বশুরের সম্পত্তি না থাকলেও পৈতৃক উত্তরাধিকারে সচ্ছলভাবে সংসার চালাতে পারবে আইভি। তাছাড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সন্তান কিছু না কিছু রোজগার করবেই। এ রকম পরিবারেই ওর মন বদলাতে পারে।

অপর্যাপ্ত অর্থ যদি ওর হাতে থাকে তাহলে ওর চরিত্রের পরিবর্তন হওয়া কঠিন। অর্থই থাকবে, সংসারে হবে অনর্থ।

চমৎকৃত হয়ে যান ভবতারণ। কী চমৎকার বিশ্লেষণ করল ইভা। ওর প্রত্যেকটি কথা সূর্যোদয়ের মত সত্য। অপর্যাপ্ত অর্থ আইভিব জীবনে শুধু অভিশাপই আনবে। পরিমিত অর্থোপার্জনের সীমিত চৌহদ্দিতে ওর মন সংযত হতে বাধ্য হবে। উচ্ছৃঙ্খলতা অর্থপ্রাচুর্যের অনিবার্য অনুচর!

অনেক পরে ভবতারণ বলেন, কৃশানু ছেলেটিকে তোর কেমন লাগে?

চোখ বুজে বুজেই প্রশ্নটা সিগারেব একটা রিঙের মতই বাতাসে ছেড়ে দিয়েছেন ভবতারণ। না হলে ওঁর সন্ধানী গোয়েন্দা-চোখে ধরা পড়ত নিশ্চয়ই এ প্রশ্নে ইভার প্রতিক্রিয়া। একটু সামলে নিয়ে ইভা বলে, এ কথা কেন?

তেমনি মুদিত নেত্রেই ভবতারণ বলেন, ওদের অধ্যাপক ভবেশ দত্তর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি ছেলেটি খুব ভালো। বাপ-মা নেই, বলতে গেলে তিন কুলে কেউই নেই। পড়াশুনায় একটি রত্ন, ফার্স্ট-ক্লাস পাবেই। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা রাখে। এদিকে খুবই বিনয়ী, লাজুক, মিষ্ট স্বভাবের। আজকালকার ছেলেদের মত নয়। ভবেশ বলছিল ও নাকি সহপাঠিনী মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না।

অধ্যাপক ভবেশ দত্তের সার্টিফিকেট ছাড়াও এ কথা জানতে বাকি নেই ইভার, সে শুধু বলে, তুমি কি ওর সঙ্গে আইভির বিয়ের কথা ভাবছ?

এতদিন ভাবিনি। আজ তুই মধ্যবিত্ত ঘরের সচ্চরিত্র ছেলের কথা বললি কি না, তাই মনে হল।

কিন্তু ওর তো কোন রোজগার নেই?

এখন নেই, দুদিন পরে হবে। যাতে হয় সে ব্যবস্থা আমিই করতে পারি। হয়তো তার প্রয়োজন হবে না। ভাইভোভসিতে না আটকালে সে নিজেই কোন কম্পিটিটিভ সার্ভিসে সিলেকসন পাবে। তাছাড়া ভেবে দেখ, যেহেতু ওর ত্রিকুলে কেউ নেই, তাই হয়তো ও আমার এখানেই এসে থাকবে, বুড়ো বয়সে সেটাও আমার মস্ত বড় অবলম্বন।

ইভা জবাব দিতে পারে না। কৃশানু এসে এই বাড়িতে থাকবে? আইভির সঙ্গে বিয়ে হবে তার। কিন্তু উচ্ছল-প্রকৃতির আইভি কি পারবে ওই ভাবুক-

লাজুক শিল্পী মানুষটির মনকে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলতে ? যদি না পারে ? যদি পল্লবগ্রাহী আইভি সন্ধান না পায় ওর মনের গভীরতম অন্ধকারে লুকানো মনিমুক্তার ? যদি সেই অতৃপ্ত ক্ষুধার্ত মানুষটা কোন নির্জন রাত্রের আবছা আলোয় এসে দাঁড়ায় ইভার সামনে, যদি দাবী করে তার তৃষ্ণার পানীয়, তাকায় সেদিন সন্ধ্যার মত অদ্ভুত দৃষ্টিতে ? তখন পারবে কি ইভা ছুটে পালিয়ে যেতে ? আর পালাবে কোথায়, কৃশানু যে তখন এ বাড়ির বাসিন্দা।

জবাব দিলি না যে ?

ইভা কোনক্রমে বলে, ঘরজামাই ?

না, ঘরজামাই কেন ? সাপোস, হি টেকস ওয়ান অফ মাই ফ্ল্যাটস্। পাশাপাশি বাড়িতে থাকবে। তার আত্মমর্যাদায় যদি লাগে ভাড়াও নেব আমি। আমার তো ছেলে নেই, রিটায়ার্ড লাইফে জামাইদের উপরেই খানিকটা নির্ভর করতে হবে।

ইভার মনে পড়ে, বড় জামাইয়ের উপরে ভরসা করতে পারছেন না বলেই এমন একটা ব্যবস্থার কথা ভাবছেন ভবতারণবাবু।

আবার কিছুটা চুপচাপ।

নীরবতা ভেঙে ভবতারণবাবুই আবার বলেন, তুই আমার প্রথম প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে গিয়েছিলি।

কোন্ প্রশ্ন বাবা ?

কৃশানুকে তোর কেমন লাগে ?

হঠাৎ ওভালটিনের গ্লাসটার দিকে নজর পড়ে ইভার। বলে, ওই যাঃ! ওভালটিনটা তুমি এখনও খাও নি ? জুড়িয়ে জল হয়ে গেল বোধ হয়।

গ্লাসটা তুলে দেয় বাপের হাতে। তাতে চুমুক দিয়ে ভবতারণ বলেন, ডাইভারসন্স ফর এ সেকেণ্ড টাইম ! সো য়ু ডিস্যাপ্রুভ।

কি ?

পাত্রহিসাবে কৃশানুকে। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার এড়িয়ে গেলি কিনা !

ইভা লক্ষ্য করে এবার পূর্ণদৃষ্টিতে ঘোষালসাহেব তাকিয়ে আছেন তার দিকে। সন্ধানী গোয়েন্দা বাপের এ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে সে চেনে। পাছে ওর মনের কোন অজ্ঞাত রহস্যকে টেনে বার করে আনেন তাই তাড়াতাড়ি জোর দিয়ে বলে ওঠে, না না, ডিস্যাপ্রুভ করব কেন ? কৃশানুবাবু তো চমৎকার

লোক। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অনেক কথাও হয়েছে নানা বিষয়ে। আমার তো খুব ভালই লাগে ওঁকে—

আরও কিছু হয়তো এক নাগাড়ে বলে যেত সে, কিন্তু বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। বর্মা চুরুটটা ধরা আছে দাঁতে, এক হাতে দেশলাই, অপর হাতে কাঠি, তীব্র অভিনিবেশের সঙ্গে তাকিয়ে আছেন ভবতারণবাবু, শুনছেন কৃশানুর পক্ষে ইভার সওয়াল।

ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠেছে ইভা। মাঝখানেই থেমে যায় সে।

বর্মা চুরুটটা নিপুণভাবে ধরিয়ে ধীরেসুস্থে ভবতারণবাবু বলেন, কৃশানুর সঙ্গে তোর কি ধরনের আলাপ হয়েছে?

প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে পারে না ইভা। বাপের সন্ধানী দৃষ্টিকে সে ভয় করে। উনি কি কিছু বুঝতে পেরেছেন, সন্দেহ করছেন কি কিছু? সে প্রতিপ্রশ্ন করে একটা, কি ধরনের আলাপ মানে?

আই মীন ইস হি এ মিয়ার অ্যাকোয়েন্টেস অফ ইয়োর্স, অর এ ফ্রেণ্ড অলরেডি?

জবাবটা কি ভাবে দেওয়া যায় বুঝে উঠতে পারে না, তাই বলে, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ বাবা?

না, তুই বলছিলি না যে ওর সঙ্গে অনেক আলাপ হয়েছে তোর, তাই ভাবছিলাম তোর পক্ষে প্রশ্নটা উত্থাপন করা চলে কি না, আই মীন, কৃশানু এখন বিয়ে করতে ইচ্ছুক কি না।

সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করে তোমাকে জানাতে পারি।

না, এখন নয়। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। আগে এই চৌধুরী-সাহেবের ব্যাপারটা মিটুক। ভদ্রলোক কানপুর থেকে এতদূর আসছেন, মেয়ে তাঁকে দেখাতেই হবে। তারপর ও কথা।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ইলাকে পড়াতে এসে কৃশানু দেখল ইভা আগে থেকেই বসে আছে লাইব্রেরী ঘরে। একরাশ নতুন বই এসেছে। সেগুলোতে ব্রাউন কাগজের মোড়ক লাগিয়ে নম্বর দিয়ে খাতায় লিখে আলমারীতে তুলছে।

কৃশানু আজকাল অনেক সহজ হয়ে গেছে। ইভাকে অনায়াসে সে বলতে পারে, একা হাতে আপনার অসুবিধা হলে আমরাও সাহায্য করতে পারি—না কি বল ইলা?

বইয়ের মলাট লাগাতে লাগাতে আড়চোখে ইভা একবার চেয়ে দেখে। মধুর হেসে বলে, সেদিন বলেছিলাম, মনে আছে ইলু, ছুটি তিনরকমের ? আজ তার উদাহরণ দিচ্ছি। এটাকেই বলে ফ্রেঞ্চ-লীভ !

ইলা বলে আমার তো স্কুলের ছুটি বাপু এখন। টাস্কও আমার সব হয়ে গেছে। আসুন মাস্টার মশাই, আমরা সবাই মিলে মলাট দিই।

কৃশানুর তাতে আপত্তি নেই। সেও বসে যায়। তিনজনে হাতে হাতে মলাট দিতে থাকে। সিলিঙ ফ্যানের একটানা একটা কটকটে আওয়াজ। অদূরে কোন বাড়িতে রেডিওতে বাজছে ছায়ানটে সেতার। কৃশানুর আত্ম-বিশ্বাস অনেকটা বেড়ে গেছে। লক্ষ্য করে দেখে, ইভা আজ কিছুটা বেশীই প্রসাধন করেছে। গয়নাগাঁটি নেই, হালকা সাজ, তবু তার মধ্যে থেকেই বৈশিষ্ট্যের একটা সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে। ময়ূরকণ্ঠি রঙের একটা মাইশোর সিল্ক পরেছে ঘুরিয়ে। বাড়ির বাইরে গেলেই সচরাচর এ জাতীয় পোশাকী শাড়ি ভাঙে মেয়েরা, না কি বড়লোকের মেয়েরা বাড়িতেও পরে এ ধরনের শাড়ি? কি জানি, কৃশানুর ঠিক ধারণা নেই। রজনীগন্ধার ডাঁটার মত মসৃণ গ্রীবায় লেগে আছে হালকা পাউডারের ছোঁওয়া। অদ্ভুত মৃদু একটা সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে ওর সর্বাবয়ব থেকে। কোন দামী সেণ্ট ?

ইলা হঠাৎ বলে ওঠে, মেজদিটা যদি এসময় থাকত তো বেশ মজা হত। ওদের আবার গ্রীষ্মের ছুটি নেই।

কৃশানু মুখ তুলে বলে, গ্রীষ্মের ছুটি নেই ? কেন ?

বাবে। ওদের হস্টেল যে দার্জিলিঙে। সেখানে গরমের দিনে আবার কষ্ট কি ? ওদের এক্সমাসের ছুটিটাই বড়।

ও। কৃশানু ছেদ টানে এ প্রসঙ্গের।

কিন্তু ইভা এখনও এ প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে চায়, বলে, মাস্টার মশাই যেন খুব হতাশ হলেন, মনে হচ্ছে ?

কৃশানু অবাক হয়ে বলে, কেন, আমি হতাশ হব কোন্ দুঃখে ?

ইলুর মত আপনিও হয়তো ভাবছেন এ সময়ে আইভি থাকলে বেশ মজা হত। দুঃখ মানুষের কত কারণে হতে পারে।

তাঁকে আমি চিনিই না। অমন অদ্ভুত কথা ভাবতে যাব কেন আমি ?

ঠিক এই সময় এসে হাজির হল কেষ্ট বেয়ারা। পর্দাটা উঁচু করে ধরে বললে, ছোড়দিমণি, তোমার টেলিফোন এসেছে।

ইলুর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই এ আড্ডা ছেড়ে ওঠার। বড়দির হাত দুটি ধরে বলে, ঠিক মাসীমা, তুমি দেখ না বড়দি।

ইভা ছোট্ট একটা ধমক দেয়, ছিঃ! ইলু, তোমাকে ডাকছেন, তুমি যাও, শুনে এস কি বলছেন।

অগত্যা ইলাকেই যেতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে কৃশানুও উঠে পড়ে, আমিও চলি।

সে কি? কেন? কাজ আছে নাকি কোনও? বিস্মিত ইভার প্রশ্ন।

না, কাজ নেই কোন। মানে—

তাহলে বসুন।

কৃশানু ইতস্ততঃ করে।

ইভা হেসে বলে, একলা পেলেই আপনাকে কামড়ে দেব, একথা মনে করেন কেন আপনি?

গরমেই বোধ হয়, একেবারে ঘেমে উঠেছে কৃশানু। বসে পড়ে অগত্যা। মাথা নীচু করে ব্রাউন কাগজ কাটতে থাকে কাঁচি দিয়ে। নীরবতা ভেঙে ইভাই প্রশ্ন করে আবার, আপনার কোন বান্ধবী নেই, না?

শুধু বান্ধবী নয়, বন্ধুও নেই কোন আমার।

সে কি? কেন?

কেউ আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে নি বলেই বোধ হয়।

আপনিও নিশ্চয়ই নিজে থেকে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেননি?

তা ঠিক। আমার চরিত্রে কতকগুলো দুর্বলতা আছে। তাই বোধ হয় কারও সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় না। আমি ঠিক, মানে মিশুকে নই।

হেসে ইভা বলে, এটা খুব প্রশংসনীয় গুণ নয় নিশ্চয়ই। তা সেটার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে দু-একজনের সঙ্গে জোর করে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করাই তো উচিত।

তা উচিত, কিন্তু তেমন লোক আর পাচ্ছি কোথায় বলুন?

ইভা একটু চুপ করে থাকে। কিন্তু আর কিছু বলে না কৃশানু। একটা নিঃশ্বাস পড়ে ইভার। বোঝে ও প্রসঙ্গটার জের টেনে আর কিছু বলা বেহায়ার মত শোনাবে। তাই নূতন পথে শুরু করে আলাপ, সেদিন আপনি বলছিলেন অনেকগুলি টিউশানি করতে হয় আপনাকে। সবসুদ্ধ কতজনকে পড়ান?

সকালে দুজন, আর সন্ধ্যায় একঘণ্টা এখানে।

তাহলে নিজের পড়া করেন কখন ?

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে।

সকালের টিউশানি দুটো ছেড়ে দিতে পারেন না ?

একটু হেসে কৃশানু বলে, আমার মেস খরচ আর পড়াশুনার জন্য অন্য কোথা থেকেও আমি সাহায্য পাই না।

আবার কিছুটা নীরবতা।

ইভাই আবার বলে, আপনাকে একটা কথা বলব ?

বলুন।

সকালের ছাত্র দুটিকে পড়াতে কত পান আপনি ?

ত্রিশ টাকা।

আপনি তাহলে ও দুটো ছেড়ে দিন।

কৃশানু কথাটার যৌক্তিকতা বুঝতে না পেরে ওর দিকে তাকায়। এবার ইভাই নত করে দৃষ্টি, বলে, বি. এ.টা দেব ভাবছি প্রাইভেটে। সন্ধ্যাবেলা ইলুর সঙ্গে আমাকেও যদি একটু দেখে দেন। আমার কম্বিনেশন ছিল সংস্কৃত সিভিক্স আর লজিক। এবার নেব ফিলজফি আর ইকনমিক্স। পারব না প্রাইভেটে পাস করতে ?

কৃশানু হেসে বলে, না, পারবেন না।

ইভা চটে উঠে বলে, কি করে জানলেন ?

আমি জানি।

ছাই জানেন।—ঠোঁট উল্টে বলে ইভা। আপনার মত আমার মাথায় তো গোবর পোরা নয়—রীতিমত সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করেছিলাম, আপনার মত নাইন্থ হইনি !

কৃশানু একটু অবাক হয়। সে আই. এ. তে বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম স্থান অধিকার করেছিল তিন বছর আগে। ইভার জানার কথা নয়। নিশ্চয়ই কৌতূহলী ইভা খোঁজ নিয়ে জেনেছে খবরটা। খুশীও হয় একটু, বলে, সে জন্য বলছি না, সেকেণ্ড যে নাইন্থের চেয়ে ভাল সেটুকু আমিও বুঝি। আপনি পাস করতে পারবেন না অন্য কারণে।

কি কারণ শুনি ?

কারণ পাস করার ইচ্ছাই নেই আপনার। আপনি চাইছেন এই উপলক্ষ্য

করে একজন দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করতে, সুতরাং পাস আপনি কিছুতেই করতে পারবেন না। মিছামিছি বদনাম হবে আমার।

ইভা চটে উঠে বলে, অত মনস্তত্ত্ব বিচার আপনার না করলেও চলবে। বলুন, নেবেন আপনি এ ভার?

উত্তর দিতে একটু দেরী হয় কৃশানুর। একটা চটুল রসিকতা করবার জন্ত দুরন্ত লোভ হচ্ছিল তার। 'নেবেন আপনি এ ভার' কথাটা বিকৃত অর্থ গ্রহণ করে, বিস্ময়ের একটা অভিব্যক্তি প্রকাশ করে ওর বলতে ইচ্ছে করছিল আপনার ভার? ইভা নিশ্চয়ই লজ্জা পেত তাহলে! কি বলত সে? কিন্তু কিছুতেই সাহস সংগ্রহ করে উঠতে পারে না।

ইভা কিন্তু গম্ভীর হয়ে ওঠে, বলে, কি হল, বললেন না?

কৃশানু মন স্থির করেছে এইমাত্র যে চটুল রসিকতা করবার লোভ হয়েছিল সেই মনোবৃত্তিই ওকে সাবধান করে দিল যেন। ওর মনে হল নিজের উপর যথেষ্ট সংযম নেই ওর, ওর মনের টাইরডের নাটগুলো ঢিলা। এ লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করলে ভবিষ্যতে হয়তো লজ্জা রাখার স্থান থাকবে না। তাই সেও গম্ভীর হয়ে বলে, না।

কয়েকটা মুহূর্তের নৈঃশব্দ। শুধু বিস্মিত নয়, একটু আহত হয়েই ইভা বলে, কিন্তু কেন বলুন তো?

কৃশানু উঠে পড়ে বলে, কারণটাও বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, যে কারণে আপনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সত্ত্বেও আপনার বন্ধুত্ব গ্রহণ করতে পারলাম না সেই কারণেই আপনার এ দান প্রত্যাখ্যান করতে হল আমাকে। আমাকে আপনি মাফ করবেন।

ইভাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল কৃশানু ঘর ছেড়ে।

নীল রঙের যে খামটা এবার এল পাটনা ডাকঘরের ছাপ কপালে এঁটে তার উপর রামনন্দনের নাম লেখা ছিল না, লেখা ছিল গোটা গোটা অক্ষরে শ্রীকে. রায়।

চিঠিখানা নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করল কৃশানু। খুলতে ইচ্ছা করছিল না। মনে হচ্ছিল এর ভিতরে নিশ্চয়ই আছে এবার মেয়েটির পরিচয়, নাম, ধাম। ওর মনে হচ্ছিল নামটা জানলেই বুঝি ছিন্ন হয়ে যাবে রহস্য-

যবনিকা। ধূপছায়া রঙের শাড়িপরা পাখীর পালকের মত হালকা স্বপ্নালু যে মেয়েটিকে ও তিল তিল করে সৃজন করেছে মনে মনে, তার সঙ্গে যদি নামটা ঠিক খাপ না খায়? যদি নামটা শোনামাত্রই অন্তর্হিত হতে শুরু করে ঐ ধূপছায়া রঙের শাড়িখানা' কিসে যে কি হয় তা ও জানে না, যেমন জানে না কিসে কি হতে পারে। এই একটি মেয়ের কথা সে ভেবেছে অনেকবার—এমন কি স্বপ্নও দেখেছে, কিন্তু না জাগর-চিন্তা, না নিদ্রার-স্বপ্ন, কখনও ওর মন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেনি। অপরিচিতাই ওব একমাত্র পরিচিত নারী যাকে নিবাবরণ করতে পারি নি অন্তরবাসী দুঃশাসনটা।' তার শ্লীলতাহানি কিছুতেই বরদাস্ত কববে না কৃশানু।

শেষ পযন্ত দুরন্ত কৌতূহলেরই জয় হল কিন্তু, খুলে ফেললে খামটা—

'প্রীতিনিলয়েষু, আপনি যে শেষ পযন্ত আমাকে এভাবে বিপদে ফেলতে পারেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। গতবারেব দীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠিখানাতে যে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছিলাম, বর্তমান বিপদের তুলনায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এবার যখন ফুলেশ্বরী আঁচলের আড়ালে খোলা খামটা লুকিয়ে এনে হাজিব হল আমাব দববারে, তখন তার চোখমুখ দেখে চমকে উঠেছিলাম আমি। ভেবে পাইনি চিঠি পাওযা সত্ত্বেও এত কান্না কেন কেঁদেছে ও। খামেব ভিতর থেকে যখন বের হল এক চিলতে কাগজে একটি মাত্র লাইনের চিঠি তখন বুঝতে পারলাম সমস্যাটা, একটি মাত্র বাক্যে কি বলতে চায প্রবাসী বামনন্দন তাব প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীকে? এমন কি কথা হতে পারে? অশিক্ষিত হলেও মূর্খ নয ফুলেশ্বরী, অর্থনীতির মোটা মোটা বই সে পড়ে নি, তবু এটুকু বোঝে যে এক ছত্রের চিঠি খামের বদলে পোস্টকার্ডে লিখলে দশটা নয়া পয়সা বাঁচে। তার সে প্রশ্নভরা ব্যাকুল দৃষ্টির সামনে হতভম্ব হয়ে পড়লাম। ওব মূক প্রশ্নের উত্তব আমাব মুখে জোগালো না। বাধ্য হযে যা মুখে এল তাই বললাম, রামনন্দন লিখেছে যে দু-একদিনের মধ্যেই সে এখানে আসছে, তাই আর কিছু লিখল না।

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওব। সামলে নিয়ে বলে, ওকরাকে কহ্ দিহ কি ফিন্ লেফাফামে চিট্ঠিয়া না ভেজে।

দোহাই আপনাব, দিন দশেকেব ছুটি দিয়ে রামনন্দনকে দেশে পাঠান, আমার মুখ রক্ষা করুন। এ অনুরোধ করার আরও একটি গুরুতর কারণ আছে। ফুলেশ্বরীব সংসারে দ্বিতীয প্রাণী নেই—ওর বৃদ্ধা পিসিমার উপর

ভরসা করা যায় না। গতকাল ওকে পরীক্ষা করে দেখেই—মনে হয় দিন তিন-চারকের মধ্যেই ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়বে। তখন ওর স্বামীর উপস্থিতির প্রয়োজন। ফুলওয়ারি গ্রাম থেকে আমাদের বাড়ি পাক্কা চার মাইল রাস্তা। এরকম অ্যাডভান্সড অবস্থায় ওর পক্ষে দৈনিক আট মাইল হাঁটাও অত্যন্ত বিপদজনক। ওরা বলেই পারে—কিন্তু সেটা উচিত নয়। সম্ভবতঃ রামনন্দনের হাতে মাসের এ শেষ সপ্তাহে গাড়ি ভাড়ার টাকাও নেই। সেক্ষেত্রে ওকে কিছু টাকা দেবেন। ভয় নেই, টাকাটা আপনার মার যাবে না, আমি জামিন থাকলাম। ও হ্যাঁ, আমার নামই তো আপনি জানেন না, গর-ঠিকানার জামিনদারের আবার দাম কি? তাই আমার নাম ও ঠিকানা পত্রশেষে জানালাম। যাঁর কাছে অধমর্ণ থাকলাম তার পুরো নামটা জানবার অধিকারও আমার আছে নিশ্চয়ই।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

স্বাহা মিত্র।'

স্বাহা মিত্র।

মিত্র? অর্থাৎ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণকন্যা সে নয়? ওর ডিডাকসন্ সব ভুল? বাকিগুলোর সেই রকম ভুল নাকি? অনূঢ়া আর ধনীকন্যা?

কিন্তু মিত্র পদবীটা অদ্ভুত 'স্যুট' করেছে ওকে। কৃশানুর সঙ্গে ওর সম্পর্কটাই যেন ঘোষণা করছে পদবীটা। আর নামটা? আশ্চর্য, এ কী দৈবের নির্দেশ।

একটা জিনিস কিন্তু বোঝা গেল না। এরা একটা লেটার-হেড কাগজে চিঠি লিখেছেন স্বাহা দেবী। কাগজের মাথায় লেখা আছে 'ডাঃ অপরেশ মিত্র, এম বি বি এস।' অনুমান করা কঠিন নয়, ইনি স্বাহা দেবীর অভিভাবক। বাবা হতে পারেন, দাদাও হতে পারেন। আর হ্যাঁ, ওর 'ডিডাকসন্' ধূলিসাৎ করে পরমারাধ্য পতিদেবতাও হতে পারেন। অথচ স্বাহা লিখছেন ফুলেশ্বরীকে পরীক্ষা করে তিনি বুঝেছেন যে আর দু-চার দিনের মধ্যেই সে মা হতে চলেছে। তাহলে স্বাহা দেবীও কি ডাক্তার? কিন্তু সে ক্ষেত্রে তিনি অপরের লেটার হেডে চিঠি লিখবেন কেন? মহিলা ডাক্তারের নিজস্ব লেটার-হেড প্যাড থাকা উচিত। তবে কি উনি নার্স? নার্স অথবা ডাক্তার হলে কৃশানুর চাইতে বয়সে বড় হবেন নিশ্চয়ই। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল কৃশানুর। কোন

অবিবাহিত মেয়েও ওর চাইতে বয়সে বড় এটা ভাবতেই কেমন খারাপ লাগে। কিন্তু অবিবাহিতই বা ভাবছে কোন্ সূত্রে!

ওর রোমান্সটা কেমন যেন চুপসে গেল। কী দরকার ছিল ওর কুলেশ্বরীকে পরীক্ষা করার ফলাফলটা একজন প্রৌঢ়া লেডী ডাক্তারের মত জানাবার? প্রৌঢ়া না হয় নাই হল, অন্ততঃ বছর ছয়েক আগে আই. এস-সি. পাস করেছে সে, ডাক্তার হতে হলে? চোপসানো বেলুন হাতে করে যেমন বিহ্বল হয়ে বসে থাকে বাচ্চা ছেলেরা—তেমনি করেই চিঠিখানা নিয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর মনে হল—যাই হোক শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে তাকে। জবাব একটি লিখে ফেলল মরিয়া হয়ে। নিজের মোটামুটি পরিচয় জানাল—শুধু নিজের পুরো নামটা আর লিখল না। নামের প্রসঙ্গে লিখল 'আমার পুরো নামটা আর জানানো সম্ভব নয়। প্রথমবারে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু এখন কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ করছি। মনে হচ্ছে, আমাব কথাটা আপনি বিশ্বাস করবেন না। ভাববেন, বানিয়ে বলছি। 'কে রায়' একটা মানুষের সংজ্ঞা হিসাবে যথেষ্ট আশা করি।'

আজ নিয়ে চারদিন। কৃশানু আসছে; ইলাকে পড়াচ্ছে, পড়া দিচ্ছে, পড়া নিচ্ছে, যথারীতি জলখাবার খেয়েও চলে যাচ্ছে। সেগুলি আসছে কেষ্ট বেয়ারার মারফত। এর মধ্যে একদিনও আসেনি ইভা নীচের ঘরে। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে কৃশানুর। কিন্তু এতে তো আশ্চয হবার কিছু নেই। এটাই তো স্বাভাবিক। সে ইলাকেই পড়াতে আসে, ইভার তো দৈনিক হাজিরা দেবার কোন কারণ নেই। সেটাই বরং অস্বাভাবিক। অথচ এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা নিত্য ঘটতে থাকায় সেটাই কেমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

মনে মনে হাসে কৃশানু। অভিমান! সেদিন পর পর দুটো আঘাত সে হেনেছিল ইভার উপর। তার বন্ধুত্ব স্বীকার করে নেয়নি, আর প্রত্যাখ্যান করেছিল তাকে বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করায়। অভিমান করতে পারে বইকি ইভা।

কিন্তু অভিমান করবারই বা কি আছে এতে? অভিমান অনুরাগের অনুগ। ছোট বোনের বেতনভুক মাস্টার মশায়ের উপর ধনীর দুলালীর আবার অভিমান কিসের?

সে যাই হোক অন্যায় কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে কৃশানুর তরফে। তাই পরপর চারদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে লাইব্রেরী ঘরে কোন বই বদলাবার প্রয়োজন হচ্ছে না এ বাড়ির বড়দিদিমণির। ইভার বন্ধুত্ব স্বীকার করতে সে ঠিক সাহস পায়নি। ভয় হয়েছে, কি জানি কোন নির্জন অবকাশে যদি দৃষ্টিপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় লীন হয়ে যায় ওর লজ্জাবরণ—আত্মবিস্মৃত কৃশানু যদি বিসদৃশ কিছু করে বসে! মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে সে কেমন যেন একটা অস্বোয়াস্তি বোধ করে। ইভার সহৃদয় ব্যবহারে নিঃসন্দেহে সে মুগ্ধ হয়েছে, আন্তরিকতায় উৎফুল্ল হয়েছে, তার প্রতি সহানুভূতি জেগেছে, প্রীতির একটা সম্পর্ক স্বীকার করতে পারলেই যেন স্বস্তি পায় বেচারি।

গতকাল সে খাবার খায়নি। খিদেয় পেটে ইঁদুরে ডন মারছে, তবু বলেছিল, আজ আর খাব না, ওটা নিয়ে যাও কেষ্ট।

কেষ্ট নীরবে খাবারের থালাটা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

তবু নেমে আসেনি ইভা। খোঁজ নিতে আসেনি কেন তার এ প্রায়োপ-বেশনের আয়োজন। রাগ হয়েছিল কৃশানুর। এ জানলে সে কখনই ফেরত দিত না খাবারের থালাটা। তাই আজ আর আত্মসংবরণ করতে পারে না—ইলাকে বলে, তোমার বড়দির কাছ থেকে আলমারীর চাবিটা নিয়ে এস তো ইলু। বাস্কিনের মর্ডান পেইণ্টার্সটা একবার দেখতে হবে।

ইলু মাথা নীচু করে উপরে উঠে যায়। অল্প পরে ফিরে আসে চাবির থোকাটা নিয়ে। আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না, বলে, তোমার বড়দিকে দেখছি না আজ কদিন?

ইলা অঙ্কের খাতাটার উপর একেবারে ঝুঁকে পড়ে। অস্ফুটে বলে, বড়দি নেই।

নেই! চমকে ওঠে কৃশানু, কারণ সেই মুহূর্তেই টপটপ করে ঝরে পড়ে দুফোঁটা চোখের জল জি. সি. এম.-এর ব্রাকেটের উপর।

এ কী, তুমি কাঁদছ ইলু?

এরপর আর বাঁধন মানে না ইলার উচ্ছ্বসিত কান্নার বন্যা। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে দুহাতে মুখ ঢেকে। কৃশানু ওর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে, ছিঃ, কাঁদে না। কি হয়েছে? কোথায় গেছে তোমার বড়দি?

শ্রীরামপুরে।

শ্রীরামপুরে? সেখানে কে থাকেন?

শ্রীরামপুরে বড়দির শ্বশুরবাড়ি।

একটু অবাক হয় কৃশানু। সে শুনেছে বিয়ের পর সেই যে রাগারাগি করে চলে এসেছিল ইভা, তারপর আর এতদিন ওমুখো হয়নি। আজ হঠাৎ এতদিন পরে সে আবার শ্বশুরবাড়ি গেল কেন?

ইলা একটু সামলে নিয়ে বলে, বড়দিকে কি আর ওরা আসতে দেবে না মাস্টার মশাই?

আসতে দেবে না কেন? নিশ্চয় দেবে। দিদি শ্বশুরবাড়ি গেলে বুঝি কাঁদতে হয়! বোকা মেয়ে!

ইলা একটু ইতস্তত: করে—যেন কথাটা মাস্টার মশাইকে বলা উচিত হবে কিনা স্থির করে উঠতে পারে না। তারপর চুপি চুপি বলে, ওরা যে বড়দিকে মারে!

কথাটা না শোনা থাকলেও আন্দাজ করতে পারে কৃশানু; তবু অস্বীকার করে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, দূর পাগল মেয়ে! বাজে কথা! তা হলে বড়দি কখনও যেত ওখানে?

ইলা আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বাধা পড়ল। ঘরে এলেন ভবতারণবাবু। এ সময়ে তিনি এঘরে আসেন না কখনও, অন্ততঃ ইতিপূর্বে কখনও আসেননি। কৃশানু সসম্মানে উঠে দাঁড়ায়।

ভবতারণবাবু বলেন, আপনার ছাত্রীকে আজ একটু সকাল সকাল ছুটি দেবার একটা আর্জি আছে মাস্টার মশাই। একটা ডান্স ড্রামা দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ আছে, ইফ্ য়ু কাইণ্ডলি পারমিট, আপনার ছাত্রীটিকেও নিয়ে যেতাম।

এ কোন ব্যঙ্গ নয়, এই ধরনের মানুষ ভবতারণ। এ মুহূর্তে তিনি ইলার বাপ নন, দোর্দান্ত প্রতাপ পুলিস অফিসার নন—একটি আবেদনকারীর মূর্ত প্রতীক।

শশব্যস্ত কৃশানু বলে, নিশ্চয় নিশ্চয়, অল ওয়ার্ক অ্যাণ্ড নো প্লে এতো হতেই পারে না। আজ তোমার ছুটি ইলা।

তুমি তা হলে তৈরি হয়ে নাও ইলু। সাতটায় শো—লুক সার্প! আর নবীনকে গাড়িটা বার করতে বলে দাও।

ইলা ধীর পদে চলে যায়। বাবা কখনও কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান না; এ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে সে একটু অবাক হয়েছিল। অন্য সময়ে হলে উচ্ছ্বসিত

হয়ে উঠত। কিন্তু মনটা ভারাক্রান্ত থাকায় একেবারে খুশীয়াল হয়ে উঠবার অবকাশ পায় না।

ইলা চলে গেলে ঘোষালসাহেব একটা সোফায় বসে পড়েন, বর্মা চুরুটটায় আগুন ধরাতে ধরাতে প্রশ্ন করেন, প্রিপারেশন কেমন হচ্ছে?

প্রশ্নটা খুবই সঙ্গত। প্রাইভেট টুইশানিতে অভ্যস্ত কৃশানু জানে অভিভাবকদের এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিতে হয়। তবে নাকি ভবতারণ ঘোষালের তরফে এ প্রশ্ন প্রথম উঠল আজ, তাই জবাব দিতে একটু দেরী হল ওর। সংসারের কোন কথায় থাকেন না ঘোষালসাহেব। আজ ইভা না থাকাতেই বোধ হয় পিতার কর্তব্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাঁর মনে। কৃশানু বলে, অন্যসব সাবজেক্ট তো ভালই তৈরি হয়েছে, অঙ্কটাতেই একটু কাঁচা!

ভবতারণ একটু অবাক হয়ে বলেন, ম্যাথমেটিক্স? ম্যাথমেটিক্স ইস্ নট্ য়োর সাবজেক্ট।

এবার অবাক হওয়ার পালা কৃশানুর। ভবতারণবাবু তাহলে তার প্রিপারেসনের কথা জিজ্ঞাসা করছেন, মেয়ের নয়। বলে, আমি ভেবেছিলাম, ইলার পড়াশুনার কথাই জিজ্ঞাসা করছেন আপনি। আমার প্রিপারেসন ভালই হচ্ছে।

ফার্স্ট ক্লাস থাকবে?

তা কি করে বলব বলুন। চেষ্টা তো করছি।

টুইশানিতে বড্ড সময় নষ্ট হয়—তাই না?

আজ্ঞে হ্যা, তা তো হয়ই, নিজের পড়াশুনা করবার সময়ই পাই না।

সাপোস্, য়ু গিভ আপ্ সাম অফ দেম্? সাপোস্, আই ডাব্‌ল্ য়োর ফীস? না না, কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই। তোমার আত্মমর্যাদায় বাধলে এটাকে ঋণ হিসাবেও ধরে নিতে পার তুমি। পাস করে চাকরি তো করবেই—তখন ক্রমে ক্রমে না হয় শোধ করে দেবে। ফার্স্টক্লাস কিন্তু পেতেই হবে তোমাকে।

কৃশানু চুপ করে থাকে। প্রস্তাবটা অভাবিত। তাছাড়া হঠাৎ ওঁর তুমি সম্বোধনটাও কানে বাজতে থাকে ওর। বুঝতে পারে তাকে ভালবেসে ফেলেছে এ পরিবারের সকলেই। এই ধনী-পরিবারের সে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে ক্রমে, তাই ওর অর্থকৃচ্ছ্র তার জন্য এদের মনে জন্মেছে একটা বেদনা-

বোধ। তাই মেয়ে আজ নতুন করে বি এ. পরীক্ষা দিতে চায়—বাপ মহাজনী কারবারের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছেন।

যাক ও কথা। পরে ভেবে দেখে না হয় জানিও আমাকে। আমি এখন অন্য একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।

উৎসুককণ্ঠে কৃশানু বলে, বলুন।

চুরুটের ছাইটার দিকে তাকিয়ে ভবতারণবাবু ইংরাজিতে বলেন, কথাটা একটু গোপনীয় এবং পারিবারিক।

কৃশানু চুপ করে অপেক্ষা করে। চুরুটের ছাইটাকে যেন আর ধরে রাখতে পারছে না—সেটার অবস্থা যেন ভবতারণের মতই। ছাইদানি ছিল না হাতের কাছে। ঘোষালসাহেব উঠে গেলেন জানলার কাছে। ছাইটা বাইরে ঝাড়লেন। যেন মনটাও ঝাড়লেন সেই সঙ্গে। মুখটা না ঘুরিয়েই প্রশ্ন করেন, ইভার সঙ্গে তোমার কতদূর ইন্টিমেসি হয়েছে?

কান দুটো লাল হয়ে ওঠে কৃশানুর। এ কী অসঙ্গত প্রশ্ন! উনি কি কিছু আন্দাজ করেছেন? কিন্তু অন্যায় অশোভন আচরণ তো কিছু করেনি কখনও। কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না। তিন কি চার সেকেণ্ড অপেক্ষা করেই এদিকে ফেরেন ঘোষালসাহেব। ওর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলেন, য়ু নিড্‌ন্'ট ফ্লাশ্! বিংশ শতাব্দী প্রৌঢ় হতে চলেছে। নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব এমন কিছু অদ্ভুত জিনিস নয় আজকের দিনে। তুমি অবশ্য বলতে পার, তাহলে বুড়ো বাপের এ নাক গলাবার চেষ্টা কেন। বলছি সে কথা।

এসে বসেন ফের সোফাটায়। এবার আর ওর দিকে তাকাচ্ছেন না। মেদিনী নিবদ্ধ দৃষ্টি। ধীরে ধীরে উনি বলতে থাকেন, ইভার দুর্ভাগ্যের কথা কিছুটা তোমায় বলেছিলাম একদিন। সী কুড্'ট কম্প্রোমাইস্ হারসেল্ফ উইথ হার হাস্‌ব্যাণ্ড। চলে এসেছিল সব সম্পর্ক অস্বীকার করে। ওর শ্বশুর জীবনবাবু শ্রীরামপুরের বড় জমিদার। সাবেকি আমলের বনেদী পরিবার। জমিদারী আজ নেই—কিন্তু জমিদারী চাল আর মেজাজটা আছে। সুকান্ত ওঁর একমাত্র ছেলে—অপদার্থ! ঠিক অপদার্থ অবশ্য নয়, লেখাপড়া শিখেছে, বুদ্ধি বিবেচনাও আছে, বাট্ হি হ্যাস্ গন টু ডগ্‌স্। ছেলেবেলা থেকেই কতকগুলো বখাটে ছেলের সঙ্গে মিশে কেমন বিগড়ে গেছে। থিয়েটার, ক্লাব, ফুটবল টুর্নামেণ্ট এই নিয়েই আছে। দুর্ধর্ষ ডেয়ারিং, মরবে কোনদিন বেঘোরে। একবার একটা দাঙ্গার কেসে ফেঁসেও গিয়েছিল—আমিই বাঁচিয়ে

দিই—সে কথা ইভাও জানে না। মদ আমরাও এককালে প্রচুর খেয়েছি, কিন্তু—, যাক ও কথা।···দিন চারেক আগে ইভার শ্বশুরবাড়ি থেকে একজন খবর নিয়ে এল ওর শ্বশুর মরণাপন্ন, বউমাকে দেখতে চান। আমার আপত্তি ছিল ইভাকে পাঠানোতে। এতদিনে আমার বিশ্বাস হয়েছে সুকান্তের সঙ্গে একদিন বিবাহ-বিচ্ছেদ করতেই হবে ইভাকে। সেক্ষেত্রে ওর যাওয়াটা উচিত নয়। জীবনবাবুর সঙ্গে আমাব প্রচণ্ড বাদানুবাদ হয়েছিল একদিন। আমার বিশ্বাস সব জেনেশুনেই তিনি সর্বনাশ কবেছেন আমার মেয়ের। তাই তিনি নিজে যখন ইভাকে ফেরত নিতে এলেন তখন অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাঁকে। আজও তাই ইভাকে পাঠাবার ইচ্ছা ছিল না আমার ; কিন্তু ও জোর করল। বলল, তিনি তো আমার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, বিয়ে দিলে তাঁর ছেলে শুধরে যাবে। সেটা ভুল হয়েছিল তাঁর। ভুল ভুলই, অপরাধ নয়! সেইজন্যে তাঁর মৃত্যুর সময়ে এত বড় আঘাত দেওয়া কি উচিত হবে বাবা ?

তোমাকে কি বলব কৃশানু, ওর মহানুভবতায় আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ছেলেবেলায় কোথায় যেন পড়েছিলাম—তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন ?—ওর কথা শুনে সেই উদ্ধৃতিটাই মনে পড়ে গেল আমার।

একটু দম নিয়ে ঘোষাল সাহেব বলেন, আজ চতুর্থ দিন। মেয়েটা গিয়ে পর্যন্ত কোন খবর পাঠায়নি। তাকে বারবার বলে দিয়েছিলাম চিঠি লিখতে। অথচ আজও কোন খবর এল না। আমি নিজেই যেতে পারতাম, কিন্তু যাওয়াটা বোধ হয় উচিত হবে না। জীবনবাবুকে আমার দরজা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, ওরা সেটা ভোলেনি নিশ্চয়। আমাকে দেখে ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন, এ সময়ে সেটা ঠিক নয়। কিন্তু আমিও তো মানুষ! একবার ভেবেছিলাম, কেষ্ট, নবীন অথবা আর কাউকে পাঠাই, কিন্তু ওরা অশিক্ষিত মূর্খ, ভরসা হয় না তাই। শেষে ভাবলাম, তোমার সঙ্গে কথাটা আলোচনা করি। ইভা বলেছিল, তোমাদের দুজনের মধ্যে 'সামসর্ট অফ এ ফ্রেণ্ডশীপ গ্রো' করেছে। তুমি গেলে হয়তো আরও ইন্টিমেট খবর পেতে পারব। আই মীন, হাউ শী ওয়াজ রিসিভড বাই সুকান্ত। তিনটে দিন, চারটে রাত, কম তো নয়!

ইলা এসে দাঁড়ায়। ফিকে ভায়োলেট রঙের একটা নাইলনের ফ্রক পরেছে,

মাথায় বো, পায়ে সাদা মোজা আর জুতো। মুখে পাউডারও বুলিয়েছে একটু। ভবতারণ বলেন, গাড়িটা বের করেছে কি নবীন?

এ সব ইঙ্গিত এরা সহজেই বোঝে। ইলার কোন অসুবিধা হয় না বুঝতে যে, কৃশানুরা এখন এমন কিছু আলোচনা করছে যাতে তার এখানে না থাকাই কাম্য। তাই নিজে থেকেই বলে, আমি বরং গাড়িতে গিয়েই বসি বাপি।

ভবতারণ বলেন, থ্যাঙ্কু, ইয়েস।

ইলা চলে যায়।

এই সব 'থ্যাঙ্কু, উইথ য়োর পার্মিসন্স,' 'এক্সকিউস্ মি' এখনও ঠিক মত রপ্ত হয়নি কৃশানুর। বাপে-মেয়ের এ জাতীয় কথোপকথন যেন বড় কৃত্রিম। কিন্তু সে কথা চিন্তা করবার সময় পায়না। হঠাৎ একটা খাপছাড়া অসংলগ্ন প্রশ্নে সে চমকে ওঠে—হোয়াই ডোণ্ট্ ম্যারি কৃশানু?

এ কী অসংলগ্ন প্রশ্ন! কন্যার দুর্ভাবনায় ভবতারণ ঘোষাল কি চিন্তাধারার পারম্পর্য হারিয়ে ফেলছেন? না হলে পূর্বের আলোচনার সঙ্গে এ প্রশ্নের তো কোন সঙ্গতি নেই। ও জবাব দেবার আগেই ঘোষাল সাহেব আবার বলেন, বেটার ম্যারি আর্লি! অল্প বয়সে বিয়ে কর, তাহলে পরস্পরকে বোঝা যায়, পরস্পরকে মানিয়ে নেওয়া যায়, পরস্পরকে স্বীকার করা যায়।

নখটা খুঁটতে খুঁটতে কৃশানু বলে, আমার কোন আয় নেই।

জানি। কিন্তু পাশ করেই তো ভাল চাকরি পাবে তুমি।

পাস করেই চাকরি পাব তার গ্যারাণ্টি কোথায়?

আমি যদি গ্যারাণ্টি দিই?

এবার বিস্ময়ের মাত্রা আকাশচুম্বী হয়ে উঠছে কৃশানুর। বলে, আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি।

আবার সিগারের ছাইটা ঝাড়বার জন্য উঠতে হল ভবতারণবাবুকে। জানালার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে তেমনিভাবে বলেন, আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক অল্পবিত্তের একজন সচ্চরিত্র শিক্ষিত পাত্র খুঁজছেন। তোমার কথা ভবেশের কাছে শুনেছি, নিজেও দেখেছি। ন্যাচারালি তোমার কথাই মনে হয়েছিল আমার। আর্থিক অসুবিধা হবার কথা নয়। অ্যাট লিস্ট যু ক্যান সেফলি সেট অ্যাসাইড দ্য ফিনানসিয়াল আসপেক্ট অব দ্য প্রবলেম। মেয়েটি সুন্দরী, শিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী। অ্যাপারেণ্টলি একটু উচ্ছল প্রকৃতির। বাইরে থেকে মনে হতে পারে অতি লঘু চরিত্রের মেয়ে

সে,—বাট্ আই নো, শী ইস্ রিয়ালি গ্রেট অ্যাট হার্ট! আমি জানি, মনে মনে সে নিষ্পাপ!

কৃশানু যেন আর্টিস্টের সামনে সিটিং দিচ্ছে। এক তিলও নড়ে না। মিনিট খানেক কেউ কোন কথা বলে না। তারপর ভবতারণবাবু ফিরে এসে বসেন নিজের সোফায়। একেবারে অন্য গলায় শুরু করেন হোয়াটস্ য়োর অ্যাম্বিসন?

কৃশানু বুঝতে পেরেছে—অসংলগ্ন প্রশ্ন করছেন না ভবতারণবাবু। কন্যার জন্য দুশ্চিন্তায় এলোমেলো প্রশ্নের অবতারণা করছেন না মোটেই। পাকা ব্যারিস্টারের এলোপাতাড়ি প্রশ্নে সাক্ষী যেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে, তেমনি দিশেহারা হয়ে পড়লেও ওর বুঝতে অসুবিধা হয় না, সওয়ালে এই অসংলগ্ন প্রশ্নগুলিকে যখন সুসংবদ্ধ করা হবে তখন বোঝা যাবে বৃথা প্রশ্ন তাকে একটাও করা হয়নি। তাই সাবধানে জবাব দেয়, বড় হয়ে কি হব সেকথা ছেলেবেলা থেকেই ভাবছি। দুটো দিকে ঝোঁক ছিল আমার। বস্তুত দুটো অ্যাম্বিসন ছিল আমার। আজও আছে। এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোন্ দিকে ঝুঁকব বলা কঠিন। হয়তো দুটোর একটাও হব না, হব সাধারণ কেরানী।

সে দুটো কি?—চোখ বুজেই প্রশ্ন করেন ঘোষাল সাহেব।

ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখতাম বড় আর্টিস্ট হব আমি। পোর্ট্রেট পেইন্টার। মডেলার। ছবি আঁকার হাত আমার সহজাত।

হাসলেন ভবতারণ, বলেন, কার যেন দু লাইনের একটা কবিতা পড়েছিলাম:

> Doctor s fees are heavy, Lawyers fees are high,
> Artists are just supposed to entertain and die!

নেশা হিসাবে আর্টের সাধনা আমি খুব স্ট্রংলি রেকমেণ্ড করব, কিন্তু পেশা হিসাবে? নৈব নৈব চ! দ্বিতীয় সূত্রটা কি?

কৃশানু লজ্জা পেয়ে বলে, সেটা নেহাতই ছেলেমানুষি।

ছেলেবেলার চিন্তাধারা ছেলেমানুষের মতই হওয়ার কথা।

কৃশানু একটু ইতস্তত করে বলে, ছেলেবেলা থেকেই গোয়েন্দা গল্প আমার খুব ভাল লাগে। কোনাল ডয়েল, এডগার এলেন পো থেকে সব বিদেশী গোয়েন্দা গল্পই আমার পড়া শেষ। ক্রিমিনোলজির অনেক প্রামাণিক গ্রন্থও পড়ে ফেলেছি নেশার ঝোঁকে। তাই ভাবতাম বড় হযে শখের গোয়েন্দা হব।

এবারও হাসতে হাসতে ঘোষাল সাহেব বলেন, পেশা হিসাবে গোয়েন্দা হওয়া— আমি নিশ্চয়ই স্ট্রংলি রেকমেণ্ড করব, কিন্তু নেশা হিসাবে? নৈব নৈব চ!

কৃশানুও হেসে বলে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো।

ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে যারা কাজ করবে তাদের হতে হবে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের মত: দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ! একটু নেশা হলেই পদস্খলন অনিবার্য—তুমি আনডুয়্য রিস্ক নিয়ে বসবে। ক্লুগুলো যাবে নজর এড়িয়ে। নেশাখোরের স্থান এ নয়। অথচ পেশা হিসাবে—

দ্বারপ্রান্তে আবার এসে নীরবে দাঁড়ায় ইলা।

আয়াম সরি ইলু-মা!— উঠে পড়েন ঘোষাল সাহেব—চল যাই।

কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যান তিনি। তারপর হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, তাহলে শ্রীরামপুরে—

কাল সকালেই যাব আমি। বাধা দিয়ে বলে কৃশানু।

থ্যাঙ্ক্!

মেসে ফিরে কৃশানু দেখে তার চিঠির জবাব এসেছে। নিজের মোটামুটি পরিচয় সে দিয়েছে। স্বাহা মিত্র পাটনা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। ওর বাপ-মা নেই—আছে এক ছোট বোন, আর আছেন দাদা। তিনিই ডাঃ অপরেশ মিত্র এম. বি., বি. এস.। ভারতীয় ডাক্তারী খেতাবটাকে মার্কিন-মুলুক থেকে ঘষে মেজে উজ্জ্বলতর করে আনবার শুভ ইচ্ছা নিয়ে তিনি বছর তিনেক আগে আমেরিকায় গিয়েছেন। মানসিক রোগের ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই, তাই মনোবিজ্ঞানের উপর বিশেষ এক ডিপ্লোমা নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বর্তমানে 'আমেরিকান বোর্ড অফ সাইকিয়াট্রি অ্যাণ্ড নিউরোলজি'র একজন শিক্ষানবিশী। বোনও থাকে না স্বাহার কাছে। বোনের কথায় লিখেছে, সে আমার মাসীমার বাড়িতে থেকে পড়ে আপনাদের কলকাতাতেই। মাসীমার বাসার ঠিকানা ১৬১।১বি রাসবিহারী এ্যাভিন্যু। মহানির্বাণ মঠের কাছে। ওর ডাক-নাম টুকলি। আপনি একদিন গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করে আসবেন। তাকে আপনার কথা লিখেছি, সে খুব খুশী হবে। ওকে অবশ্য টুকলি বলে ডেকে বসবেন না যেন; ডাক-নামটা ও পছন্দ করে না। মানে পছন্দ ঠিকই করে, তবে বাইরের লোকের কাছে

গোপন করতে চায়। যদি ঘরের লোক হয়ে যান তাহলে টুকলি বলে ডাকলেও সে সাড়া দেবে নিশ্চয়, তা যতদিন না হচ্ছে ততদিন ওর নাম আপনার কাছে শ্রুতি। শ্রুতি মিত্র। বেশ মিষ্টি নাম, নয়? মেয়েটিও ভারী মিষ্টি। আলাপ হলে দেখবেন ভগ্নীগর্বে মিথ্যা বলিনি আমি। আপনি নিশ্চয়ই দেখা করবেন। ওর কাছ থেকে আপনার গল্প শুনব।

নামের প্রসঙ্গে লিখেছে—আপনার নামটা নিয়ে এ আবার কোন নতুন হেঁয়ালি শুরু করলেন? সব কথা স্বীকার করে নামটা গোপন করার অর্থ? অভিধান খুলেও তো 'কে' অক্ষরেব এমন কোন নাম মনে করতে পারছি না। যা এতই শ্রুতিকটু অথবা অশ্লীল যে কাউকে বলা যায় না! আপনি কিন্তু অদ্ভুত মানুষ!

কৃশানু সেই রাত্রেই জবাব লিখল। লিখল, সত্যিই আমি অদ্ভুত মানুষ স্বাহা। নিতান্তই অদ্ভুত। আমার সব কথা শুনলে অবাক হয়ে যাবে তুমি, কিন্তু সব কথা তো বলা যাবে না।···আমার মা নেই, বোন, দিদি, মাসী, পিসী কিছুই নেই। এমন কি দূর সম্পর্কের একটা দাদারও সন্ধান পাইনি যার বউকে বউদি বলে ডাকতে পারি। দুটো মনের কথা বলে মনটা হাল্‌কা করতে পারি। এই জন্যে অপরিচিতা অনাত্মীয়া কোন মহিলার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, আমাদের ক্লাসে পাঁচটি ছাত্রী পড়ে, আমি তাদেব নাম জানি, চিনি না। চোখ তুলে দেখিনি কোন দিন। সে জন্যে তোমার সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তোমার মাসীমার বাসায় যেতে পারলাম না। আলাপ করতে পারলাম না তোমার বোন টুকলির সঙ্গে।

···এতখানি লিখে হঠাৎ খেয়াল হল কখন অজান্তে তুমি লিখে শুরু করেছি এ চিঠি। ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লেখা যায়, কিন্তু মনে হচ্ছে থাক না! তুমিই আমার জীবনে প্রথম নারী যাকে এতটা মন খুলে চিঠি লিখতে পারি। হয়তো, আর হয়তো কেন—নিশ্চয়ই তার একমাত্র কারণ আমি জানি তোমার সঙ্গে কোনদিন আমার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হবে না—তাই চক্ষুলজ্জা এসে বাধা দিচ্ছে না আমাকে। আশা করি তুমি ও আপনির দূরত্ব রাখবে না এর পর থেকে।

যে কথা বলছিলাম। আমার মনকে আমি চিনতে পারিনি, নাগাল পাইনি মনের। আমার মন যেন আমার নিজের নয়, যেন তার উপর আমার কোন

জোর নেই। অতি সামান্য কারণে আমার মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, আবার অতি কঠিন আঘাতও আমি বুক পেতে সহ্য করতে পারি। খুব ছেলেবেলা থেকেই আমার আঁকার হাত। এখনও আমি ছবি আঁকি। স্কুলের ড্রইং মাস্টারমশাই আমাকে একটা ড্রইং-খাতা কিনে দিয়েছিলেন। সেটা ছিল সে যুগে আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। একদিন আমার বৈমাত্রেয় বড় ভাইয়ের সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া হয়। দোষ তারই ছিল, আক্রোশের বসে সে আমার খাতাখানা কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। আমার বিমাতা কোন দিন আমার পক্ষ নিতেন না। সেদিন কিন্তু তিনি আমার দাদাকে মারতে গিয়েছিলেন। মনে আছে, আমিই তাঁর হাত চেপে ধরেছিলাম,—বাধা দিয়েছিলাম। ওকে ক্ষমা করেছিলাম। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল অতটুকু ছেলের সহজ্ঞান দেখে। আর একদিনের কথা মনে আছে। আমাদের ক্লাশে গোবিন্দগোপাল ছিল সবচেয়ে বকাটে ছেলে। বড়লোকের ছেলে, অত্যন্ত আদুরে। ওর বাবার অনেক সুন্দর সুন্দর ছবির বই ছিল। মাঝে মাঝে এক আধটা বই ও নিয়ে আসত ক্লাসে। ছবির দিকে আমার বরাবর ঝোঁক। চেয়ে নিয়ে দেখতাম আমি। একদিন গোবিন্দগোপাল কি একটা রঙিন ছবির বই এনেছে। টিফিন-পিরিয়ডে লুকিয়ে লুকিয়ে কয়েকজন বন্ধুকে ছবিগুলো দেখাচ্ছিল আব কী গল্প বলছিল। আমিও গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম পিছনে। ছবিগুলো কিসের তা মনে নেই—যুদ্ধের চিত্র, বরফের ঝড় এই সব। আমি তন্ময় হয়ে ছবি দেখছি, হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে বইটা বন্ধ করে দিল গোবিন্দগোপাল, বললে—ভাল ছেলে, এখানে কেন?

এই সামান্য কারণে আমার এত রাগ হয়ে গেল যে গোবিন্দর সঙ্গে আর জীবনে আমি কথা বলিনি। গোবিন্দ বারবার এসে সেধেছিল, দেখাতে চেয়েছিল ছবিগুলো—কিন্তু দুরন্ত অভিমানে আমি ওব সঙ্গে ভাব করিনি। এখনও ভেবে পাই না, এত সামান্য কারণে কেন এতটা বিচলিত হলাম। গোবিন্দগোপালের সঙ্গে স্কুল-জীবনে আর কথা বলিনি আমি।

বিস্তারিত ঘটনা দুটো লিখলাম, কাবণ আমি এখনও ভেবে পাই না কেন এমন অদ্ভুত আচরণ করি আমি। তুমি বলতে পার? কেনই বা দাদার অত বড অন্যায়টা অত সহজে ক্ষমা করলাম, আর কেনই বা গোবিন্দ-গোপালের ঐ সামান্য ঠাট্টা সহ্য করতে পারলাম না আমি?

আমি জানি। তার কারণ আমি স্বাভাবিক মানুষ নই। আমার মন আমার নিজের নয়। তার লাগাম হারিয়ে গেছে।

এত কথা তোমাকে লিখলাম যাতে তুমি বুঝতে পার, কেন তোমার বোনের সঙ্গে আলাপ করতে যাবার সাহস নেই আমার। যাতে ক্ষমা করতে পার আমার এ অপরাধ।"

ঠিকানা মিলিয়ে যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল কৃশানু পরদিন সকালে তাকে প্রাসাদই বলা উচিত। সামনে লোহার বড় গেট। একটা পাল্লা মরচে ধরে অনড়, অপর পাল্লাটা কাত হয়ে পড়ে থাকায় গরু-বাছুর অনায়াসে ঢুকে পড়ছে বাগানে। বাগান অবশ্য এখন নেই—আগাছায় ভর্তি চত্বরটা, মাঝে মাঝে কামিনী, বকুল, করবী প্রভৃতি জোরাল গাছগুলো টিকে আছে। বাড়িটা চারমহলা। মাঝখানে তৃণ-আচ্ছাদিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। দেওয়ালের বাইরের দিকে অসংখ্য ছোট ছোট ঘুলঘুলি—পায়রার খোপ। চওড়া বারান্দাটা অত্যন্ত নোংরা করে রেখেছে তারা। বারান্দার উপরেই বিরাট একজোড়া মোষের শিং—সম্ভবত এই ভগ্নপ্রায় প্রাসাদের কোন পূর্বতন মালিক সেটিকে রাইফেলবিদ্ধ করেছিলেন আসাম অথবা সুন্দরবনের জঙ্গলে।

প্রবেশপথে দারোয়ানের ঘর থেকে আটামাখা হাতেই উঠে আসে কৌতূহলী দারোয়ান। কৃশানুর পরিচয় শুনে সে খবর পাঠাল ভিতরে। একটি অবগুণ্ঠনবতী দাসী ওকে নিয়ে গেল ভিতরে।

চওড়া বারান্দাটা পার হয়ে দ্বিতলে যাবার সিঁড়ি। দ্বিতলের প্রথমেই চতুষ্কোণ গাড়িবারান্দার মত একটা অংশ। একসার টব আছে রেলিং ঘেঁষে। শ্যাওলা আর দুর্বা যদি টবের গাছ না হয়—তবে কোন টবেই গাছ নেই। দ্বিতলের চওড়া বারান্দায় একটা শ্বেতপাথরের বিরাট টেবিল; বৃত্তাভাসের পরিবর্তে চতুষ্কোণ হলে হয়তো পিংপং খেলা চলত। সেটাকে পার হয়ে একসার তালাবন্ধ খড়খড়ি-পাল্লাওয়ালা বিরাট দরজাকে বাঁয়ে রেখে ও এসে পৌঁছলো একটি ঘরে। ওকে বসিয়ে ফ্যানটা খুলে দিয়ে ঝি-টি চলে যায়। বিজলীপাখা দেখে একটু অবাক হয় কৃশানু। এ সাবেক জমিদার বাড়িতে এটা সে যেন আশা করেনি। ঘরটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে অনেক কিছু বৈপরীত্যই ওর নজরে পড়ে। সিলিং থেকে ঝুলছে একটি ঝাড়, ঘরের মাঝখানে আবলুশকাঠের একটা পালিশ-চটা টেবিল। খানচারেক

ছোবড়া বের হওয়া সোফা-সেটি। দেওয়ালে দুখানা প্রকাণ্ড অয়েলপেন্টিং। বুককেসে সারসার বাঁধানো বই। তালাটা মরচে ধরে রক্তবর্ণের। পেরেক থেকে ঝুলছে ফ্রেমে-আঁটা একটা গাট-কাটা টেনিস-র‍্যাকেট। এ পাশে একটা ড্রেসিং টেবিলের উপর কিছু প্রসাধন সামগ্রী আর একগাদা ছোট-বড় রূপোর কাপ স্তূপাকার করা। আবলুশকাঠের টেবিলের নিচে একটা ভাঙা হকি স্টিক আর একপাটি বক্সিং গ্লাভস্। অয়েলপেন্টিং দুটোর মাঝখানে আর একটা দরজা, খড়খড়ি পাল্লার নয়। এ বাড়ির স্থপতি-পর্যায়ের সঙ্গে একেবারে গোত্রহীন গ্লাস পাল্লা একটা, গায়ে তার গা-তালা।

হঠাৎ সেই দরজাটা খুলে গেল। ঘরে এল ইভা। কদিনেই চোখমুখ একটু বসে গেছে। অত্যধিক পরিশ্রমে অথবা রাত্রি জাগরণে, কিন্তু এই ম্লানিমার উপর লেগেছে হঠাৎ খুশীর একটা দম্‌কা হাওয়া।

হাত দুটি বুকের কাছে এনে নমস্কার করে ইভা বলে, স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম—নাকি আমার পূর্বজন্মের পুণ্যফল।

কৃশানু চোখ তুলে ওর দিকে তাকায়নি একবারও। তবু অভ্যাসবশে প্রতিনমস্কার করে বলে, জানি, সংস্কৃত নিয়ে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করেছিলেন আপনি, আমার মত নাইন্থ হননি। বিদ্যে জাহির না করলেও হবে—

ইভা ঠোঁট উল্‌টে বলে, বারে! বিদ্যে জাহির করলাম কোথায়? হঠাৎ কি মনে করে এসেছেন তাই তো জানতে চাইছি।

কৃশানুও উত্তরে বলে, বারে! আপনজন হঠাৎ হারিয়ে গেলে মানুষে খোঁজ করে না বুঝি?

বলেই লজ্জা পায়, খুশীও হয়। এমনভাবে সহজ সুরে ও যে কথা বলতে পারে কোন এক অনাত্মীয়া মহিলার সঙ্গে, তা যেন নিজেরই বিশ্বাস ছিল না। হঠাৎ মুখ-ফসকে-বলা কথাটাতে ইভার মুখে কি প্রতিক্রিয়া হল তা দেখবার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল—কিন্তু সে কৌতূহল দমন করল কৃশানু। এ নির্জন ঘরে ও পূর্ণ দৃষ্টিতে ইভার দিকে তাকাতে সাহস পায় না।

একটু নীরবতা।

ইভাই ফের বলে, বাবা নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

নতনেত্রে কৃশানু গম্ভীর হয়ে বলে, পড়াই স্বাভাবিক; আপনি তো এসে পর্যন্ত কোন চিঠি দেননি।

কি করে দেব বলুন? এসে পর্যন্ত যমে-মানুষে যে টানাটানি চলছিল। একেবারে সময় পাইনি। আজকেই শুধু হাতে এসেছে অখণ্ড অবসর। আজই খবর দিতাম; কিন্তু আপনিই এসে পড়লেন।

আপনার শ্বশুর—

তাঁকে আজ কলকাতায় রিমুভ করা হল।

ক্রমে ক্রমে ইভার কাছ থেকে সব খবর পাওয়া গেল। হঠাৎ সিঁড়ি থেকে পড়ে যান জীবনানন্দবাবু। ব্লাড-প্রেসার ছিলই। এই বিশাল প্রাসাদের একান্তে তিনি থাকতেন কিছু বেতনভুক ঝি-চাকর আর কর্মচারীর বেষ্টনীতে। একটিই সন্তান জীবনানন্দবাবুর। তাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল তাঁর আসানসোলের ঠিকানায়। আসানসোলের কাছে একটা স্কুলের তিনি গেমস্ টীচার। তিনি আসেননি, চিঠি-পত্রও আসেনি কোন তাঁর। এদিকে ইভাকে আনতে লোক যায় কলকাতায়। সে এসে পড়ায় অনেকটা সুবিধা হয়েছিল অবশ্য। ইভার খুড়শ্বশুরের একটি ছেলেও এসে পড়েছিল টেলিগ্রাম পেয়ে। ওরা দুজনে মিলে যা পেরেছে করেছে। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী আজ তাকে কলকাতায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাড়ির গাড়িতে করেই গেছেন তিনি, সঙ্গে মৃন্ময়, অর্থাৎ ইভার দেওর আছে।

আপনিও তার সঙ্গে কলকাতা গেলেন না কেন?

না, বিশেষ একটা কাজে আটকে গেলাম আমি। আজই বিকেলে যাব।

একাই?

না, একজনের সঙ্গে!

চোখে না দেখেও কানে শুনেই বুঝতে পারে কৃশানু এ কথাটায় কেমন যেন রাঙিয়ে উঠেছে ইভা। বাক্যের তিনটি শব্দই যেন বার হয়ে এল লজ্জারুণ একটি কণ্ঠ থেকে। ইভা কি তবে কৃশানুর সঙ্গেই ফিরে যাবার কথা ভাবছে? তাই কি নত হয়ে পড়ল ওর দৃষ্টি? নত হয়েছে কি? অদম্য কৌতূহলে এতক্ষণে প্রথম চোখ তুলে তাকায় কৃশানু। আর তাকিয়েই চমকে ওঠে।

জোড়া ভ্রূর মাঝখানে একটি কুমকুমের টিপ। হাল্কা চাঁপা রঙের সেই সিল্কের শাড়িখানাই পরেছে ইভা, গায়ে আগুন রঙের আঁটো জ্যাকেট, দার্জিলিঙ পাথরের সেই ধুক্‌ধুকি দুলছে বুকের উপত্যকায়! না, শাড়ি-ব্লাউস পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কৃশানু; তবু ভয়ে কণ্ঠনালী শুকিয়ে ওঠে।

ইভা চোখ তুলে তাকায়নি! নতনেত্রে একটু সামলে নিয়ে বলে, না, একা নয়, আশা করছি উনি এসে পড়বেন বিকেলের ট্রেনে। টেলিগ্রাম করেও জবাব না আসাতে একজন কর্মচারীকে পাঠিয়েছি আসানসোলে। তিনি পৌঁছে টেলিগ্রাম করেছেন আজ বিকেলের গাড়িতেই ফিরে আসছেন বলে। তাই আমি বাবার সঙ্গে কলকাতা যাইনি। উনি এলে আমরা দুজনে একসঙ্গেই কলকাতা যাব। ওকি, আপনি উঠছেন কেন?

কৃশানু অতর্কিতে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, বলে, আমি তবে চলি।

ইভা বাধা দিয়ে বলে, সে কি! না না, তা হয় না! সারাটা দিন একা একা কাটবে কি করে আমার! বসুন, মেসে কেউ আপনার জন্যে শবরীর প্রতীক্ষায় বসে নেই।

মরিয়া হয়ে কৃশানু বলে, তা হলে, আপনার ঝিকে একটু ডাকুন এখানে।

কেন?

একটু জল খাব।

এনে দিচ্ছি, ঝি নিচে গেছে।

ইভা উঠে যায় পাশের ঘরে। কৃশানু প্রাণপণে মনকে সংযত করে। কোনমতেই মনের উপর নিয়ন্ত্রণ শ্লথ হতে দেবে না। চিন্তাধারাকে সে অন্য পথে চালিত করতে চায়। বেশী ফল্‌স্‌-ওলা আলগা স্টিয়ারিঙে পাঁচসাত পাক না মারলে যেমন গাড়ির মুখ ঘুরতে চায়না তেমনি ওর আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আতঙ্কের বাঁকমুখ থেকে মনটা কিছুতেই মোড় ঘুরল না। ইভা অল্প পরেই ফিরে আসে। একটা ডিসে কিছু পুডিং আর কাচের গ্লাসে জল নিয়ে। সেই সাবেকী জমিদার বাড়িতে এমন তৈরী কাস্টার্ড-পুডিং একেবারেই অভাবিত। কৃশানুর বিস্ময় লক্ষ্য করেই ইভা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলে, উনি পুডিং খুব ভালবাসতেন।

খেয়ে নিয়ে কৃশানু প্রশ্ন করে, এখানে এসে তা হলে সুকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি আপনার?

ইভা হেসে বলে, পুডিংটা খেয়ে আপনার বুদ্ধি খুলছে দেখছি!

কৃশানু বলে, ব্রাহ্মণভোজনের ফল হাতে হাতে পাবেন, আজ রাত্রেই দেখা হবে।

ইভা মুখ টিপে হেসে বলে, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

এইসব চটুল রসিকতা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে কৃশানু।

অনাত্মীয়া একটি মহিলার সঙ্গে এ ভাষায় এ ভাবে সে যে কথা বলতে পারে তা তার নিজেরই ধারণা ছিল না। নিজের কৃতিত্বে সে আত্মহারা হয়ে উঠছে, কিন্তু ভয়ও হচ্ছে প্রচণ্ড। ওর বুকেব মধ্যে যে গুরগুর করে উঠছে, হাড়ের মধ্যে যে সিরসিরানির ছোঁয়া পাচ্ছে সে কি আনন্দে, না আতঙ্কে? না কি এগুলো তার রোগের আক্রমণের পূর্বাভাস?

হঠাৎ বলে ফেলে বেচারি, আপনি বরং আপনার ঝিকে ডেকে পাঠান এখানে।

রীতিমত অবাক হয়ে ইভা বলে, কেন বলুন তো?

উত্তর দিতে দেরি হয় কৃশানুর, তবু উত্তব তাকে দিতে হয় একটা শেষ পযন্ত, বলে, একটি বিশেষ সন্ধ্যার কথা আপনি আমাকে ভুলে যেতে বলেছিলেন, আজকের এই সকালেব স্মৃতিটাও আমি ভুলে যেতে রাজি নই।

এবার ইভার পক্ষেই জবাব দিতে বিলম্ব হয। জোড়া ভ্রূব মাঝখানের কমকুমের টিপটা লম্বাটে দেখাচ্ছে চামড়ার কুঞ্চনে। নখটা খোঁটে দাঁতে, অবশেষে মনস্থির করে বলে, আপনি কি এঘবে অস্বোয়াস্তি বোধ কবছেন কৃশানুবাবু?

মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি কৃশানু বলে, বলা অশোভন, তবু বলছি, করছি।

ইভা এ কথায আঘাত পেল কিনা বোঝা গেল না, আবাব প্রশ্ন করে, কিন্তু কেন বলুন তো?

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বেচারি জবাব দেয়, সে কথা আমি আপনাকে বোঝাতে পাবব না, আমাকে মাফ কববেন।

নাইবা বোঝালেন সব কথা, কিসে অস্বোয়াস্তি বোধ করছেন তা তো বলতে পারেন?

চোখ ফেটে জল আসে। ছুটে পালাতে পারলেই যেন নিস্তার পাওয়া যায়। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। তেমনি অসম্ভব মনে হচ্ছে এই নির্জন ঘরে ঐ মেয়েটির সঙ্গে এমন বিশ্রম্ভালাপ। তাই বলে কিসে অস্বোয়াস্তি হচ্ছে তা কেমন করে বোঝাই? বললে শুধু অসৌজন্য নয, অভদ্রতাও হবে হয়তো।

ইভা কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলে, হোক, তবু আপনি বলুন। আজ আপনি আমার অতিথি। এ বাড়ির অতিথি। আপনার অসাচ্ছন্দ্য যদি কোনকিছুতে হয় তা আমাকে দূর কবতেই হবে। বলুন আপনি, লক্ষ্মীটি—

শেষ সম্বোধনটার আন্তরিকতায় একটু বুঝি বিচলিত হয়ে পড়ে কৃশানু। বুঝতে পারে চার-পাঁচদিন অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষার পর আজ একটু আলাপ করার সময়, সুযোগ আর মানুষ পেয়েছে ইভা। আর এ মানুষও সেই মানুষ যার জন্যে প্রতিদিন সকালে-শেষ বই সে সারাদিন আগলে রাখত সন্ধ্যা ছটা থেকে সাতটার মধ্যে লাইব্রেরী ঘরে বদলে নেবে বলে। হোক অসৌজন্য, তবু এই মিষ্টি লক্ষ্মীটি ডাকের মর্যাদা রাখতেই হবে তাকে। উঠে চলে যেতে পারবে না এখনই। তাই মরিয়া হয়ে বলে ফেলে, অস্বোয়াস্তি এ ঘরের নির্জনতায়, আপনার ওই চাঁপা রঙের সাড়িতে, ওই লকেট হারে।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় ইভা।

কৃশানুর মাথাটাও একেবারে ঝুঁকে পড়ে বুকের উপর।

অনেকক্ষণ ইভার দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ধীরে ধীরে মুখ তোলে কৃশানু। দেখে, নির্জন ঘরে ও একা বসে আছে। কি করবে এবার বুঝে উঠতে পারে না।

প্রায় মিনিট দশেক পরে ইভা ফিরে আসে। তার কোলে একটি বছর তিনেকের ছেলে। তাকে একমুঠো খেলনা দিয়ে সে নামিয়ে দেয় মেঝেতে। কৃশানু লক্ষ্য করে দেখে ইতিমধ্যে ইভা সাজটা পালটে এসেছে। লাল ভেলভেট পাড়ের পাটভাঙা মিলের একখানা সাধারণ শাড়ি পরেছে। গলার মালাটা খুলে রেখে এসেছে। যেন কিছুই হয়নি তেমনি ভাবে বলে, এটি হচ্ছে আমাদের বামুনদির ছেলে। কদিনেই বেশ ভাব হয়ে গেছে আমার সঙ্গে। না রে টুলটুল? টুলটুলের গালটা ও টিপে দেয়।

কৃশানু কিন্তু অত শীঘ্র সহজ হতে পারে না। গাঢ়স্বরে বলে, আমার এ অদ্ভুত আচরণে আপনি নিশ্চয়ই—

বাধা দিয়ে ইভা বলে, মাস্টারমশাই, আজকের সকালবেলার সব কথা আপনাকে ভুলে যেতে বলি না—কিন্তু এইমাত্র আপনার সঙ্গে আমার যে কথোপকথন হল সেটুকু আমরা দুজনেই ভুলে যাব। মনে করবেন, আজকের এই সুন্দর সকালবেলাটায় ওটুকু ঘটনা ঘটেনি।

এবারও 'ধরে নিলাম' কথাটা বলতে বাধল কৃশানুর।

আবার কিছুটা চুপচাপ।

হেসে ইভা বলে, কি হল, অমন মুখগোমড়া করে থাকলে বুঝি গল্প করা যায়? ইলু কেমন আছে বলুন।

কৃশানু সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? কিছু মনে করবেন না তো?

না, করব না, জিজ্ঞাসা করুন। তবে বিনিময়ে আমাকেও কয়েকটি প্রশ্ন করার অধিকার দিতে হবে কিন্তু।

কৃশানু ঘাবড়ে গিয়ে বলে, আচ্ছা, তবে না হয় থাক।

খিলখিল করে হেসে ওঠে ইভা। বলে, আচ্ছা বাপু হল, আমি না হয় কোন প্রশ্ন করব না। কাঠ-গড়ায়-ওঠা সাক্ষীর মত শুধু জবাবই দিয়ে যাব। কি বলছিলেন বলুন।

কৃশানু বলে, আপনার শ্বশুরের অবস্থা তো ভালই, তাহলে সুকান্তবাবু চাকরি করেন কেন?

ইভা সহজভাবেই সমস্যাটা পরিষ্কার করে দেয়। ওদের ঘরোয়া কথা বলতে কোন সঙ্কোচ বোধ করে না। জীবনানন্দবাবুর সঙ্গে কোন একটি বিষয় নিয়ে তাঁর একমাত্র পুত্রের মতবিরোধ হয়। বিষয়টা কি স্পষ্ট করে না বললেও সেটা আন্দাজ করতে পারে কৃশানু। তা সে যাই হোক, এই মতান্তর ক্রমে মনান্তরে পরিণত হয়। একদিন শেষ পর্যন্ত সুকান্তবাবু রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলেও যান। আগে নাকি ওদের অবস্থা আরও ভাল ছিল—জমিদারী-প্রথা রদ হওয়ার পর ওদের সে ধবববা আর নেই। তাছাড়া ছেলে চলে যাওয়ার পর থেকে জীবনানন্দবাবুরও কেমন একটা বীতরাগ এসেছে সংসারের উপর। বাড়িঘর মেরামত করানো, সম্পত্তি দেখাশোনা করা—কিছুই আর মন দিয়ে করেন না তিনি—কার জন্যে করবেন?

সব শুনে কৃশানু বলে, আপনাকে আরও একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু সেটা বোধহয়—

ইভা বাধা দিয়ে বলে, এইসব ফর্মালিটির হাত এড়াবার জন্যেই একদিন আপনাকে বলেছিলাম আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে, কিন্তু তাতে তো আপনি রাজি নন—

কৃশানু হঠাৎ বলে বসে, সেদিন রাজি ছিলাম না, আজ রাজি।

ইভা একগাল হেসে বলে, তাহলে এবার অকপটে আপনার প্রশ্নটা পেশ করুন, তবে অমন মুখ নীচু করে নয়, বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে—

কৃশানুও হেসে ওর দিকে তাকায়, নিঃসঙ্কোচে বলে, সুকান্তবাবুর শুনেছিলাম পান-দোষ আছে, তাহলে স্কুলে চাকরি পেলেন কি করে উনি?

ইভা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, সে কথা আমিও ভেবেছি, ভেবে উত্তর পাইনি। শুধু ড্রিঙ্ক করা নয়, নিয়মশৃঙ্খলা ও মেনে চলতে পারে না। থিয়েটার, খেলাধূলা, শিকার—এই নিয়েই ওর দিন কাটে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কেমন করে নিয়মমাফিক ক্লাস নেয় ও? জানি না। হয়তো বাবার সঙ্গে মনোমালিন্যে সে নিজেকে খানিকটা শুধরে নিয়েছে, তা নিয়ে থাকলে বলব এ বিরোধ ওর পক্ষে অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ। আজ বিকেলে কিশোরীবাবুর সঙ্গে ও ফিরে এলেই জানতে পারব।

বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে। গ্রীষ্মকাল। বেশী বেলা হলে রোদে কষ্ট হবে। কৃশানুর হাতে ঘড়ি নেই, ঘরেও নেই কোন ঘড়ি। বলে, কটা বাজে?

সাড়ে দশটা।

আমি তা হলে উঠি এবার।

তাই কি হয়! আজ আপনি আমার অতিথি। এত বেলায় না খাইয়ে কি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি?

বারে, খেলাম তো আমি পুডিং।

ইভা মুখ টিপে হেসে বলে, সে তো আর পেট ভরাবার জন্যে খাননি, যেই শুনলেন অন্য একজন পুড়িং খেতে ভালবাসেন, অমনি হিংসে করে তাতে ভাগ বসালেন—

কৃশানুর ইচ্ছে করছিল এখানে একটা রসিকতা করার। বেশ জুতসই একটা ঠাট্টা মনেও এসেছিল ওর। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও বাংলা কথাসাহিত্যের কল্যাণে ও জানে এ জাতীয় রসিকতা বান্ধবীর সঙ্গে করলে সেটাতে অসৌজন্য প্রকাশ পায় না। বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না।

ইভা বলে, এখানে স্নানাহার করবেন, দুপুরে একটু গড়িয়েও নেবেন। বিকেলে আপনার সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দেব। তারপর আমরা তিনজনে একসঙ্গে কলকাতা যাব।

দু' একবার মৃদু আপত্তি জানিয়ে কৃশানু বুঝতে পারে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে খোশগল্পের দ্বিতীয় খণ্ড খুলে বসে।

ইভা দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথমেই সরাসরি বলে বসে, এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?

বাধা দিয়ে কৃশানু বলে, কিন্তু শর্ত ছিল আমিই শুধু প্রশ্ন করব আর আপনি শুধু উত্তর দিয়ে যাবেন।

সে মামলা তো ডিসমিস হয়ে গেল। আপোস হয়ে গেল।

কৃশানু অবাক হওয়ার ভান করে বলে, কই আমি তো করিনি আপোস।

গালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে ইভা চোখ বড বড় করে বলে ওমা, কী মিথ্যুক আপনি। আপনি বললেন না—সেদিন মামলা তুলে নিতে রাজি ছিলাম না, আজ রাজি ?

কৃশানু হেসে বলে, হ্যাঁ, ঠিক কথা। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন কি বলছিলেন

আমার প্রশ্নটা স্বাভাবিক এবং প্রাঞ্জল। আপনি বিয়ে করছেন না কেন ?

কৃশানু লজ্জা পায় না, আব পায় না বলে খুশী হয়ে ওঠে। হেসে বলে, প্রশ্নটা স্বাভাবিক তো বটেই, নির্লাঙ্গুলীনীর পক্ষে লাঙ্গুলযুক্ত শৃগালের দিকে এ প্রশ্নবান ছোঁড়া একটুও অস্বাভাবিক নয়। আর প্রাঞ্জল ? হ্যাঁ, প্রাণ তো জলই হয়ে গেল আমাব।

রসিকতা বন্ধ কবে জবাবটা দেবেন ? কাঠগডায দাঁড়িয়ে প্রশ্নেব স্পেসিফিক জবাব দিতে হয়।

কৃশানু বলে, মনোমত পাত্রী পাইনি বলে।

আমি যদি আপনার মনোমত একটি পাত্রীর সন্ধান দিই ?

আমি তৎক্ষণাৎ টোপব কিনতে ছুটি।

আমি কিন্তু সিরিয়াস!

বিয়ের ব্যাপারে আমিও অসিরিয়াস নই নিশ্চয়।

ইভা ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

কৃশানু একটু ইতস্তত করে বলে, এখানে সিগারেট খাওয়া কি আশোভন হবে ?

সিগাবেট। আপনি সিগারেট খান নাকি ? কখনও তো খেতে দেখিনি।

কৃশানু আতঙ্কিত হবাব অভিনয় করে বলে, এইরে! ভারি ভুল করে বসেছি তো। আমি যে ভাল ছেলে নই এটা আপনি জেনে ফেললেন—এখন বোধ হয় সেই মহিলাটির সঙ্গে আমার বিবাহ প্রস্তাব উইথড্র করবেন আপনি।—সিগারেট ধরাতে ধরাতে কৃশানু ছাই ফেলার জন্যে ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে ছোট একটা রুপার কাপ টেনে নেয়।

ইভা বলে, বসুন, অ্যাসট্রে নিয়ে আসছি আমি।

হঠাৎ খেয়াল হয় কৃশানুর! কাপটা পরীক্ষা করে দেখে, তার গায়ে লেখা আছে টু এম চৌধুরী অ্যান্ড ডঃ ভোস ইন তটিনীর বিচার।

অ্যাসট্রেটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে ইভা বলে, যাক, নিশ্চিন্ত করলেন আপনি। বিয়ে করবার নামে আপনি যে মৌজ করে সিগারেট ধরান এ খবরটা বাবাকে বলব 'অখন।

একটু চককে উঠে কৃশানু বলে, বাবাকে! বাবাকে কেন?

তিনি তো জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন।

রসিকতার বাষ্পটুকু পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়ে যায়। বলে, ব্যাপারটা কি বলুন তো? আপনার বাবাও কাল এই রকম একটা প্রশ্ন করেছিলেন। পাত্রীটি কে? আপনি চেনেন?

নিশ্চয়ই।

কে?

ধরুন, যদি বলি আমার ছোট বোন, আইভি?

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কৃশানু।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে কৃশানু ধীরে ধীরে বলে, আমাকে মাফ করবেন ইভা দেবী, আমি রাজি নই।

কেন বলুন তো?

কারণটা আমি জানাতে পারব না।

আপনি তো আইভিকে দেখেননি। সে আমার মত কালো নয়—

কালো আপনিও নন, সে জন্য নয়।

কারণটা কি অর্থনৈতিক?

না। আপনার বাবা বলেছিলেন অর্থনৈতিক অসুবিধাটা থাকবে না।

একবার একটু যেন বেধে যায়, তবু সব সঙ্কোচ ত্যাগ করে ইভা নিক্ষেপ করে তার পরবর্তী প্রশ্নটি, আপনি কি কাউকে ভালবাসেন?

লাজুক কৃশানুর পক্ষে জবাব দেওয়া শক্ত। সে কি মনে মনে কোন মেয়েকে ভালোবাসে? হ্যাঁ, বাসে। ধূপছায়া রঙের ঢাকাই শাড়ি-পরা একটি অপার্থিব মেয়ে ওর মনের এক কোণায় নিত্য এসে দাঁড়ায় লাজনম্রচরণে, পায়ে তার আলতার রাঙা-রেখা, কপালে সিঁদুরের ছোট্ট টিপ। সে মেয়েটি, কৃশানু জানে, দুনিয়ার কোথাও নেই, সে ওর মানসী।

ইভা ওর লজ্জাজড়িত নীরবতাকে উপভোগ করে, কেমন যেন বেদনার্ত

হয়ে ওঠে। সহানুভূতিতে স্নেহে ওর চোখ দুটি আর্দ্র হয়ে ওঠে। চাপা গলায় ও আস্তে আস্তে বলে, আমি জানি আপনার মনের কথা।

চমকে ওঠে কৃশানু। ইভা বলেই চলে, আপনি একটি মেয়েকে মনে মনে ভালবাসেন, কিন্তু এও আপনি জানেন তাকে দূর থেকেই শুধু ভালবাসা যায়—তাকে ঘরে আনা যায় না, তাই নয়?

অবাক হয়ে যায় কৃশানু, বলে, আপনি কি করে জানলেন?

অদ্ভুত হাসল ইভা। এর জবাব অতি সহজ, কিন্তু ইভা জানে সে-কথা বলা যায় না। যতটা বলেছে, হয়তো এতটা খোলাখুলি বলাও উচিত হয় নি ওর। হাজার হোক সে এ বাড়ির বউ। লাজুক কৃশানুকে ভাল করে চেনে বলেই এতটা মন খুলে কথা বলতে পেরেছে ইভা। সে নিশ্চিত জানে যে, তার এ কথার জবাবে কৃশানু কখনই ভেঙে পড়ে বলবে না—একবার বল ইভা, ঘরে না এলেও সে মেয়েটিও আমাকে তেমনি করে ভালবাসে!···সেটুকু সাহস ছিল বলেই এতখানি খুলতে পেরেছে মনের কপাট। অদ্ভুতভাবে হেসে তাই বলে, আপনি তো জানেন সে আপনার ঘর করতে আসতে পারবে না কোনদিন। তাই বলে কি বিয়েই করবেন না আপনি জীবনে?

কৃশানু জবাবে বলে, জানি না এতকথা, কি করে আন্দাজ করেছেন আপনি, কিন্তু বাধা শুধু সেটাই নয়। আরও বাধা আছে, সে বাধা দুরতিক্রম্য। তাই হয়তো বিবাহিত-জীবন আমার হবার নয়।

অবাক গলায় ইভা বলে, দুরতিক্রম্য বাধা! কিসের?

কৃশানু মাথা নীচু করে বলে, এ আলোচনা আমার পক্ষে ক্লেশকর। ঠিক যে কারণে আপনি গলার লকেটটা খুলে রেখে এলেন, শাড়িটা পালটে এলেন—যে কারণে একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল আপনাকে—সেই কারণেই। আমাকে মাপ করবেন ইভা দেবী, আমি ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ নই। সব কথা আপনাকে বলা যায় না—কাউকেই বলা যায় না। আপনি দয়া করে আপনার বাবাকে বুঝিয়ে বলবেন।

অনেকক্ষণ ইভা কোন জবাব দেয় না। কুঞ্চিত যুগ্মভ্রূর মাঝখানে দুটি অবাক দৃষ্টি মেলে দেয় জানলা দিয়ে কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য দিগন্তে। বসে থাকে চুপ করে। কৃশানুর গলায় একটা বোবা কান্না যেন আটকে গেছে। কী ভাবল ইভা? সে কি এখন থেকে ঘৃণা করবে কৃশানুকে? সে কি ভাবল কৃশানুর কোন দৈহিক অপূর্ণতা আছে! তাই সে বিবাহিত-জীবনে বীতকাম!

লজ্জায় সঙ্কোচে মর্মান্তিক অপমানের অন্তর্দাহে সে ভিতরে ভিতরে পুড়তে থাকে। হয়তো ইভা এখন ভাবছে—কোন্ লজ্জায় সে এমন একটা নপুংশকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ইভার। অদ্ভুত মিষ্টি গলায় ও শুধু বলে, নিন, উঠুন এবার। স্নান সেরে নিন।

নিন উঠুন, পাঁচটা বেজে গেল যে!

ঘুমটা ভেঙে যায় কৃশানুর। ভারি সুন্দর লাগে পরিবেশটা। পুরু গদিওলা নরম বিছানা। যে ঘরটাতে সকালে ও বসেছিল, এটা ঠিক তার পাশের ঘর। মাঝের সেই গা-তালা লাগানো দরজা দিয়ে আসতে হয় এ ঘরে। ঐ একটিই দরজা। নিঃসন্দেহে এটাই ওদের স্বামী-স্ত্রীর শয়নকক্ষ। মার্বেল পাথরের নক্সাকাটা ঠাণ্ডা মেঝে। হালকা ডিসটেম্পার করা সবুজাভ দেওয়াল। পশ্চিমের জানলাটা বন্ধ। ঘরটা প্রায়ান্ধকার। নিস্তব্ধ। টেবিলফ্যানের একটানা একটা আওয়াজ শুধু শোনা যায়। একটা মিঠে মিঠে গন্ধ উঠছে কিসের। খেয়াল করলে কৃশানু দেখতে পেত মাথার কাছে যে টেবিলে ফ্যানটা রাখা আছে তাতেই আছে ছোট্ট রেকাবিতে রাখা কয়েকটা জুঁই। পরিপূর্ণ আহারাদির পর এমন পরিবেশে এ রকম একটা মৌরসী ঘুমের আমেজ সহজে কাটতে চায় না। তবু উঠতে হল তাকে।

দেখে, ধূমায়িত এক পেয়ালা চা হাতে দাঁড়িয়ে আছে ইভা। বলে, যান, মুখ-হাত ধুয়ে আসুন।

ঘরের লাগাও বাথরুমটা চেনা হয়ে গেছে। মুখ হাত ধুয়ে এসে বসে আবার পালঙ্কে।

চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন নাকি?

চমকে উঠে কৃশানু বলে, আবার।

তবে তাড়াতাড়ি চা-টা খেয়ে নিন। চলুন, এবারে রওনা হওয়া যাক।

কিন্তু সুকান্তবাবু কই?

তিনি আসেননি।

আসেননি? মানে? আসবেন না?

হঠাৎ একটু রুক্ষস্বরেই ইভা বলে, সেসব বৃত্তান্ত পরে হবে, কিন্তু আর দেরি করলে পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনটাও ধরতে পারব না।

কৃশানু একটু আহত হয়। হঠাৎ কেন যে এমন রুক্ষ হয়ে উঠল ইভা বোঝা গেল না।

অল্পক্ষণ পরেই ইভা তৈরি হয়ে এসে বলে, নিন, চলুন এবার।

আপনি জামা-কাপড় পালটাবেন না?

না। আসুন।—এবারও ওর কণ্ঠে অহেতুক উষ্মা।

ওর পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে কৃশানু। সে ভাবছিল, আশ্চর্য মেয়ে এই ইভা। সেদিন বাড়ির বাইরের ঘরে ওকে ময়ূরকণ্ঠি রঙের একটা মাইশোর সিল্ক পরে থাকতে দেখে ওর মনে হয়েছিল বড়লোকের মেয়েরা কি এমন শাড়ি বাড়িতেও পরে নাকি! আজ মনে হল এমন সাধারণ লালপেড়ে শাড়ি পরে কেউ পথে বার হয় নাকি! বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ঘোড়ার গাড়ি। দারোয়ান আর ঝিকে কি সব নির্দেশ দিল ইভা। তারপর উঠে বসল গাড়িতে কৃশানুর মুখোমুখি।

পাথর-বাঁধানো পথে ঘড়ঘড় করে চলল গাড়ি।

হঠাৎ আচমকা একটু হেসে ইভা বলে, আপনি কোন কথা বলছেন না যে?

কি বলব?

দুটো সান্ত্বনার কথাও তো বলতে পারেন। এক প্লেট পুডিং কুকুরের মুখে ধরে দিয়ে এলাম।

আশ্চর্য মেয়ে তো! ভাবে কৃশানু। একটু আগে সে প্রশ্ন করেছিল সুকান্তবাবু কেন আসেননি, তখন রুখে উঠেছিল ইভা, অথচ এখন নিজে থেকেই সে প্রসঙ্গটা তুলছে। বলে, কেন এলেন না তিনি?

জানলা দিয়ে ইভা তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। গঙ্গার ধার দিয়ে পাথর-বাঁধানো পথ। পড়ন্ত রৌদ্র ম্লান হয়ে আসছে। সমস্ত দিনের গুমট গরমের পর আকাশটা থমকে আছে। ক্লান্ত দেহে বিদায় নিচ্ছে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে। সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ইভা বলে, তিনি ওখানে নেই। কিশোরীবাবু একাই ফিরে এসেছেন। এখন আর ও-স্কুলে কাজ করেন না তিনি।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন?

অথবা ছাড়িয়ে দিয়েছে।

কিছুটা দুজনেই চুপচাপ। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়েই ইভা বলে, থাক ও কথা। অন্য কোন গল্প করুন।

কৃশানু বুঝতে পারে সুকান্তবাবুর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চায় ইভা। হয়তো মনে মনে সে তীব্রভাবে প্রত্যাশা করেছিল আজ তাকে। ওদের মনের মিল হয়নি। রাগ করে ওকে একদিন ছেড়ে গিয়েছিল ইভা। ইলা একদিন বলেছিল—দিদিকে ওরা মারে। 'ওরা' নিশ্চয়ই গৌরবে। জীবনানন্দবাবুর সংসারের যেটুকু দেখেছে কৃশানু, তাতে আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না যে সুকান্তবাবু ছাড়া আর কেউ নিশ্চয় ইভার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি। অথচ এই দুশ্চরিত্র মদ্যপ স্বামীর জন্যে আজও তার মনের কোণে সঞ্চিত আছে গোপন দাক্ষিণ্য। সে যেন ক্ষমা করবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। ইভা বুদ্ধিমতী, তাই বলতে পেরেছিল, বাপের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়তো অভিশাপ নয়, আশীর্বাদই হবে তার কাছে। মনে পড়ল কৃশানুর যে কথাটায় আজ সে প্রথম চোখ তুলে তাকায় ইভার দিকে। সে কণ্ঠস্বরে যে লজ্জার আমেজ মিশে ছিল তাতেই বোঝা যায় মনে মনে সে আজও প্রত্যাশা করে আছে পুনর্মিলনের।

এক কাজ করবেন? চলুন, গঙ্গা পার হয়ে ব্যারাকপুর দিয়ে যাই।

কেন? তাতে তো আরও দেরি হবে।

হলই বা। কীই বা এমন রাজকর্ম পড়ে আছে কলকাতায়।

কৃশানু বুঝতে পারে না কি চাইছে ইভা। ইতস্তত: করে। হয়তো মনের মধ্যে যে উত্তাপ জমা হয়ে আছে, গঙ্গার শীতল বাতাসে তা সে জুড়িয়ে নিতে চায়। তাই ইভার ইচ্ছানুযায়ী ঘোড়ার গাড়িটা গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়ায়। নেমে পড়ে ওরা। ভাড়া মিটিয়ে দেয়।

স্যুটকেশটা আমার হাতে দিন—বলে কৃশানু।

না থাক, ভারী নয় এটা মোটেই।

হাল্কা বলেই তো বলছি। ভারী হলে না হয় একটা সান্ত্বনা থাকত। হাল্কা যখন, তখন শিভ্যালরি দেখাবার সুযোগটা ছাড়ি কেন?

বেশ, তবে নিন।—স্যুটকেশটা বাড়িয়ে দেয় ইভা।

কৃশানু একটু ইতস্তত: করে বলে, এখানে রাখুন।

ইভার মুখে ফুটে ওঠে একচিলতে হাসি। হাতে হাতে স্যুটকেশটা হস্তান্তরিত হয় না। মাটিতে নামানো স্যুটকেশটা তুলে নেয় কৃশানু। এক নজর ওর দিকে তাকিয়েই কৃশানু বুঝতে পারে ইভার মনের মেঘ কেটে গেছে। সুকান্তের জন্যে মনে মনে সে আজ সারা সকাল প্রহর গুনেছে,

তাই আশাভঙ্গে রুষ্ট হয়ে উঠেছিল তখন। এতক্ষণে আবার সামনে নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। শুধু স্বাভাবিকই নয়, বুকচাপা ঐ প্রাসাদ থেকে মুক্ত প্রকৃতিতে বেরিয়ে এসে ক্রমে সে খুশীয়াল হয়ে উঠছে। তার অনুমান যে সত্য তা বুঝতে পারে ইভার পরের কথাটায় : একটা জিনিস খাওয়াবেন ?

কি !—অবাক কৃশানু প্রশ্ন করে।

ঐ মোড়ের দোকান থেকে একখিলি মিঠে পান নিয়ে আসুন।

কৃশানুর ভারী মজা লাগে। ইভা একেবারে সহজ হয়ে পড়েছে। পীচ মোড়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ও-পাশে একটা পানের দোকান। একগাদা ডাব জড়ো করা আছে পাশে। পিতলের পাটাতনে একচাঁই বরফের উপর বিছানো আছে একসার খোলা পান—তার উপর নানান মশলা বিছানো। ইভাকে রাস্তার এ পাশে রেখে কৃশানু ওদিকে চলে যায় পান কিনে আনতে। রাস্তার মাঝামাঝি গিয়ে শুনতে পায় ইভার পুনশ্চ : জর্দা আনবে একটু।

সূর্যটা আটকে পড়েছে পশ্চিম দিগ্বলয়ের একখণ্ড কালো মেঘে। প্ল্যাটিনামের মত উজ্জ্বল মেঘের সীমান্তরেখা। গুমট গরমটা এখনও কাটেনি। পান নিয়ে ফিরে এল কৃশানু। দাঁড়াল ইভার অনতিদূরে। বাড়িয়ে ধরল পানটা ওর দিকে। ইভার কৌতুকোজ্জ্বল মুখে ফুটে উঠল হাসির একটা আভাস। সেটা গোপন করে গম্ভীর হয়ে বলে, পানটা তো হাতে হাতে নেওয়া যাবে না, কোথায় নামিয়ে রাখবেন ?

কৃশানু লজ্জা পায়। সেটা গোপন করবার জন্যেই রাগ দেখিয়ে বলে, ছেলেমানুষী করবেন না—ধরুন।

অতি সাবধানে স্পর্শ বাঁচিয়ে পানের দোনাটা গ্রহণ করে ইভা। হাতে হাতে ছোঁয়া লাগলে যতটা লাল হয়ে উঠত তার চেয়ে বেশীই রাঙিয়ে ওঠে বেচারী ইভার অতি সন্তর্পণে সেটা গ্রহণ করার ভঙ্গিতে।

ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দেখে পারানি লঞ্চটা মাঝ গাঙে যাত্রী বোঝাই হয়ে চলেছে ওপারে। আর একটা লঞ্চ এখনও ছাড়েনি ওপার থেকে। গঙ্গায় ভাঁটার এখন শেষ। অনেকটা কাদা বেরিয়ে পড়েছে পাড়ের কাছে। পাষাণ রানার শেষ সোপান থেকে জল এখন অনেকটা দূরে। দুখানা করে কাঠের তক্তা পাতা আছে জল পর্যন্ত। ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলি যাত্রী, একপাল ছাগল নিয়েও একজন।

চারিদিকে একবার দেখে নিয়ে ইভা বলে, একটা নৌকা ভাড়া করুন বরং। এই একপাল পাঁঠার সহযাত্রী হতে পারব না আমি।

অগত্যা কৃশানুকে সেই চেষ্টাই করতে হয়। এমন একটি দুর্লভ সায়াহ্নে যদি গঙ্গাবক্ষে ভেসে পড়তেই হয় তাহলে কলরবমুখরিত পারানি-লঞ্চের তুলনায় ছোট পানসীর পরিবেশ অনেক বেশী কাম্য। ঘাটে কোন নৌকা ছিল না, একটু দূরে বাঁধা আছে একসার নৌকা। কাদা বাঁচিয়ে আলগা ভাবে ওরা সরে এসে মাঝিকে ডাকল। ছৈয়ের থেকে বেরিয়ে এসে মাঝি ওদের দেখে নিয়ে বলে, পারে যাবেন ? একটু সবুর করতে হবে।

কৃশানু বিরক্ত হয়ে বলে, আরে বাপু সবুর করব না বলেই তো ডাকছি তোমায়।

না বাবু, এখনই বান আসবে। আজ পূন্নিমে। বান চলে গেলে নিয়ে যেতে পারি।

ইভা অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কটায় আসবে বান ?

আজ্ঞে সওয়া ছটায়।

তোমার পার হতে কতক্ষণ লাগবে ?

এখন লাগে বিশ মিনিট, জোয়ার এসে গেলে আধ ঘণ্টা।

বাম মনিবন্ধের দিকে তাকিয়ে ইভা বলে, তা হলে আর বাজে কথা না বলে এখনই নৌকা ছাড তুমি। এখন ঠিক পাঁচটা চল্লিশ।

মাঝি একবার গাঙের দিকে চেয়ে নিয়ে বলে, বারো আনা লাগবে বাবু।

ইভা বলে, পুরো টাকাটাই দেব, এখন ছাড দেখি নৌকা।

তবে ঘাটে আসুন মাঠান, এখানে নায়ে চড়তে লারবেন।

আবার কাদা বাঁচিয়ে ঘাটে আসে ওরা। নৌকাও এসে লাগে জোড়া কাঠের পাটাতনের গায়ে। মাঝি নিজেই স্যুটকেশটা তুলে নেয়। সন্তর্পণে পা ফেলে কৃশানু উঠে পড়ে নৌকায়। ইভা ইতস্ততঃ করে মাঝপথে। মাঝি পিছন ফিরে স্যুটকেশটা গুছিয়ে রাখছিল, হঠাৎ দেখতে পেয়ে ধমকে ওঠে, কেমন মানুষ বাপু আপনি ? বউমানুষ উল্টে পড়বে কাদায়, ধর কেন হাতখান্ আগ্ বাড়িয়ে।

কৃশানু বেচারির অবস্থা মর্মান্তিক। হাত বাড়িয়ে ইভার মকরমুখো বালা-পরা হাতখানা ধরতে হবে বলেই নয়, সে লাল হয়ে উঠেছিল এই কথা ভেবে যে মাঝি ওদের একটা মনগড়া নিকটতম সম্পর্কে বেঁধে ফেলেছে ! তবু

নৌকার কিনারায় দাঁড়িয়ে হাতখানা সে বাড়িয়ে দেয়। আর পাঁচজন ছেলের কাছে ব্যাপারটা হয়তো অতি সাধারণ—কিন্তু ওর কাছে তা মনে হল না। একটি নরম মুঠির স্পর্শের প্রত্যাশায় ওর চোখ দুটি আবেশে মুদে আসে। চমকপ্রদ একটা শিহরণের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। সম্বিৎ ফিরে আসে নৌকাটা দুলে ওঠায়। চোখ মেলে দেখে—নৌকায় উঠে এসেছে ইভা, ওর প্রসারিত করের সাহায্য না নিয়েই। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে কৃশানুর। পাটাতনের একটি প্রান্তে বসে নীরবে একটা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

একটু ফাঁক রেখে ইভাও এসে বসল পাশে।

নৌকা ছাড়ল।

খুব বেঁচে গেছেন যা হোক।—মুখ টিপে হাসে ইভা।

কেন ?

আর একটু হলেই ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেত।

আমাকে ছুঁয়ে ফেললে কি আপনার জাত যেত ? তাই বুঝি গঙ্গাজল দিচ্ছেন মাথায় ?

জাত আমার যেত না, যেত আপনার। বাব্বা, কী মানুষ সঙ্গে করেই বেরিয়েছি পথে। পদে পদে ভোগান্তি !

কৃশানু বলে, বেশ যা হোক, ভোগান্তি আপনার, না আমার ! আপনার হুকুমে ট্রেন ছেড়ে নৌকায় চড়লাম, স্যুটকেশ বইলাম, পান এনে দিলাম, জর্দার যোগান দিলাম—

আর আপনার জন্যে তাসের খেলা দেখাতে দেখাতে আমি নৌকায় উঠলাম, এই সাদা শাড়ি পরে পথে বের হলাম—

কেন আমি কি বলেছি ?

বলেন নি ! মাত্র চারখানা শাড়ি নিয়ে চলে আসি। তখন কি জানি এতদিন থাকতে হবে। দুখানা তো একেবারে ময়লা হয়ে গেছে। বাকি আছে এখানা, আর সেই চাঁপা-রঙের সিল্কের খানা। তা আপনি— কথার মাঝপথেই থেমে গেল ইভা। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখে কৃশানুর মুখটা বেদনায় ম্লান হয়ে গেছে। কেন যে এ ভাবান্তর হল কৃশানুর তা বুঝতে পারে না ; বুঝতে অনেক কিছুই সে পারে না। তবে এটুকু বুঝেছে কোথায় একটা ব্যথার কাঁটা বিঁধে আছে ওই ছেলেটির অন্তরের গহনে। ক্ষতটা দেখা

যায় না, কিসের আঘাতে ওটা হয়েছে বোঝা যায় না তা-ও ; কিন্তু বেদনশীল যন্ত্রণার অভিব্যক্তি মাঝে মাঝে অনুভব করা যায়— যখন নিভৃত ঘরে ও ঝিকে ডেকে দিতে বলে, অনুরোধ করে শাড়িটা পাল্টে আসতে, খুলে রেখে আসতে বলে দার্জিলিঙ পাথরের মালাছড়া। প্রেম তোমার অনেক কিছু কেড়ে নেয়, বঞ্চিত করে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা থেকে, রাত্রের সুনিদ্রা থেকে। তেমনি দৃষ্টিহীনের স্পর্শানুভূতির তীক্ষ্নতার মত পুষিয়েও দেয় ক্ষতি, এনে দেয় মর্মভেদী দৃষ্টি। ইভা তাই বুঝতে পারে ওর সামনে এসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কৃশাণুর মুখ, যে সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনী পর্দাব ওপার থেকেই ইতস্তত: করে ফিরে গেছে সে, সেদিন লক্ষ্য করেছে ইভা, মন দিয়ে পড়াতে পারে নি মাস্টার মশাই—বারেবারে আনমনা হয়ে পড়েছে। ইভার সঙ্গে একটা প্রীতির একটা বন্ধুত্বেব সম্পর্ক স্বীকার করবার জন্য বেতসপত্রের মত কাঁপত কৃশাণুর আনত দৃষ্টি—এটা নজর এড়ায়নি তার, কিন্তু মুখে সে স্বীকার করতে চাইত না। ইভাকে পড়াবার দায়িত্বের কথায় সে শিউরে ওঠে, ওর হাত থেকে স্যুটকেশটা নিতেও অসূর্যম্পশ্যা গাঁয়ের ষোড়শীর মত মরমে মরে যায়। ইভা জানে, ওর মনের নিভৃত কন্দরে আছে আত্মগোপনের এক শম্বুকবৃত্তি, তারই আকর্ষণে মনকে গুটিয়ে নেয় সে, কিন্তু এ জানা তো সবটা জানা নয়। কেন ওর মন কদমফুলের মত ফুটে ওঠবার জন্য ব্যাকুল নয়, কেন তা সর্বদাই শামুকের মত আড়াল খোঁজে? মাধ্যাকর্ষণের জন্যই যাবতীয় উৎক্ষিপ্ত বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রেব দিকে ধাবিত হয় এ জানাই কি সব? কেন পৃথিবীর বুকে প্রতিনিয়ত এই আত্মকেন্দ্রিক লাজনম্রতা?

এ সব কেনর জবাব ইভা পায়নি, কিন্তু এটুকু সে বুঝেছে যে ওদের পরিচয় এখন যে পর্যায়ে আছে, তাতে এসব কেনব জবাব না জানতে চাওয়াই মঙ্গল—থাক না প্রচ্ছন্ন হয়ে একথা। ও বুঝেছে, ওর থেকে একটু দূরে পাটাতনের ও প্রান্তে ওই যে লাজুক মুখচোরা ছেলেটি আনমনে সিগারেট টানছে, ও বড় অসহায়। হয়তো ইভা পারে, জানতে পারলে, ওর সে বেদনার ক্ষতে প্রলেপ দিতে—কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। ওর সব কথা যে সে জানে না, জানা যাবেও না কোন দিন।

কৃশাণুর দিক থেকে জোর করে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল ইভা। গৈরিকবসনা গঙ্গার ওপারে কিছুক্ষণ আগে অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য। দিনের শেষ আলো মিলিয়ে আসছে। চাঁদ ওঠেনি এখনও পূর্ব আকাশে।

ঝাপসা হয়ে আসছে চারিদিক। একঝাঁক পাখী, গাঙশালিকই হবে বোধ হয়, নৌকার উপর দিয়ে উড়ে গেল পাখা ঝাপটে। আকাশে থমকে থেকে আছে বিষণ্ণ শান্তির এক মহাসঙ্গীত, তার ধুয়োটা ধরে রেখেছে শ্রান্ত জোনাকির মত এক তারাটা। কেন যেন হঠাৎ কান্না পেল ইভার। একটা বোবা কান্না বুকে চাপ দিচ্ছে ক্রমশঃ। নাঃ, এ কী ছেলেমানুষী, এমনভাবে অহেতুক বিচলিত হয়ে পড়ার মানে কি? অন্যমনস্ক হতে চাইল সে। কথাবার্তায় মনটা ব্যাপৃত রাখতে হবে। কিছুতেই ধরা দেবে না নিজেকে। আজকের দিনটা ওর জীবনে এক দুর্লভ সঞ্চয়—উষর মরুভূমির মাঝখানে মরূদ্যানের আভাস—কৃশানু জানে না তাব মূল্যের পরিমাণ। কিন্তু ইভা তো জানে আজ তার বুভুক্ষু হৃদয়ের তৃষ্ণা কি ভাবে মিটেছে একটি মানুষকে একটি দিনের সেবার মাধ্যমে। এমন সুন্দর দিনের শেষ প্রান্তে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে না কিছুতেই, তাই আবার নূতন কথার সূত্র তুলে ধরে, আচ্ছা, আমার না হয় সংসারে কোন আকর্ষণ নেই, আমি না হয় সকালে পুডিং বানাই, বিকালে তা কুকুর দিয়ে খাওয়াই—তাই আমার এ দুর্মতি হলেও হতে পারে, কিন্তু আপনি কোন্ আক্কেলে রাজি হলেন এই বানের মুখে গাঙ পার হতে?

সেন্টিমেণ্টাল কৃশানু ফস করে বলে বসে, আপনি পাশে থাকলে গঙ্গা কেন সমুদ্রও পাডি দিতে রাজি আছি আমি!

বলেই লজ্জা পায়। ছি ছি, ইভা কি ভাবল! কিন্তু ইভা যে মোটেই সিরিয়াসলি নেয়নি কথাটা তা বুঝতে পারে তার কথায়। কৃশানু জানে না অনেক পার্টির অভিজ্ঞতাসম্পন্না ইভা এ জাতীয় কম্প্লিমেণ্টস বহুবার পেয়েছে বহুজনের কাছে। এ কথাও জানে না যে ইভা বুঝতে পারে এটা সে জাতীয় ফাঁকা বুলি নয়। আর তা বুঝতে পারে বলেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠে লঘু করে দেয় কথাটা, বলে, কথাটা বড তাড়াতাডি বলে ফেললেন মাস্টারমশাই, আর আধঘণ্টা পরে বলা উচিত ছিল।

কেন?

আর আধঘণ্টা পরে চাঁদ উঠবে! আজ পূর্ণিমা!

কৃশানু চটে উঠে বলে, আপনি তো ভারী ইয়ে—

ইভা তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, চুপ চুপ, অত চেঁচাবেন না; তাহলে মাঝি আপনাকে ব্যারাকপুর থানায় নিয়ে গিয়ে তুলবে।

কৃশানু গলাটি অবশ্য নীচু করে, অবাকস্বরে বলে, কেন, থানায় কেন?

এতক্ষণে বুকচাপা কান্নাটাকে উইংসের আড়ালে ঠেলে দিয়ে রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে কৌতুকময়ী চটুল ইভা। বলে, মাঝি আমাদের সম্বন্ধে যা ভেবেছে তাতে আপনি-আজ্ঞে একেবারেই চলে না। অত চেঁচিয়ে যদি আপনি আপনি করেন ও সন্দেহ করবে আপনি বুঝি আমাকে নিয়ে ইলোপ করছেন।

কৃশানু লাল হয়ে ওঠে।

কিন্তু না, হার মানবে না সে আজ। একজন অনাত্মীয়া অচেনা মহিলার সঙ্গে সে আজ অনায়াসে আলাপ কবতে পেরেছে, তার চটুল রসিকতায় মুখে মুখে জবাব দিয়েছে। ধাপে ধাপে অনেকটা এগিয়ে গেছে ইভা। যায় যাক, সে রাশ টেনে থামাবে না তাকে। দেখাই যাক না কতটা দৌড ওর।

তাই বলে, তবে কি এবার থেকে তুমি-তুমি বলব ?

ইভা বলে, চেঁচিয়ে বললে তাই বলা উচিত।

আর আস্তে বললে ?

ইভা একটা জুতসই জবাব দেবার জন্যই বোধ হয় সময় নেয়। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে কি যেন ভাবে। জবাব দেবার আগেই মাঝি বলে ওঠে, গাঙের গতিক খুব ভাল নয় বাবু।

বাবুকে বললেও কথাটা কানে যায় শুধু ইভারই। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এতক্ষণে। পশ্চিমাকাশেব যে ক্ষুদ্র কালোরঙের মেঘে আড়াল হয়েছিল অস্তগামী সূর্য, ইতিমধ্যে আকারে সেটা বেড়েছে। ঠাণ্ডা একটা এলোমেলো বাতাস বইতে শুরু করেছে। গাঙের বুকে জেগেছে শিহরণ। কুটি কুটি ছোট ছোট ঢেউয়েব উপর অশান্ত বাতাসের চাবুক আপসানি। ওপারে উঠেছে একটা ধুলোর ঝড়। কারখানাব কালো চিমনিগুলো ঢেকে গেল ধুলোর ঝড়ে।

কিন্তু এসব কিছুই নজরে পড়েনি কৃশানুর। বাইরের ঝড়ের দিকে তার মন নেই, আছে ভিতরের ঝড়ের দিকে। আজকের সারাটা দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছে সে মনে মনে। একটি পূর্ণযৌবনা নারীর একান্ত সাহচর্যে, তার চটুল রসিকতায় কৌতুকবচনে বিদ্ধ হয়েও কোন মনোবিকলন হয়নি তার। কৃশানু ভাবতে থাকে হয়তো অহেতুক ভয়ে ভয়ে মরেছে সে এতদিন। নারীভীতিটা হয়তো নিতান্তই রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জুতেই বা কেন ? পুষ্পমাল্যে। বুকে তুলে নিলেই দেখবে আর পাঁচটা স্বাভাবিক মানুষের মতই ফুলের সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে মন, তার পেলব স্পর্শসুখে অবশ হয়ে আসছে দেহ।

মাঝি বলে, মাঠানকে নিয়ে আপনি ছইয়ের ভিতর গিয়ে বসুন বাবু।

কৃশানু বাধা পেয়ে বলে কেন ?

বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে দু-একটা। পালটা ইতিমধ্যেই নামিয়ে নিয়েছে মাঝি। হাওয়া বইছে উল্টো দিক থেকে, নৌকা অতি ধীর বেগে অগ্রসর হচ্ছে।

কটা বাজল বাবু ?

কৃশানুর হাতে ঘড়ি নেই। ইভা মনিবন্ধের দিকে তাকিয়ে বলে, ছটা বাজে।

মাঝির মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। প্রাণপণে বৈঠায় টান দেয়। ইভা লক্ষ্য করে দেখে আশপাশে একখানাও নৌকা নেই। জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যা, কাল-বৈশাখী ঝড় আসা বিচিত্র নয়। ঝড়জল হচ্ছেও মাঝে মাঝে। মাঝ-গাঙ অবশ্য ওরা পার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু ওপারের তটভূমি এখনও অনেকটা দূরে। মিনিট পাঁচেক পরেই ইভা অনুভব করল যে, মাঝির আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্বেও নৌকা একতিলও অগ্রসর হচ্ছে না। স্থাণুর মত বসে আছে কৃশানু—সে কি আন্দাজ করেছে বিপদটা ? মুখ দেখে বোঝা যায় না কিছু। ঘড়ির দিকে আর একবার তাকিয়ে ইভা বলে, ছটা সাত হয়ে গেল যে। বান এসে পড়বে নাকি, পারে যাবার আগেই ?

দাঁড় দুটো তুলে ফেলেছে মাঝি নৌকার গলুইয়ে। ও পাশের ছোট ছেলেটার হাত থেকে হালটা কেড়ে নিতে নিতে বলে, এসে যাবে না মাঠান, এসে গেছেন! আপনি ভিতরে যান, জোর করে ধরে থাকুন বাবুর হাত। জোর ধাক্কা লাগবে কিঞ্চিৎ।

কৃশানু বসেছিল, মাথা তুলে তাকাতেই একটি অপূর্ব দৃশ্য ফুটে ওঠে ওর চোখের সম্মুখে। গঙ্গার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ভীমবেগে ছুটে আসছে গৈরিকবসনা এক উন্মাদিনী! এ পার থেকে ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত একটা খাড়া পাঁচিল। বহুদূরে রয়েছে এখনও প্রাচীরটা ওর উচ্চতাটা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। শ্রাবণরাত্রির মেঘডম্বরুর মত একটা গুরু গুরু গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে দূর থেকে। শিকল বাঁধা একটা বয়াকে আত্মসাৎ করে ফেলল সেই জলপ্রাচীর। কচুরিপানার ভাসমান একটা বড় চাঙড় তারপর পড়ল তার কবলে—শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

মাঝি চিৎকার করে ওঠে, সামাল, বাবু সামাল। উঠে দাঁড়াবেন না,

শুয়ে পড়ুন। পাটাতন আঁকড়ে ধরুন। ভয় নেই, আমি হাল ধরে আছি।

সে সাবধানবাণী কৃশানুর কর্ণকুহরে প্রবেশ করল না। ও সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়েছিল এই অপূর্ব দৃশ্যের সামনে। স্থির অচঞ্চল নৌকার ছইয়ের ভিতর নয়, বাইরে এসে উঠে দাঁড়াল সে। জলের প্রাচীরটা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। কালনাগিনীর ক্রুদ্ধ গর্জন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এবার। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তটের উপর আছড়ে পড়া জোয়ারের ফেনিল আক্রোশ। তটরেখা খুব দূরে নয়। ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে একসার মানুষ। ওদের নৌকার দিকে হাত দেখিয়ে চিৎকার করে ওদের মধ্যে একজন কি যেন বলল। বাতাসের শব্দে ভেসে গেল সে সাবধান বাণী।

ছোট ছেলেটা ঘটিবাটি সামলে বসেছে পাটাতন আঁকড়ে ধরে। ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখে মাঝি শেষবারের মত চিৎকার করে ওঠে, খ্যাপামি করবেন না বাবু! মাঠানকে ধরুন।

মাঠান! তাই তো! সে তো একা আসেনি নৌকায়। তন্ময় ভাবটা কেটে যেতেই ওর মনে প্রশ্ন জাগে কোথায় ওর সঙ্গিনী! মৃত্যুপ্রাচীর এসে পড়েছে অতি নিকটে। পাশ ফিরতেই দেখতে পায় কৃশানু, ইভা এসে দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশটিতে একেবারে পাঁজর ঘেঁষে।

সেদিকে তাকাতেই ওর হাত দুটি ধরে ফেলে ইভা। হাত ধরা তো নয় আশ্রয় খোঁজা। ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে তার মুখ। জোড়া ভ্রূর নীচে দুটি ভীত আতঙ্কিত চোখে মৃত্যুভয়ের আর্তি। কৃশানু দৃঢ়মুষ্টিতে ওর দুটি হাত ধরে প্রায় কানে কানে বলে, ভয় কি ইভা। আমি তো আছি।

ইভার বিশীর্ণ বেপথুমান ওষ্ঠাধরে ফুটে ওঠে দুটি কথা, তুমি, তুমি আমাকে জোর করে ধরে থেক।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মাঝি চেঁচিয়ে উঠল—জয়শম্ভু!

আর পরমুহূর্তে নৌকার তলদেশে লাগল প্রচণ্ড আঘাত। যেন গঙ্গাগর্ভ থেকে অতিকায় একটা প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ ওদের নৌকায় ধাক্কা মারল। একেবারে খাড়া হয়ে ওঠে নৌকাটা, গলুইয়ের মাথায় মাঝিকে নিয়ে। আতঙ্কের যে তুঙ্গশীর্ষে উঠে মানুষ ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিত বোধ হারিয়ে আত্মরক্ষার প্রেরণায় আঁকড়ে ধরতে চায় জীবনকে—ইভা এই প্রচণ্ড আঘাতে তেমনই আত্মহারা হয়ে সবলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃশানুর বুকের উপর। জড়িয়ে

ধরে তার কণ্ঠ। টাল সামলাতে পারে না কৃশানু। ইভাকে বুকে নিয়ে উল্টে পড়ে নৌকার উপর।

ওর পেশীবহুল বুকের উপর কতক্ষণ উপুড় হয়ে পড়েছিল, ইভার তা খেয়াল নেই। কৃশানু কিন্তু একটি পলকের জন্যও চেতনা হারায়নি। বিপদ কেটে যাবার পরেও কয়েকটা মুহূর্ত দেরি হয় দৃঢবদ্ধ ইভার আলিঙ্গনপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে। নৌকা তখনও দুলছে বেশ, কিন্তু ওরা উঠে পড়েছে জোয়ারের মালভূমিতে।

আঁচল সামলে নিয়ে ইভা আবার গিয়ে বসেছে তার জায়গায়। দুজনেই ভিজে গেছে একেবারে।

মাঝি তিরস্কার করে বলে, সোয়ামীর হাত ধরে বসিয়ে রাখতে পার না, তুমি কেমন মেয়েমানুষ গো মাঠান।

ইভার মুখটা একেবারে বুকের উপর ঝুকে পড়েছে। কপালের টিপটাই জলে ধুয়ে সারা মুখে লেগেছে নাকি। মুখটা হয়ে উঠেছে টক্‌টকে লাল। কৃশানু চুপিচুপি বলে, লাগেনি তো আপনার কোথাও?

মাথা না তুলেই ঘাড়টা নাড়ে ইভা। জানায়, কোথাও আঘাত লাগেনি তার। কৃশানু মনে মনে ভাবে ওকে যদি ইভা ঠিক ঐ প্রশ্নটাই করত তাহলে সে কিন্তু অমনভাবে মাথা নাড়তে পারত না। লেগেছে, প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে তার। প্রবল বন্যার চাপে যেমন করে ভেঙে পড়ে বাঁধের আগল—তেমনি করেই ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে গেছে ওর আফসোসের একটা ভ্রান্ত ধারণা।

ভিজে কাপড় বদলাবার আর উপায় নেই। স্টেশনে পৌছে কৃশানু একবার বলে, শাড়িটা পাল্টে নেবেন ওয়েটিং রুমে?

ইভা মাথা নেড়ে জানায়, না।

চটুল ইভা ভিজে যেন চুপসে গেছে। সে বলে, না, আপনি যখন ভিজে পাঞ্জাবিটা পাল্টাতে পারবেন না, তখন আর এক যাত্রায় পৃথক ফল হয়ে লাভ কি। বলে না—এটা ছাড়লেই তো সেই চাঁপা শাড়িটা পরতে হয়। সেটা কি উচিত হবে? বলে না—এই ধরনের আরও হাজারটা কৌতুকমাখা কথা। শুধু মাথা নেড়েই জানায়, না।

ফার্স্ট ক্লাসের একটা নির্জন কামরায় উঠে বসল ওরা দুজন। কিন্তু নির্জনতাকে আর ভয় করে না কৃশানু।

আধ ঘণ্টা আগে কি একটা কথা বলেছিল কৃশানু, যেটা নাকি ইভার মতে

আধঘণ্টা পরে বলা উচিত ছিল। এখন সেই সুসময় এসেছে। জানলা দিয়ে রুপালী আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে কামরার মধ্যে। বৃষ্টি-ধোওয়া চাঁদের আলো! অনেক কথাই বলতে পারত কৃশানু, কিন্তু বলল না। যেন এই চুপ করে থাকাটাই এখন সবচেয়ে রোমান্টিক। কথার সৃষ্টি তো এমন চুপ করে থাকার জন্যেই। কথার পরে কথার মালা গেঁথে অপরিচিত দুটি মানুষ দূর থেকে কাছে আসে এমন একটা নীরব প্রহরে মৌন স্তব্ধতায় ডুবে থাকতে।

ইভা সে নির্জন ঘরেও প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলে, এদিকে সরে আসুন, আপনার পাঞ্জাবিতে সিঁদুরের একটা দাগ লেগেছে—মুছে দিই।

এতক্ষণে লক্ষ্য হয় বুকপকেটের কাছে ক্ষণিক বিহ্বলতার রক্তিম স্বাক্ষরটাকে। খুশী হয়ে ওঠে সে। আজকের দিনটা ওর বিজয়ের দিন। ইভা বহু দিন বহু বার ওর পা টেনেছে। লাজুক কৃশানু সহ্যই করে গেছে এতকাল। আজ একটা জুতসই জবাব দেবার দুর্লভ সুযোগটা সে কিছুতেই ছাড়তে পারল না, বলল, দাগটা শুধু পাঞ্জাবির উপর দিকেই লাগে নি ইভাদেবী, নীচের দিকেও লেগে থাকতে পারে। সেটাকে যখন মোছা যাবে না, তখন এটাও থাক না।

ইভার কর্ণমূল লাল হয়ে ওঠে। কোন জবাব দিতে পারে না। হয়তো কথা বলতেই ভাল লাগছিল না তার। তাই চুপ করে বসে থাকে জানলার কাচে গালটা চেপে। কৃশানুও চুপ করে বসে থাকে, রসিয়ে রসিয়ে রোমন্থন করে আজকের সারাদিনের স্মৃতিকে। আজ সে দিগ্বিজয়ী! দিনের শুরুতে নির্জন ঘরে যে মুখরা মেয়েটির উপস্থিতিতে অস্বোয়াস্তি বোধ করতে হয়েছিল, দিনের শেষে তাকে চূড়ান্তভাবে নীরব করে দিয়েছে সে।

ট্যাক্সি করে ইভাকে তার খুড়শ্বশুরের বাসায় পৌছে দেওয়ার সময় শুধু বললে, আপনার বাবাকে বলবেন, তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজি আছি।

আর্তস্বরে ইভা বলে, তার মানে?

তার মানে দীর্ঘদিনের একটা ভ্রান্ত ধারণা আজ আমার ভেঙে গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি—আমি স্বাভাবিক। আর পাঁচজনের মতই আমি।

ইভা বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করে, কি করে বুঝলেন?

মা গঙ্গা আজ আমায় চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মাস ছয়েক হল কলকাতার স্কুল কলেজ সব খুলে গেছে। আরব সাগরের জল এসে পৌঁচেছে চেরাপুঞ্জিতে। নেমেছে ধারাস্রোতে কলকাতায়। পথ-ঘাট ভরে গেছে জলে। তারপর হাল্কা হয়ে এসেছে আবার আকাশ। এই কমাসে কৃশাম্বুও বদলে গেছে বেশ। আকৃতিতে না হলেও প্রকৃতিতে।

এতদিন ট্রামে উঠে ওর গতিভঙ্গিটা ছিল নাগাড় অফব্রেক বলের মতই একঘেয়ে। ফুটবোর্ডে পীচ খেয়েই ডানদিকে ভাঙত সে। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ক্রমে। পারতপক্ষে ফুটবোর্ডে পা দিয়ে বাঁ দিকে তাকাতই না—তাকালেও সামনের একজোড়া সীটের মাথার উপর দিয়ে ফেলত দৃষ্টি। না দেখলেও নিকটবর্তী সীটের অধিবাসীনীদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সে থাকত পূর্ণ সচেতন। সর্ট-ফাইন-লেগের প্রসারিত কর ফিল্ডসম্যানকে চোখে না দেখেও যেমন ভুলতে পারে না ব্যাট্‌সম্যান। ও জানত সেদিকে দৃষ্টিব একটা ছোট খোঁচা তুললেও মারাত্মক পরিণতি হতে পারত তার। হয়তো একট্রাম লোক চীৎকার করে উঠত 'হাউসন্থাট!' হয়তো লেগ-আম্পায়ারের মতই হাতটা তুলে কণ্ডাক্টাব ওঁকে নেমে যেতে বলত।

কিন্তু আজকাল আর অতটা ভয় করে না। আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে ক্রমে। হাত জমে যাওয়া ব্যাটস্‌ম্যানের মতই জোরালো হিট করে দেখেছে লেডিস-সীটের দিকে। শুধু চোরা-গ্লান্স নয়, সজোর-হুক্ করেও দেখেছে। না, আউট সে হয়নি। বহুবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দেখেছে ও দিকে। নানান বেশে নানান বযসের মেয়েকে দেখেছে, দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি একবারও। বুকে খাতা চাপা কলেজের ছাত্রী, বাঁ-হাতে রিস্টওয়াচ বাঁধা আফিসগামীনী, সাদা ঘোমটা বাঁধা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স। লাল-নীল-সবুজ-হলদে রঙের ধনেখালি, শান্তিপুরে, মাইশোরী আর কাঞ্চিভরমই নজরে পড়েছে—কাচ অথবা সেলোফেন নয়। খুশীয়াল হয়ে উঠেছে। ওদের একজন অধ্যাপক রোল নাম্বাবের বদলে নাম ধরে ডাকতেন। বহুবার শুনে শুনে মিষ্টিনামের একটা মালা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তার। 'দীপালী বসু, দীপ্তি রায়, সুলেখা সান্ন্যাল, ছায়া বিশ্বাস', অথচ ও কাউকে চিনত না। এতদিনে কৃশাম্বুর সাহস হয়েছে, সেদিন ভবেশবাবুর ডাকের তালে তালে ও মুখ তুলে দেখল। প্রথম উপলব্ধি করল এই নামের মালায় প্রত্যেকটি ফুল এক-একটি পৃথক সত্তাকে চিহ্নিত করে। ওরা একে একে উঠে দাঁড়িয়ে সাড়া দিল—প্রেসেণ্ট্ স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস প্লীস।

ও মুখ তুলে তুলে দেখল—দীপালী বসুর বেণী, দীপ্তি রায়ের ঝুমকো দুল, সুলেখা সান্যালের রক্তিম সীমন্ত আর ছায়া বিশ্বাসের সরু ফ্রেমের চশমা। চিনল সহপাঠিনীদের। ওর ইচ্ছা করছিল সবকটি মেয়েকে নিমন্ত্রণ করে কফি হাউসে, নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেয়—সবকটি মেয়েকে দল বেঁধে নিয়ে যায় লাইট হাউসে।

মায়ের সাহচর্য পায়নি কৃশানু। ছোট বোন, বড়দিদি, মাসী পিসী, এমন কি দূর সম্পর্কের একটা পাতানো বউদিও পায় নি বেচারী। পেলে হয়তো এ দশা হত না। মেয়েমানুষ জাতটাকেই ও এড়িয়ে চলত ভয়ে। তার স্কেচবুকে নারীচরিত্রের তাই স্থান হয়নি কোনদিন।

প্রমীলারাজ্যে নাকি পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। তার কনভার্স থিয়োরেমটা মহাকবির পরিকল্পনাতে আসে নি। কৃশানুর মনোরাজ্য ছিল তারই একটা বাস্তব উদাহরণ। শতাব্দীর প্রায় চতুর্থাংশে এমন একটা রাজ্যে বসবাস করে হঠাৎ ঘা খেল কৃশানু দুটি রমণীর অনধিকার প্রবেশে। দুটি নয় তিনটি। প্রথমত কৌতুকময়ী চটুল ইভা, দ্বিতীয়ত অন্তরালবর্তিনী স্বাহা, তৃতীয়ত উইংসের আড়ালে প্রতীক্ষমানা আইভি। সেদিনের গঙ্গাবক্ষে দুর্ঘটনার পরে ইভাও সরে গেছে নেপথ্যে। শ্বশুরবাড়িতেই থাকে সে। ক্বচিৎ কখনও এসেছে ঘোষাল সাহেবের বাড়ি, কিন্তু মনে হয়েছে কৃশানুর, সে যেন সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে সম্ভাব্য সাক্ষাৎ। কারণটা ঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারেনি। হয়তো সেদিনকার ক্ষণিক বিহ্বলতার জন্যে সে মর্মান্তিক লজ্জিত, হয়তো পাঞ্জাবির তলায়-লাগা রক্তিম চিহ্নটার উল্লেখেই সে মরমে মরে গেছে। সযত্নে এড়িয়ে চলছে ওকে।

আইভির সম্বন্ধে অবশ্য কিছুই জানে না। ভবতারণ সে প্রসঙ্গ আর তোলেননি। ইভার সঙ্গে তো দেখাই হয় না।

এদিকে স্বাহা মিত্র ওর মনের দুয়ার খুলে দিয়েছে অনেকটা। প্রতি সপ্তাহে দু'তিনখানি চিঠি সে পায়, দু'তিনখানি চিঠি সে লেখে। একটি একটি করে পাপড়ি মেলে যেমন করে ফুটে ওঠে পদ্মফুল, বাতাসে বিলিয়ে দেয় আপন সুগন্ধ—ঠিক তেমনি করেই ওদের পরিচয় ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করছিল। অনেক সহজ হয়ে এসেছে সম্বন্ধটা—আন্তরিক হয়েছে বন্ধুত্ব। গার্ড-ফাইলে স্বাহার চিঠি আর তার উত্তর তারিখ মিলিয়ে পর পর এঁটে রেখেছে। কতবার এগুলো পড়েছে তার ঠিক নেই। এখনও পড়ে। সাম্প্রতিক একখানা

চিঠিতে স্বাহা লিখেছে—তোমার চিঠি পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল, এমন করে নিজেকে ক্ষয় করছ কেন? অতগুলো টুইশানি করতে হবে না তোমাকে। তাহলে পড়াশুনা করবে কখন? ফার্স্ট ক্লাস তোমাকে পেতেই হবে, শুধু তাই নয়, যথেষ্ট পড়বার সময় পেলে তুমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তারপর নিশ্চয় কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবে—তাই নয়? আমি বলি কি, এক কাজ কর না কৃশানু। আমার কাছ থেকে কিছু ধার নাও। আমার অনেক টাকা, বুঝলে। এমন কিছু লাখ পঞ্চাশ নয়, তবু যথেষ্ট টাকা রেখে গেছেন বাবা, আমাদের তিনজনের জন্য। টুকলির বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। মাসীমাই আমাদের গার্জেন—মেশোমশাই জীবিত থাকতেই। দাদা মত দিয়ে চিঠি লিখেছে। বলেছে, সুপাত্র পেলে তার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। বেঁকে বসেছে টুকলিই। এমন বোকা মেয়েটা, জানলে, বলে দিদির বিয়ে না হলে আমি বিয়ে করব কি করে? অনেক করে তাকে বোঝানো হয়েছে। রাজী হয়েছে শেষ পর্যন্ত। ওর বিয়ে মাস-দুয়েকের মধ্যেই দিয়ে দেব। ভাল পাত্র পেয়েছি একজন। দাদা ফিরে আসতে আসতে আমিও পাস করে বের হব। দাদার ইচ্ছে তারপরে আমরা দুজনে এখানেই প্র্যাকটিসে বসি। আমার ইচ্ছে তারপর আমিও একবার বাইরে যাব। একা যেতে যদি সাহস না পাই তুমিও সঙ্গে যেতে পার। তারপর একসঙ্গে দুজনে ফিরে আসব। তুমিও একটা ডিগ্রি-টিগ্রি নিয়ে আসবে। আমি জানি দাদা তাতে আপত্তি করবে না। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। আপাতত তুমি কিছু টাকা ধার নাও আমার কাছ থেকে। টুইশানিগুলো ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ে লেগে যাও বরং পরীক্ষার পড়ায়। শোধ দেবার কথা ভেবে অত ব্যস্ত হয়ে উঠছ কেন এখন থেকেই? কতরকম ভাবেই তো শোধ দিতে পার তুমি। আর কিছু না হোক, পরে যখন চাকরি করবে তখন না হয় ইনস্টলমেণ্টে শোধ করে দিও।

কৃশানু মূর্খ নয়। এ চিঠির ছত্রে ছত্রে যে ইঙ্গিত করেছে স্বাহা তার অর্থ বোঝবার মত বাংলা ভাষাজ্ঞান তার আছে। কিন্তু সে তো পাগল নয়! তাই ওর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু না বুঝবার ভান করে লম্বা লম্বা জবাব লেখে। ও-কথা এড়িয়ে যায়!

জগদীশ দে দার্জিলিঙ থানায় সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছেন। মধ্যবয়সী ধুরন্ধর ও. সি.। ডিপার্টমেণ্টে সুনাম আছে তাঁর। ভবতারণ ঘোষালের প্রিয়-পাত্র। সকালবেলাতেই তিনি একটা ট্রাঙ্ক-টেলিফোন পেয়েছেন। বড়-কর্তা নির্দেশ দিচ্ছেন বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর মধ্যমা কন্যাটিকে কলকাতা পাঠিয়ে দিতে। আইভি দার্জিলিঙে একটি কনভেণ্টে থেকে সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পড়ে। জগদীশ দে তার লোকাল গার্জেন। সব ব্যাপারেই ঘোষাল সাহেবের নির্দেশ একেবারে স্পেসিফিক। আগামী মঙ্গলবারের সকালের প্লেনে যেন আইভিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জগদীশবাবু বিশ্বস্ত কোন লোক দিয়ে আইভিকে হস্টেল থেকে আনিয়ে একেবারে বাগডোগরায় প্লেনে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন যেন। দমদমে ভবতারণবাবু স্বয়ং তাকে লুফে নেবেন বাউণ্ডারীর শেষ সীমায় দাঁড়ানো ফিল্ডস্‌ম্যানের মত। নির্দেশটা প্রাঞ্জল, যদিও প্রাণটা জল হয়ে যায়নি প্রৌঢ় জগদীশের। তিনি জানেন যে, ভবতারণ জানেন তাঁর কন্যার স্বভাব, এবং আরও জানেন যে কন্যাটি প্যারাসুট ল্যাণ্ডিঙে অভ্যস্ত নয়—তাই এ ব্যবস্থা। জগদীশচন্দ্র এও জানেন যে এইসব আন্-অফিসিয়াল নির্দেশ নিভু‍র্ল ও যথাযথভাবে পালন করার অর্থ 'সি'কে 'বি' এবং 'বিকে 'এ' করা। তিনি নিজেও তা করে থাকেন তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের বাৎসরিক সি. সি. আর-এ! এ জাতীয় আন্-অফিসিয়াল অর্ডার পালন করতে গিয়ে অফিসিয়াল কাজে যদি কিছু গাফিলতি হয় তাতে ক্ষতি হয় না। অফিসিয়াল কাজ অষ্টম খুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে।

তাই সর্বপ্রথমেই তিনি একটা টেলিফোন করলেন এয়ার অফিসে। বুক করতে চাইলেন মঙ্গলবারের সকালের সার্ভিসের একটি আসন। এয়ার লাইন্‌সে একটি মেমসাহেব আছেন—তাঁকে যতবারই টেলিফোন করেছেন জগদীশ ততবারই শুনেছেন সীট নেই। অদ্ভুত সুমিষ্ট মহিলার কণ্ঠস্বর, মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দেবার জন্য সদা উদ্যত। সুমিষ্টতম কণ্ঠস্বরে তিনি এবারও জানালেন সেই পিত্তিজ্বালানো বার্তাটি—'রিগ্রেট, নো এ্যাকোমোডেসান্!' শুধু মঙ্গল নয়, আগামী তিন দিনের সব আসন পূর্বেই সংরক্ষিত করা হয়েছে। কিন্তু জগদীশ দেও ব্যাঘ্র শাবক! দুঁদে দারোগা তিনি। পরিচয় দিতে হল তাঁকে, জানাতে হল বিশেষ জরুরী কাজে মঙ্গলবারের সকালের প্লেনে একজনকে কলকাতায় পাঠাতে হবেই। স্টেট এমার্জেন্সি! যার বাড়া কথা নেই! আসন যদি না থাকে তাহলে মাল কমিয়ে পাউণ্ডেজ ঠিক রেখে একটি অতিরিক্ত

আসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আধঘণ্টা ধস্তাধস্তি করে দু তিন জায়গায় টেলিফোন করে অবশেষে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হল।

এবার আইভিকে হস্টেল থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সকালের ডাকটা দেখা হয়নি, কাল রাত্রে জলা পাহাড় অঞ্চলে একটা সিঁদেল-চুরি হয়েছে। সকালেই থানায় এসে পৌচেছে এফ. আই. আর.। লোকজন গ্রীষ্মের ছুটিতে আসতে শুরু করেছে, আর ওদেরও কর্মতৎপরতা বাড়তে শুরু করেছে। ওখানেও এন্‌কোয়ারিতে কাউকে পাঠাতে হবে। আরও কত কাজ পড়ে আছে। তা যাক, সর্বপ্রথমেই মিস ঘোষালের বখেড়াটা মিটিয়ে ফেলা দরকার। ধড়াচুড়া আঁটতে থাকেন জগদীশবাবু।

স্ত্রী মণিমালা কেটলিতে গরম জল ঢালতে ঢালতে বলেন, এখনই বেরুচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ, শুনলে না, ঘোষাল-নন্দিনীকে কলকাতা পাঠাতে হবে।

সে তো মঙ্গলবারে, এখনই অত উতলা হয়ে উঠলে কেন?

হাসেন জগদীশবাবু। মেয়েমানুষ, কী বুঝবে! এসব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার তাৎপর্যটা বোঝবার বুদ্ধি থাকলে বাবো হাত কাপড়েও কাছা দেয় না? কাজটা সহজ নাকি? আইভি মেয়েটি কী ধাতুতে তৈরি তা কি বুঝবে! বাঘের বাচ্ছা বাঘই! আইভিকে তিনি রীতিমত ভয় করে চলেন—বস্তুত ঘোষাল সাহেবের চাইতেও বেশী! যদিও খাতা-কলমে তিনিই নাকি আইভির লোকাল গার্জেন।

মণিমালা পাউরুটি কাটতে কাটতে বলেন, খাবার হয়ে গেছে, খেয়ে যাও।

বেল্ট কষতে কষতে জগদীশ বলেন, আগে মিস্ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা পাকা করে আসি।

মণিমালা বাঁকা হাসি হেসে বলেন, সকালবেলা টেলিফোনটা পেয়ে তুমি একেবারে খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠেছ দেখছি। গুনগুন করে ঠুংরি ভাঁজছ মনে হচ্ছে!

ঠুংরি ভাঁজছি? বেল্টটা খুলে ফেলে নতুন করে কষতে শুরু করেন জগদীশ।

অভিসারিকা রাধার মত—বেল্ট্ বন্ধ খুলু-খুলু যায়—হয়ে পড়ছে না? নিজে দৌড়বার দরকার কি? একটা টেলিফোনে বলে দাও না মেজ ধিঙ্গিকে, ওদের হস্টেলে তো ফোন আছে।

মণিমালা ঘোষাল সাহেবের পরিবারভুক্ত সকলকেই চেনেন। ইভার সঙ্গে অন্তরঙ্গতাও আছে। ঘোষাল সাহেবের তিন কন্যাকে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী নতুন নামে উল্লেখ করতেন জনান্তিকের কথোপকথনে—বড় ধিঙ্গি, মেজ ধিঙ্গি আর ছোট ধিঙ্গি। দার্জিলিঙে আসার আগে জগদীশ ছিলেন দমদমে। তখন ঘোষাল সাহেবের বাড়িতে বহুবার গিয়েছেন মণিমালা। বড় ধিঙ্গির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, ছোট ধিঙ্গিকেও তিনি স্নেহ করেন—কিন্তু দু চোখে দেখতে পারেন না এই নেকী অর্থাৎ মেজ ধিঙ্গিকে। অথচ ভাগ্যের এমন খেলা, ওঁর স্বামী হচ্ছেন এই মেজ ধিঙ্গির অভিভাবক।

জগদীশ বলেন, মেজ ধিঙ্গিকে তো চেন না তুমি, তাই রসিকতা করছ। বাপকো বেটি, ঔর সিপাহীকো ঘোড়ি! দুদিন ধরে তোষামোদ করে যদি রাজি করাতে পারি! রাই বিনোদিনী আদৌ কলকাতা যেতে রাজি হলে হয়। জানি না এখন কার সঙ্গে ওঁর রাসলীলা চলছে। যদি ওঁর লেটেস্ট কেষ্টটি কলকাতাবাসী হন তাহলে হয়তো বায়না ধরে বসতে পারেন, মঙ্গল নয়, সোমবারের প্লেনেই তিনি যেতে চান; আর এই দার্জিলিঙ পাহাড়ই যদি হয় তাঁর বর্তমান বৃন্দাবন তাহলে বলে বসতে পারেন দার্জিলিঙ পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি!

মণিমালা পাউরুটির উপরে মাখনের পলেস্তারা লাগাতে লাগাতে বলেন, তাহলে তুমিও মঙ্গলবারে কলকাতা যাচ্ছ বল?

আমি কেন?

আমার তো ধারণা মেজ ধিঙ্গির লেটেস্ট টার্গেট এখন তুমিই। সঙ্গে না গেলে রাই-বব-হেয়ারিণী কি যেতে রাজি হবেন?

জগদীশ হেসে বলেন, অত সৌভাগ্য করিনি। বলেই মনে মনে জিব কাটেন। কথাটা মর্মান্তিক রকমের বেফাস হয়ে গেছে। তাই এক চুমুকে চাটুকু শেষ করে মাখন মাখানো রুটির পীসটা হাতে নিয়েই বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়।

জগদীশবাবুর অনুমান মিথ্যা নয়। পিতার আদেশ আদ্যপ্রান্ত শুনে আইভি শুধু বললে, এ্যাবসার্ড! মঙ্গলবারে আমার যাওয়া হতেই পারে না, ঐদিন বিকালে একটা জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

জগদীশবাবু ওকে আপাদমস্তক একবার দেখে নেন। ফ্রকপরা এই খুকীটির তিনি নাকি স্থানীয় অভিভাবক। বয়স কত ওর? বিশ? বাইশ?

আন্দাজ নেই জগদীশের। একবার, মনে আছে মণিমালার একটা বাঁকা ইঙ্গিতের জবাবে উনি বলেছিলেন, কি যে বল তুমি, ও তো আমার হাঁটুর বয়সী। উত্তরে মণিমালা বলেছিলেন, বয়স সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। তোমার হাঁটুর বয়স বিয়াল্লিশ, তোমার সঙ্গেই জন্মেছে হাঁটুটা। মেজ ধিঙ্গি তোমার হাঁটুর বয়সী নয়—তার চেয়ে ছোট, তবু সময়ে বিয়ে হলে তিনজোড়া হাঁটু সেই পয়দা করতে পারত!···সেই ধমক খাওয়ার পর থেকে আইভিব বয়সটা আর কোনদিন আন্দাজ করবার চেষ্টা করতেন না। জগদীশ লক্ষ্য করে দেখেন ফ্রকপরা মেয়েটির মাথায় লাল রিবনের একটা বো বাঁধা, বব-করা খাটো কোঁকড়া চুল টাকা-টাকা হয়ে কানের দু পাশ দিয়ে উঁকি মারছে। মাজাটা অস্বাভাবিক রকমের সরু। মুখশ্রী সুন্দর না হলেও ফিগারটি তার সত্যিই অনিন্দ্য। সরু মাজা বেষ্টন করে টাইট-ফিটু টকটকে লাল একটা বেল্ট। দেহটাকে যেন ডমরুর রূপ দিয়েছে। সরু মাজার দুদিকে পুরন্ত দেহের আভাস।

দার্জিলিঙ থানার দুঁদে দারোগা জগদীশ দে আমতা আমতা করে বলেন, এ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল কবা যায় না?

একটি শব্দে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেয় আইভি এ প্রসঙ্গের,—এ্যাবসার্ড!

ঘাড়টা চুলকে জগদীশ বলেন, তা হলে তো মুশকিলে ফেললে তুমি। আমি আবার মঙ্গলবারে তোমার সীট বুক করলাম যে প্লেনে।

সেটা বদলিয়ে বুধবারে করুন।

তোমার বাবা আসবেন দমদমে।

তাঁকে একটা টেলিগ্রাম করে দিন।

জগদীশবাবুর মনে হল একবার প্রশ্নটা করে দেখবেন কিনা। অর্থাৎ জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্টটা কোথায়—কার সঙ্গে? হস্টেলবাসিনী একটি কুমারী-কন্যার এমন কী জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকতে পারে? লোকাল গার্জেন হিসাবে এ প্রশ্নটা করা কি অধিকার বহির্ভূত হবে? ঘোষাল সাহেব যদি ভবিষ্যতে কখনও জানতে চান, কেন মঙ্গলবারে আইভিকে পাঠানো গেল না, তখন কী জবাবদিহি করবেন তিনি? কিন্তু প্রশ্নটা করে বসলে আবার কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে না তো? আইভি যদি বলে বসে একজন আমেরিকান টুরিস্ট ছোকরার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সাণ্ডাকপু দেখতে যাওয়ার। লোকাল গার্জেন হিসাবে সে কথা শুনেও চুপ করে থাকা কি উচিত হবে ওঁর?

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। আইভি নিজে থেকেই বলে, মঙ্গলবার বিকালে আমার একটা স্যুটিং আছে।

স্যুটিং ? জগদীশের মুখটা হাঁ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, প্রডিউসার তরুণ গুপ্তের সঙ্গে একটা এনগেজমেণ্ট আছে। তরুণ গুপ্ত সিঞ্চল লেকে ওর ছায়াসঙ্গিনীর একটা সীন তুলবে পরশু, মানে মঙ্গলবার বিকেলে। একজন স্মার্ট একস্ট্রার দরকার তার। আমাকেই সে সিলেক্ট করেছে।

জগদীশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, তোমাকে তিনি চিনলেন কী করে, যে সিলেক্ট করলেন ?

বারে, উই আর ইন্টিমেট ফ্রেণ্ডস ! কাল সমস্তটা ছুটির দিন আমরা এক-সঙ্গেই বেড়ালাম যে ! এমন লাভলি স্মার্ট ইয়ংম্যান, কি বলব কাকাবাবু, আমি তো সিম্পলি চার্মড ! আচ্ছা, তরুণ বিকালে আসবে, আপনাদের বাসায় নিয়ে যাব'খন।

বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে জগদীশের ; 'ছায়াসঙ্গিনী'র স্যুটিং করছে কি একটা ফিল্ম কোম্পানী, এটা জানা ছিল তাঁর। সিঞ্চল লেকের প্রোটেকটেড এরিয়াতে ওরা একটা সট নিতে চায়, তাই ডি. সি.র কাছে অনুমতি চেয়েছে। সেই প্রসঙ্গে ডি. সির অফিসে তিনি দেখেছেন প্রডিউসার তরুণ গুপ্তকে। মধ্যবয়সী গম্ভীর প্রকৃতির রাসভারী মানুষটাকে দেখে 'লাভলি স্মার্ট' বিশেষণ দুটি তো মনে পড়েনি তাঁর ! তবে কি আইভির চোখে মাথাভরা টাক আর পাকা গোঁফজোড়াসমেত তিনি নিজেও সিম্পলি চার্মিং নাকি ? গোঁফগুলো কণ্টকিত হয়ে ওঠে এ চিন্তায়।

এ বিষয়ে একটু কৌতূহলী হয়ে ওঠেন সন্ধানী জগদীশ, বলেন, তরুণবাবু কোথায় উঠেছেন ?

স্নো-পিক্ হোটেলে।

মনে মনে ভ্রূকুঞ্চিত করেন জগদীশ। তরুণ গুপ্ত পাঁচ-সাতখানা বক্স-অফিস হিট করা ছবি তুলেছেন ইতিমধ্যে। অগাধ পয়সাওয়ালা প্রযোজক। সিনেমা-জগতের নাম করা লোক। তাঁর পদমর্যাদার তুলনায় এভারেস্ট অথবা উবেরয় নামটা শোনবার একটা আশা জেগেছিল মনে। কিন্তু সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করে বলেন, বেশ, তাহলে বুধবারের টিকিটই কাটছি আমি। অবশ্য বেশ বেগ পেতে হবে, কারণ বুধবারেও সীট নেই। সে যা হোক, তুমি

তৈরী হয়ে থেক। তোমার বাবাকেও একটা তার করে দিচ্ছি। আমি বরং বুধবারের সীট রিজার্ভ করে তোমাকে টেলিফোনে আর একবার কনফার্ম করব।

দিস্ ইস্ লাইক্ মাই ডিয়ারেস্ট কাকাবাবু! গলে পড়ে আইভি।

শশব্যস্তে উঠে পড়েন জগদীশ দারোগা। কি জানি—'থ্যাঙ্কু ওল্ড বয়!' বলে যদি ওঁর গণ্ডদেশে একটা চুমুই খেয়ে বসে খুকীটি! ছেলেমানুষের উচ্ছ্বাস তো! কে বলতে পারে!

কর্তব্যে ত্রুটি হয় না জগদীশবাবুর। ফেরার পথে স্নো-পিক হোটেলে আসেন একবার। গত সপ্তাহে যে সব বোর্ডার এসেছে তাদের নামের উপর চোখ বোলাতে থাকেন। ম্যানেজার সসঙ্কোচে হাত কচলাতে থাকে। আসে চা, ডবল ডিমের অমলেট, গোল্ড ফ্লেক। দক্ষিণ রায় স্বয়ং এসেছেন যখন তখন আঠারো-ঘা হবেই! আগে থেকেই সাবধান হচ্ছে ম্যানেজার। জগদীশবাবুর দৃষ্টি আটকে যায় একটি নামের উপর—পি. কে. নাহা। স্থায়ী ঠিকানার ঘরে লেখা আছে C/o ছায়ামুভি পিক্‌চার্স, রিজেন্ট পার্ক, টালিগঞ্জ। পাঁচ নম্বর ঘরে আছেন তিনি।

খবর নিয়ে জানা গেল মিস্টার নাহা ঘরেই আছেন। জগদীশবাবু নিজেই যান ওঁর ঘরে। দারোগা সাহেব দেখা করতে এসেছেন শুনে ছেলেটি একটু অবাক হল। খবরের কাগজের ছাপমারা একটা হাওয়াইয়ান সার্ট আর কর্ডের প্যাণ্টপরা ছেলেটি আপ্যায়ন করে বসায় তাঁকে। বেশ স্মার্ট ছেলে, ফিল্ম লাইনের চালু মাল। দারোগা এসেছে শুনেই ম্যানেজারের মত হকচকিয়ে যায়নি। সিগারেটের টিনটা এগিয়ে ধরে ইংরাজিতে বলে, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি?

জগদীশ ওর তিন দুর্গ-আঁকা সবুজ টিনের গর্ভ থেকে সাদা একটি সিগারেট বার করে নিয়ে বলেন, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঘাড়ছাঁটা ছেলেটি বললে, সো কাইণ্ড অফ য়ু।

আপনি কি বেড়াতে এসেছেন দার্জিলিঙে?

আজ্ঞে না মশাই, কাজে। একটা স্যুটিঙের কাজে। ছায়ামুভি পিকচার্সের ছায়াসঙ্গিনী!

আই সী! আপনিই বুঝি হিরো?

একগাল হেসে রোমান নোভারোর মত মুখ করে ছেলেটি বলে, এবারও

আপনার আন্দাজে ভুল হল দারোগাবাবু। হিরো নই আমি, আমি ক্যামেরাম্যান।

জগদীশ কপালে একটা টোকা মেরে বলেন, ডিয়ার মি! ছায়াসঙ্গিনী? আপনারা তো সিঙ্কল লেকে ছবি তোলার জন্য একটা দরখাস্ত করেছেন না?

ছেলেটি হেসে বললে, এক্সাক্টলি, থ্যাঙ্কস্ টু য়োর ভিজিলেন্স—ভারি নীট করে রেখেছেন লেকটাকে আপনারা। স্পটটা দেখেই আমার লোভ হয়েছিল এখানে একটা সট নিতে হবে। ইন ফ্যাক্ট, এ সীনটা ছিল না স্ক্রীপ্টে—আমি জোর করে এটা এনসার্ট করে দিলাম। এবার ওকে দেখাচ্ছে অনেকটা সত্যজিতের মত—আউটডোর স্যুটিঙের একটা বহির্দৃশ্যের মুগ্ধতায় বিহ্বল পরিচালকের মত।

আপনাদের প্রডিউসার তরুণবাবুও এসেছেন নাকি!

না, ওঁরা কালকের প্লেনে আসবেন। আমরা কয়েকজন এ্যাডভান্স পার্টির লোক আগেই চলে এসেছি। ওসব ডাইরেক্টার প্রডিউসার কিছু নয় মশাই, যন্ত্রটা তো আমার হাতে!

তা তো বটেই। কিন্তু ছায়াসঙ্গিনীর ক্যামেরাম্যানের পদবী তো 'নাহা' নয়—কি যেন নামটা ভদ্রলোকের, ঠিক মনে আসছে না—

জয়ন্ত তরফদার!

এক্সাক্টলি। আপনি তাহলে—

আমি তাঁরই এ্যাসিস্টেন্ট। বললে ছেলেটি এ্যালেক গুইনেসের মত সিরিয়াস মুখ করে।

আই সী, এ্যাসিস্টেন্ট ক্যামেরাম্যান আপনি! কত মাইনে পান?

নাহার মনে হল প্রশ্নবান নয় হাতের গ্লাভ্‌সটা ছুঁড়ে মেরেছেন এবার দারোগাবাবু। এরল ফ্লিনের ভঙ্গিতে বাও করে ডুয়েলের এনগেজমেন্টটা এখন করে ফেলা উচিত; তা কিন্তু করল না সে। কান দুটো একটু লাল হয়ে ওঠে ছোকরার। ঢোক গিলে বলে, সরাসরি এ প্রশ্নটা করা কি একটু আনপ্তিভালরাস হয়ে যাচ্ছে না স্যর?

জগদীশ হেসে বলেন, পুলিসের চাকরিতে ঐ তো অসুবিধা মিস্টার নাহা—আপনার জবাব শোনার পরে আমাকে আবার একটি প্রশ্ন করতে হবে—এক টিন থ্রি-কাস্‌ল সিগারেটের দাম কত!

য়ুল ব্রেনারের মত উদ্ধত ভঙ্গিতে ছেলেটি বড় বড় চোখ করে বলে, পুলিসের

চাকরি করেন বলে একের পর একটা অভদ্র প্রশ্ন করবার অধিকার আপনার থাকতে পারে, কিন্তু দেড়শো টাকা মাইনের এ্যাসিস্টেন্ট ক্যামেরাম্যানও স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক। জবাব দিতে সে বাধ্য নয়।

ওঁর থ্রি-কাসল সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে জগদীশবাবু বলেন, নয়ই তো! স্বাধীন দেশের নাগরিক যখন তখন নিজেকে তরুণ গুপ্ত বলে বান্ধবীদের কাছে পরিচয় দেবার স্বাধীনতাও আপনার থাকা উচিত।

একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে যায় পি, কে, নাহা।

জগদীশবাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, আর প্রশ্ন কিছু করব না, শুধু একটা খবর দিয়ে যাব তোমাকে। আইভি নামে যে মেয়েটির সঙ্গে মঙ্গলবার বিকালে তোমার, অর্থাৎ প্রডিউসার তরুণ গুপ্তের সিঙ্কল লেকে বেড়াতে যাবার কথা সে বেঙ্গল পুলিসের ভবতারণ ঘোষালের মেয়ে। ভবতারণ ঘোষালের নাম শুনেছ? সিভিল লিস্ট খুলে দেখ—আরক্ষা বিভাগে প্রথম পাতাতেই নামটা পাবে!

বব হোপ কে চেনেন না জগদীশ, তাই নাহার ড্যাবড্যাবে চোখ দুটোকে মরা পাবদা মাছের মত বলে মনে হল তাঁর।

উইথ য়োর পার্মিসন, বলে আর একটি সিগারেট তুলে নিয়ে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন জগদীশবাবু।

থানায় ফিরে আবার টেলিফোন তুলে নিতে হল। এয়ার অফিসের সেই মধুকণ্ঠ মেমসাহেব ধরলেন ও প্রান্তে। না, মঙ্গলবার নয়, বুধবারের সকালে তাঁর একটি সীট চাই। এখন আর নতুন করে ব্যবস্থা করা যাবে না? যেতেই হবে। স্টেট এমার্জেন্সি! বুধবারে কোন গোবেচারী ধবনেব যাত্রীকে মঙ্গলে ঠেলে দিয়ে সীট খালি কর।...তা অসম্ভব?. তা হলে বুধবারের প্লেনের লাগেজ কমিয়ে একটা বাড়তি প্যাসেঞ্জার নেবাব ব্যবস্থা করা হোক।...হ্যাঁ, ডি,সি, র লিখিত অর্ডার পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা তিনি করবেন।· ·কি? মঙ্গলবারের সেই ভেকেণ্ট সীটটা? যা ইচ্ছে করতে পারেন ওঁরা। না না না, সেটার আর দরকার নেই। কতবার বলতে হবে এককথা।

ব্যবস্থাটা পাকা করে একটা স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি।

এইবার ডাক-ফাইলটা দেখতে হয়। কিন্তু না, এখনও দুটো কাজ বাকী আছে, প্রথমত ঘোষাল সাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে বুধবারের কথাটা জানানো, আর দ্বিতীয় আইভিকে টেলিফোনে কনফার্ম করা। তৎক্ষণাৎ

টেলিগ্রাম ফর্মে খবরটা লিখে একটা সেপাইয়ের হাতে সেটা ডাকঘরে পাঠান; আর টেলিফোন তুলে ওদের হস্টেলের নম্বরটা চাইলেন। ও-প্রান্ত থেকে মিষ্টি গলায় ভেসে এল—হ্যালো?

জগদীশ ইংরেজিতে বলেন, দয়া করে একবার আইভি ঘোষালকে ডেকে দেবেন? আমি তার লোকাল গার্জেন কথা বলছি।

ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল, ডিয়ার মি! কে কাকাবাবু? আমি আইভি। আপনাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম। শুনুন। এই মাত্র স্নো-পিক হোটেল থেকে তরুণ ফোন করে জানাল মঙ্গলবারের প্লেনেই তাকে কলকাতা যেতে হচ্ছে। তাই এ্যাপয়েন্টমেণ্টটা ক্যানসেল করল সে। সুতরাং টিকিট বদলাবার আর দরকার নেই আপনি মঙ্গলবার যাবারই ব্যবস্থা করুন।

আমতা আমতা করে জগদীশ বলে, কিন্তু এখন তো আর তা হয় না।

নিশ্চয়ই হবে। ভারি নটি আপনি, আবদেরে গলায় আইভি বলতে থাকে, তখন যেই বললাম, মঙ্গল নয় বুধে যাব, অমনি বললেন তা হয় না। এখন যেই বলছি, বেশ আপনার কথাই থাক মঙ্গলেই যাব, অমনি আবার বলছেন তা হয় না। তরুণের সঙ্গে একসঙ্গে গেলে একটা সঙ্গী পাই, তা আপনার সহ্য হয় না।

এবার দৃঢ়স্বরে জগদীশ বলেন, তরুণ গুপ্ত মঙ্গলবারেব প্লেনে কলকাতা যাচ্ছেন না, আর গেলেও তাঁর সঙ্গে যেতে হবে না তোমাকে।

ও পাশ থেকে ভেসে আসে এক ঝলক খিলখিলে হাসি, বাই জোভ! আর যু জেলাস অফ হিম?

কানটা ঝাঁ ঝাঁ কবে ওঠে জগদীশেব। কী জবাব দেবেন স্থির কবে উঠতে পারেন না।

হঠাৎ পাশের ঘব থেকে মণিমালা এসে বলেন, কাকে ফোন করছ?

তৎক্ষণাৎ রিসিভার নামিয়ে রাখেন জগদীশ দারোগা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন তাকে একবার ভবতারণবাবুর কাছে যেতে হবে। ইলাকে পড়াতে। উপায় নেই। এইটেই তার অর্থোপার্জ্জনেব গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। অর্থসাহায্য তাকে কবতে চেয়েছেন ভবতারণ, চেয়েছে স্বাহা। টাকা ধার দেওয়ার প্রস্তাব। ধার নয়, দাদন! রাজী হতে পারেনি। এই টুইশানির নৌকার উপর ভর দিয়েই এম, এ, পরীক্ষাব সমুদ্র পার হতে চায়

সে। কোন দায় রাখতে চায় না। না হলে কবে সে ছেড়ে দিয়ে আসত এই গ্লানিকর দায়িত্ব।

এমন একদিন ছিল যখন ক্লাশের শেষ পিরিয়ড থেকেই উসখুস করত মনটা। চারটে থেকে ছটা এই দু ঘণ্টা কিছুতেই কাটতে চাইত না। পথে পার্কে এখানে সেখানে কাটিয়ে দিত। কখনও হাঁটতে হাঁটতে চলে আসত এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত, সেখান থেকে বাস ধরে হাজরা রোড। কখনও ক্লাশ ভাঙতেই চলে যেত বেলভেডিয়ারে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে বই পড়ত ঘণ্টা দেড়-দুই। তারপর হেঁটেই চলে আসত ঘোষাল-লজে। ইলা এসে বসত বইখাতা নিয়ে। কৃশানু ওর ট্রানশ্লেসন কারেক্ট করত, আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখত দরজার জোড়া হাতি আঁকা শান্তিনিকেতনী পর্দাটার দিকে—কখন দুলে ওঠে সেটা ওর হৃদস্পন্দনের তালে তালে। সাতটা পর্যন্ত পড়াবার কথা, কিন্তু পড়ানোর অজুহাতে গল্প করতে করতে আটটা নটাও বেজে যেত প্রায়ই। দু একদিন রাতের আহারও করে যেতে হয়েছে। আপত্তি জানিয়েছে কৃশানু, কিন্তু সে আপত্তি ধোপে টেকেনি। ইভা হয়তো বলেছে, আজ রাত্রে যে আমাদের মাংসের হাঁড়ি কাবাব হয়েছে সে কথা তোমার মাস্টার মশাইকে বলনি তো ইলু?

ইলা অবাক হয়ে জানতে চেয়েছে কেন, বললে কি হয়?

ওঁকে খেয়ে যেতে বললে তো খাবেন না, অথচ লোভ নিয়ে যাবেন। মাঝের থেকে হাঁড়ি-কাবাব হজম হবে না আমাদের।

ইলা মাস্টারমশায়ের পক্ষ নিয়ে হয়তো বলেছে, মাস্টারমশাই তোমার মত লোভী নন।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু মুখ নীচু করে কৃশানুকে নীরবেই দেরাদুন চালের ভাত খেয়ে যেতে হয়েছে হাঁড়ি কাবাব দিয়ে মেখে।

আজকাল সে রকম ঘটনা ঘটলে কৃশানু নিশ্চয়ই নীরবে সহ্য করত না এ স্নেহের অত্যাচার। ইভাকে হয়তো প্রশ্ন করে বসত, মাস্টারমশায়ের মধ্যে যে একজন লোভী লোলুপ আত্মগোপন করে আছে সে কথা আর কেউ বুঝতে না পারলেও আপনি কি করে টের পান ইভা দেবী?

কিন্তু এখন আর সে পরিবেশ নেই। এখন ও বাড়িতে যেতেই ইচ্ছা করে না। শ্বশুর একটু সেরে ওঠায় ইভা তাঁকে নিয়ে ফিরে গেছে শ্রীরামপুরে। শ্বশুরের কাছেই থাকে সে আজকাল। কৃশানুর অনেকবার ইচ্ছা হয়েছে

কোন এক রবিবারে গিয়ে খবর নিয়ে আসে, অথবা চিঠি লেখে কিন্তু সঙ্কোচে মন স্থির করে উঠতে পারেনি। এদিকে ভবতারণবাবুও কেমন যেন নিরাসক্ত হয়ে পড়েছেন সাংসারিক বিষয়ে। জনশূন্য বাড়িতে ইলাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য একদিন নৈতিক একটা দায়িত্ব বোধ করেছিলেন ঘোষাল সাহেব, আজকাল তাও করেন না। কারণ ইলা এখন একা নেই বাড়িতে। ইভা না থাকলেও আছে আইভি।

আইভি! এই মেয়েটির উপস্থিতিই কৃশানুর মনে সঞ্চার করেছে তার সান্ধ্যবৈঠকের প্রতি একটা বীতশ্রদ্ধা। মনে আছে তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা। সেদিন সন্ধ্যাবেলা পড়াতে এসে দেখে বাইরের ঘরে কেউ নেই। পর্দা সরিয়ে লাইব্রেরী ঘরে এল কৃশানু। যে টেবিলে বসে সে নিত্য পড়ায় ইলাকে, সেই টেবিলের পাশেই একটা ইজিচেয়ারে বসে একটি অপরিচিতা মেয়ে একখানা ইংরেজী সিনেমা সাপ্তাহিকের পাতা ওলটাচ্ছে। দেখেই চিনতে পেরেছিল কৃশানু—এ আইভি, ইলার মেজদি। গাঢ় ভায়োলেট রঙের একটা লাইলনেব শাড়ি পরেছে, গায়ে ওই রঙেরই একটা খাটো জ্যাকেট। নীবীবন্ধের কাছে অনেকটা অনাবৃত। শাড়ি ও ব্লাউজ এত পাতলা যে অধোবাসের হেম শেলাই পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়—গোলাপী রঙের সায়ার অতি সূক্ষ্ম চিকনের কাজটাও। মাথায় কার্ল-করা ছোট বব-চুল। বাঁ হাতে পাথর বসানো একটি সরু ব্রেসলেট, ডান হাতে একসার কাঁচের চুড়ি।

দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনে বই থেকে মুখ তুলে তাকায়।

ওর নিজের যখন দৃষ্টিবিভ্রম হয় তখন ওর সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির মনে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয় জানবার একটা কৌতূহল ছিল কৃশানুর। ইচ্ছা ছিল জানতে, কেউ যদি অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে তাহলে দৃষ্ট ব্যক্তির কেমন অনুভূতি হয়। সে কৌতুহল ওর চরিতার্থ হল এতদিনে। শুধু দৃষ্টি দিয়ে যে একটা মানুষকে গিলে খাওয়া যায়, তা এই প্রথম অনুভব করল। বুঝল, কেন বহুদিন আগে একটি বিচলিত বামার বামহস্ত অতর্কিতে স্পর্শ করেছিল তার গণ্ডদেশ!

মিনিটখানেক কেউ কোন কথা বলেনি। কৃশানু অবাক হয়ে ভাবছিল, এই মেয়েটির সজ্জার প্রতিটি আয়োজনের মূল প্রেরণা আবরণ নয়—উদ্ঘাটন! যৌবনপুষ্ট দেহের স্বতঃবিজ্ঞানেও যেন সে সন্তুষ্ট নয়, কিছুটা আণ্ডার-লাইন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রসাধন করেছে সে। ওর রক্তিম গালে, ঠোঁটে, ওর

চুনী-বসানো জড়োয়া দুলের দোলানিতে, ওর হাতকাটা জ্যাকেটের স্বচ্ছতায় যৌবনের আমন্ত্রণ। এতদিন 'ওপেক' জিনিসকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বচ্ছ হতে দেখেছে সে, অথচ এই প্রায়স্বচ্ছ বস্ত্রাচ্ছাদিতা তো তার চোখে বুলিয়ে দিতে পারল না কোন মোহাঞ্জন! যা দেখছে, তাই সে দেখছে—দৃশ্যের অতীত কিছু দেখছে না!

কাকে চাই?

ইলাকে।

সরি, সে তো বাড়ি নেই।

বাড়ি নেই? কখন ফিরবে?

ফিরতে রাত হবে, কেন বলুন তো?

না থাক, আমি যাই।—ফেরবার জন্য প্রস্তুত হয় কৃশানু। চলে আসে ড্রইংরুমে। মেয়েটি পিছন থেকে বলে, কোন খবর থাকলে আমাকে বলে যেতে পারেন। আমি হচ্ছি—

বাধা দিয়ে কৃশানু বলেছিল, জানি, আইভি দেবী, ইলার মেজদি।

এক্স্যাক্টলি। কিন্তু আমি তো ঠিক, মানে—

আমার নাম কৃশানু রায়। আমি ইলাকে পড়াই।

বাই জোভ! চমকে ওঠে আইভি, আপনার কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু আমার ধারণা ছিল, আই মীন—। ইভা তো আমাকে চিঠিতে—

কী ভেবে থেমে গিয়েছিল আইভি।

আচ্ছা, আমি চলি, পরে আসব।

কেন, বসুন না। ওরা এখুনি ফিরে আসবে।

কৃশানু হয়তো বসেই যেত, কিন্তু মতটা পালটাতে বাধ্য হল আইভির পরবর্তী যোজনাতে—ইভাও এসেছে কাল শ্রীরামপুর থেকে, সেও এসে পড়বে।

আইভির মুখে কোন চটুলতার অভিব্যক্তি নেই, তবু কৃশানু কেমন যেন অস্বোয়াস্তি বোধ করে। বলে, আপনিও যাননি যে ওদের সঙ্গে?

গাঁয়ের মানুষ শহরে এসেছি তাই। ওরা বাজারে গেছে, আমি সিনেমার টিকিট কেটে বসে আছি।

বাম মনিবন্ধের দিকে একবার তাকাল আইভি। কৃশানু লক্ষ্য করে দেখে ওটা ব্রেসলেট নয়, পাথর-বসানো একটা সৌখিন হাতঘড়ি। সেটার দিকে

একনজর দেখে আইভি শেষ করে তার বক্তব্য, ছটা বেজে দশ, জয়ন্ত তাহলে এল না। নষ্টই হবে টিকিট তুটো।

কৃশানু একটু ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করে, কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা?

নিউ এম্পায়ারে। ম্যান এ্যাণ্ড ওম্যান। দেখেছেন বইটা? বসুন না।

এবারও আসন গ্রহণ করে না কৃশানু, বলে, না।

এক কাজ করলে কেমন হয়? জয়ন্তকে জব্দ করা যাক। যেমন লেট করেছে তেমনি শাস্তি হবে। চলুন, আমরা তুজনেই দেখে আসি বইটা।

কৃশানু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। জয়ন্ত কে তা সে জানে না। সময়মত হাজিরা না দেওয়ায় তার অন্যায়টা নিশ্চয়ই গুরুতর। কিন্তু এক মিনিটের আলাপে এ মেয়েটির তরফের এ আমন্ত্রণ শুধু তুঃসাহসিকই নয়, বোধ হয় আরও কিছু। কৃশানুর মনে পড়ল, একদিন এই মেয়েটির সম্বন্ধেই সে ইভাকে বলেছিল, আপনার বাবাকে বলবেন, তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজি আছি।

কি, যাবেন?

কৃশানু জবাবে বলে, মাফ করবেন। আমার অন্য একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

নমস্কার করে চলে গিয়েছিল সে।

সেই প্রথম সাক্ষাৎ।

তারপর এ কয়দিনে বারে বারে তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে এই অতি-আধুনিকা মেয়েটির। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। অধিকাংশ সময়েই সফলকাম হয়নি। ইভার সঙ্গে এবারও দেখা হয়নি। পরদিন সে নাকি আবার ফিরে গেছে শ্রীরামপুরে। কৃশানুকে রোজ আসতে হয় সন্ধ্যাবেলায় ইলাকে পড়াতে। তার তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত প্রত্যাখ্যান উপেক্ষা করেও আইভি জানিয়েছে তার ঔৎসুক্য। আলাপ করতে চেয়েছে, অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছে। সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে কৃশানু। যে নারী-ভীতিটাকে ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছিল বেচারি, সেটা যেন আবার ফিরে আসছে ওর মনে। আগের মতই ইলাকে পড়াতে পড়াতে জোড়া হাতি-আঁকা শান্তিনিকেতনী পর্দার দিকে তাকিয়েছে চকিতে—তবে প্রত্যাশার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নয়—আতঙ্ক-তাড়িত চাউনিতে। আইভির সামনে দাঁড়ালেই কৃশানু অনুভব করে সেই বিচিত্র অস্বোয়াস্তিকর অনুভূতি। পায়ের পাতা থেকে একটা সিরসিরানি শিরদাঁড়া বেয়ে যেন উপরে উঠতে থাকে। গলার ভিতরটা

শুকিয়ে ওঠে—জিবটা আঠা আঠা লাগে। ওর ভয় হয়—এই বুঝি মিলিয়ে যেতে শুরু করে ওর অঙ্গাবরণ! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে দুর্ঘটনা ঘটেনি একদিনও।

কৃশানু আশা করেছিল, সে আইভিকে বিবাহ করতে রাজি এ কথা জানার পর আরও সহজ হয়ে পড়বে ইভা। তার রসিকতা হবে আরও চটুল। তা কিন্তু হয়নি। বেচারি কৃশানু! কারণটা সে অনুমান করতে পারেনি।

ভবতারণবাবু তেমনিই আছেন। সংসারের কোন কথায় নেই। ফলে, পরিত্রাণের আর কোন পথ ছিল না কৃশানুর। একদিন অবশ্য ভবতারণ ওকে জনান্তিকে বলেছিলেন, আমি ইভার কাছে শুনেছি সব কথা। উই নিড্‌ন্ট হারি। ও স্বভাবত স্বেচ্ছাচারী। আমরা যদি এই প্রস্তাবটা সাজেস্ট করি তাহলে ও রিভোল্ট করবে। অথচ আমার মনে হয় সে নিজেই একদিন তুলবে কথাটা। উই মাস্ট ওয়েট!

কৃশানু কুণ্ঠিত হয়ে বলে, কিন্তু আমি ভাবছিলাম—

বাধা দিয়ে ভবতারণবাবু বলেন, জানি। তোমাদের স্বভাবে আসমান-জমিন ফারাক। কিন্তু কি জানি কৃশানু, মানুষকে অত সহজে চেনা যায় না। আমি বলছি তোমাকে—সাপের খোলসের মতই আইভির এই চটুলতা একেবারে বাইরের জিনিস। সংসারে ঢুকে ওর পক্ষে সে খোলস ত্যাগ করা মোটেই অসম্ভব হবে না।

কৃশানু মনে মনে হাসে। ভাবতাবণবাবুর উপমাটা সার্থক। উপমান আর উপমেয়ের যতদূর সাযুজ্য টেনেছেন ভাবতারণ তার চেয়েও বেশী সার্থক। চটুলতা হয়তো নির্মোকেব মতই একদিন ঝেড়ে ফেলবে আইভি সংসারে প্রবেশ করে, কিন্তু খোলস ছেড়ে যে বেরিয়ে আসে সে তো কালনাগিনী!

কৃশানু শুধু বলে, আমি ভেবে দেখেছি, আমার পক্ষে ওটা সম্ভব নয়।

জবাব দেননি ভবতারণ।

মেসে ফিরে এসে কৃশানু দেখে তার চিঠির জবাব এসেছে। স্বাহা লিখছে, ‘পূজার ছুটি তো এসে গেল। এবার পাটনায় আসবে ছুটিতে? আমাদের কলেজও বন্ধ হবে আর দিন কুড়ির মধ্যেই। টুকলির বিয়েটা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। হয়তো পূজার আগেই হয়ে যাবে বিয়ে। হলে কলকাতাতেই হবে।

তাহলে আমিই অবশ্য আগে যাব কলকাতায়, সেখানেই দেখা হবে দুজনের। যদি না হয় তাহলে আমি আর কলকাতায় যাব না। তখন তোমাকেই এখানে আসতে হবে কিন্তু। এখানে বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই। তোমাকে এখানকার সব কিছু দেখিয়ে দেব যত্ন করে। মিউজিয়াম, সেক্রেটারিয়েট, গোলঘর, গান্ধী ময়দান, শহীদ বেদী, সুযোগ হলে রাজগীর, নালন্দাও। এতগুলো দেখবার জিনিস থাকতেও লোভ হচ্ছে না তোমার?

আমার কিন্তু হচ্ছে। আমি অবশ্য একটি জিনিসই দেখতে চাই এই সুযোগে।

সত্যি কৃশানু, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই তোমার কথা ভেবে। এতদিনেও তুমি ঘুণাক্ষরে জানতে চাওনি আমি কালো না ফরসা, দীর্ঘাঙ্গী না খর্বকায়া। তোমার কৌতূহল হয়নি জানতে, আমি ডীপ রঙের শাড়ি পরতে ভালবাসি, না হালকা রঙের। চোখে আমার চশমা আছে অথবা নেই। হয়তো আমার চেহারার সম্বন্ধে তোমার কোনও আগ্রহ নেই, কৌতূহলের অভাব। আমার কিন্তু ও বিষয়ে ভীষণ ঔৎসুক্য। আমার ধারণা, তুমি বেশ লম্বা; শার্ট-প্যান্টের চেয়ে ধুতি-পাঞ্জাবিতেই তোমাকে ভাল মানায়, যদিও তুমি সাহেবি পোশাকটাই পছন্দ কর। চুলগুলো তোমার পিছনে ফিরানো, সিঁথি আছে কি নেই। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। গোঁফ তুমি রাখ না (গুঁফো-মানুষ আমি কিন্তু দু'চক্ষে দেখতে পারি না। তার মানে এ নয় যে পাটনা আসার আগে তোমার গোঁফ কামিয়ে আসতে হবে)।

অনেক আজেবাজে কথা লিখছি, তাই নয়? কিন্তু সত্যি আজ যেন কেমন করে মনের বাঁধন ছুটে গেছে। বৃষ্টি-বাদল থেমে গেছে এ পাড়ায়। মেঘলা ভাঙা আশ্বিনের মিঠে মিঠে রোদ উঠেছে এখানে। মন-কেমনের একটা উসুখুসু হাওয়া বইছে সকাল থেকে। সত্যি, ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে তোমাকে। আসবে তুমি পাটনায় কদিনের জন্যে? নেহাৎ যদি না আসতে পার কোন কারণে তাহলে একখানা ফটো পাঠিও। আমিও তোমার জন্যে একটা সারপ্রাইজ তৈরি করেছি। কাল এখানকার একটা স্টুডিওতে নিজের একখানা ফটো তুলেছি। দু'একদিনের মধ্যেই পাব ফটোটা। আমার বিশ্বাস, হয়তো আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহলও সমান—যা লাজুক তুমি, তাই হয়তো জিজ্ঞাসা কর না কিছু। সত্যি নয়? ফটোখানা হাতে পেলেই বুঝতে পারবে তোমার মানসীর সঙ্গে তার কতদূর মিল, মানে অমিল!

বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথায় আসা যাক। তোমার চিঠিতে তুমি লিখেছ যে মাঝে মাঝে তুমি একটা ভিশান দেখতে পাও। জিনিসটা খুলে লেখনি তুমি। আমার ভীষণ কৌতূহল হয়েছে ঐ বিষয়ে। ব্যাপারটা কি? দৃষ্টিবিভ্রম হলে কী দেখতে পাও তুমি? তুমি লিখেছ দৃষ্টিবিভ্রমের মুহূর্তে কি দেখি সে কথা কাউকে বলা যায় না, বান্ধবীকে তো নয়ই। আমি তা বিশ্বাস করি না। আমাকেও বলা যায় না? চাক্ষুষ সম্পর্ক তো তোমার সঙ্গে নেই আমার। তাহলে আর আমার কাছে চক্ষুলজ্জা কিসের? আমার মনে হয় কোন একজনের কাছে কথাটা খুলে বলতে পারলে হয়তো তোমার ও রোগ সেরে যাবে। মনের গোপন কথা অনেক সময়ে মন খুলে প্রকাশ করতে পারলে মনটা হাল্‌কা হয়, মনের অসুখ সেরে যায়। তুমি আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করেছ; বস্তুত আমাদের সম্পর্কটা এখন 'বন্ধুত্বের' চেয়েও মধুরতর কোন শব্দের দ্বারা সূচিত করার সময় এসেছে। তাই আমি আন্তরিকভাবে আশা করব যে উত্তরে তুমি অকপটে জানাবে সব কথা। হয়তো সেক্ষেত্রে তুমি কয়েকটা সর্ত আরোপ করতে চাইবে। প্রথম কথা এর গোপনীয়তা, অর্থাৎ এ কথা আমি দ্বিতীয় কাউকে বলতে পারব না। সে সর্ত মেনে নিলাম। হয়তো আরও কঠিন (সত্যিই তোমার তরফে কঠিন নাকি? আমার তরফে তো নয়) কোন সর্ত আরোপ করতে চাইবে। জেনো, আমি সে সত্ত্বেও রাজি। (এমন কি তোমার গোঁফ থাকলেও!)। একটু রোমান্টিক হয়ে গেল, নয়? অনেকটা সেই 'গোড়ায় গলদে'র বিনোদবিহারীবাবুর মত। রোমান্টিক হলেও আমি শ্রদ্ধা করি ভদ্রলোকের দুঃসাহসকে। আমিও বলি: এস কৃশানু, রাখ জীবনটা বাজী, তারপর হয় রাজা, নয় ফকির!

আবার পাগলের মত বাজে বকতে শুরু করেছি। মনটার যে আজ কী হয়েছে! মাঝে মাঝে কেন এমন হয় বল তো? আজ ইচ্ছে হচ্ছে আমার সব কথা তোমাকে ডেকে শোনাই, রেখে-ঢেকে নয়—একেবারে মন উজাড় করে।

এখানেই শেষ করছি। একটা কথা। পূজার ছুটিতে যদি না আস, ফটো যদি না পাঠাও, ভাল যদি না বাস—তাহলে নিশ্চয় রাগ করব, ঝগড়া করব, হয়তো বন্ধ করব পত্রালাপ; তবু তার আপোস হবে একদিন। কিন্তু উত্তরে যদি 'দৃষ্টিবিভ্রম' জিনিসটাকে না পরিষ্কার কর তাহলে সত্যিই আড়ি করে দেব চিরদিনের মত। আমার মনের অবস্থাটা তোমার পক্ষে

কল্পনা করা শক্ত নয়। তোমার নিজেরও একদিন ঐ রকম দশা হয়েছিল। তাই তোমার ভাষাতেই বলছি, মনোবিকলনের মুহূর্তে তুমি যাকে দেখতে পাও তার পূর্ণ পরিচয় যদি এবার না জানাও, তাহলে এর পর থেকে ফুলেশ্বরী অন্য লিপিকারের কাছে যাবে চিঠি লেখাতে।

এতদিন প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে এসেছি পত্রশেষে। কিন্তু আজ এমন মিঠে মিঠে মন-কেমনের হাওয়া বইছে যে ও-কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। নতুন কথা বলব যে তার ভরসা তুমি দিচ্ছ কই? দেবে?'

চিঠিখানা পড়ে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়ে কৃশানু। এর আগের কোন চিঠিতে এত প্রগল্‌ভতা কখনও করেনি স্বাহা। কী হল ওর? স্বাহা কিছু স্কুলের কিশোরী মেয়ে নয়, যে পরিণাম না বুঝে লুকিয়ে লেখার আনন্দেই প্রেমপত্র লিখবে। ভাল না বেসেই ভালবাসার ভান করবে আর গালভরা প্রতিশ্রুতির মালা গাঁথবে। তাব যথেষ্ট বয়স হয়েছে। মেডিকেল কলেজের ছাত্রী সে। তাহলে এ প্রগল্‌ভতার অর্থ কি? স্বাহা যে ইঙ্গিত করেছে চিঠিতে সে বিষয়ে সে কি সত্যি সিরিয়স? একটা মানুষকে না দেখে, না জেনে এমন চিঠি কেউ লিখতে পারে? পাশের বাড়ির মেয়ের গান শুনে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল বিনোদবিহারী—না দেখেই। ওসব নাটকে চলে, বাস্তবে নয়। স্বাহা তো আজও কিছু জানে না। যাকে সে এই চিঠি লিখেছে সে লোকটা কানা হতে পারে, খোঁড়া হতে পারে, দুরারোগ্য বংশানুক্রমিক রোগে ভুগতে পারে সে! সেন্টিমেণ্ট কি এতদূর নিয়ে যেতে পারে একটি পরিণতমনা নারীকে?

কিন্তু কৃশানু তো পাগল নয় তাই বলে। তার ধারণা, স্বাভাবিক মানুষের মত দাম্পত্যজীবন তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তার মন বিকৃত। এই অসুস্থ মন নিয়ে সে কোন্ অধিকারে গ্রহণ কববে স্বাহার মত অবস্থাপন্ন ঘরের একটি শিক্ষিতা মহিলাকে তার সেন্টিমেন্টালিটির সুযোগ নিয়ে? এতটা অমানুষ নয় কৃশানু। তা ছাডা তাব মনে এখনও সন্দেহ আছে, সে কি সত্যিই এই মেয়েটিকে ভালবাসে? নিঃসন্দেহে ঐ অদেখা মেয়েটিকে ঘিরেই সে স্বপ্ন দেখেছে এতদিন। আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন, আর পাঁচজন মানুষের মত স্বাভাবিক হবার স্বপ্ন। হয়তো এই মেয়েটিই পারত ওকে আবার স্বাভাবিক করে তুলতে। হয়তো এর কাছে মনের সব কথা উজাড় করে দিলে সে স্বস্তি পাবে, শান্তি পাবে। কিন্তু তারপর আর

সম্ভব নয় সেই মেয়েটিকেই গ্রহণ করা। ওর দৃঢ় ধারণা মেডিকেল কলেজের যে ছাত্রীটি স্বাহা মিত্রের রোল-নম্বরে উঠে সাড়া দেয় তাকে ও ভালবাসেনি। ও ভালবেসেছে ঐ নামের মাধ্যমে পাওয়া একটা মনগড়া মেয়েকে। সে মেয়ে বাস্তবে কোথাও নেই, সে ওর মানসী! সেই মানসী প্রতিমার সঙ্গে বাস্তব স্বাহা মিত্রের আসমান-জমিন ফারাক! সেই মনগড়া মানসী প্রতিমার প্রেমেই আকণ্ঠ ডুবে আছে কৃশানু। তাকে সে তিল তিল করে নিজে সৃষ্টি করেছে। ধূপছায়া রঙের শাড়ি পরে সেই মেয়েটি বাদলা-দিনের অপরাহ্ণে ক্ষণিক রৌদ্রে ছাদে উঠে চুল শুকায়, খয়েরের টিপ এঁকে যে বৈকালিক প্রসাধনের শেষ টাচ দেয়। কৃশানুর দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাহা মিত্রকে চাক্ষুস দেখলেই খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে ওর মনের রঙে রাঙানো সেই মানসীর প্রতিমাখানি। সে দুর্ঘটনাকে প্রাণপণ শক্তিতে রোধ করবে কৃশানু।

জবাবে তাই সে লিখল—'তোমার সুরে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে পারতাম, স্বাহা, রাখ জীবনটা বাজী—তারপর হয রাজা, নয় ফকির। কিন্তু তা বলবার আমার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা নেই নয়, সম্মতি নেই, অধিকার নেই। রাজা হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে সেই-ই বাজী ধরতে পারে ফকির হবার মত মূলধন যার আছে। কিন্তু এখনই যে ফকির সে বাজী ধরবার মূলধন পাবে কোথায়?

তাই তোমার লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলাম না। জেনে-শুনে তোমাকে আমি ঠকাতে পারব না তোমার সরলতার সুযোগ নিয়ে। তুমি আমার সম্বন্ধে কোন কিছু না জেনে কি করে এমন কথা লিখতে পারলে ভেবে অবাক হই। তোমার দুঃসাহসের প্রশংসা করি।

স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনের ভাগীদার হওয়ার অধিকার আমার নেই। কেন নেই সে কথা তোমাকে বলব। তোমাকেই শুধু বলব। একটি সর্তে। তুমি বলেছ যে কোন সর্তে তুমি আমার জীবনের সে গোপনতম সংবাদ শুনতে চাও। তোমার সে ইচ্ছা অপূর্ণ রাখব না। সর্তটাও পত্র-শেষে জানালাম।

যে দৃষ্টিবিভ্রমের কথা তোমাকে আমি লিখেছিলাম সেটা প্রথম কবে হয়েছিল তা আজ আর মনে নেই। কখন তা হবে, কেনই বা হয় এবং কেন কখনও কখনও হয় না তাও আমি জানি না। কোন স্ত্রীলোকের, বিশেষ বয়সের স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করতে করতে হঠাৎ আমার মনে হয় যেন তার

কোন বহিরাবরণ নেই। হঠাৎ তার নিরাবরণ দেহটি আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তখন আমার শরীর মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। আমার বাহ্যিক পবিবর্তন কি হয় তা অবশ্য আমি জানি না, কারণ এ পর্যন্ত কেউ সে কথা আমাকে বলেনি; তবে আমার চেহারায় নিশ্চয় কোন পরিবর্তন আসে। কারণ, লক্ষ্য করেছি, আমার চোখের সামনের সে মূর্তিটি তখন বিহ্বল হয়ে পড়ে। হয় কেঁদে ফেলে, নয় ছুটে পালিয়ে যায়—একবার একজন আমাকে চড় মেরেছিল!

এই অদ্ভুত রোগের জন্য আমি কোন মেয়ের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারি না। এই জন্যে তোমার বোন টুকুলির সঙ্গে আলাপ করতে যেতে পারিনি। আমাদের ক্লাশে যে কটি মেয়ে পড়ে, তাদের আমি কদিন আগেও চিনতাম না। চোখ তুলে দেখিনি কখনও। আলাপ করা তো দূরের কথা। শুধু বাস্তবে নয়, অনেক সময় যখন মনে মনেও আমি বিশেষ বয়সের কোন মেয়ের কথা ভাবি তখন আমার মানসনেত্রে অনুরূপ চিত্র ফুটে উঠতে দেখেছি।

তুমিই একমাত্র ব্যতিক্রম। তোমাকে আমি নিত্য ধ্যান করি। যে তুমি আমার অতি-পরিচিত, সে তুমি কেমন জান? সে-তোমার পরনে ধূপছায়া রঙের ঢাকাই শাড়ি, পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুরের টিপ। সে-তোমার গায়ে ভোরবেলাকার ঠাণ্ডা হাওয়ার মৃদু গন্ধ, সে-তোমার প্রতি পদক্ষেপ মাটি না-ছোঁওয়া; সে-তুমি পাখীর পালকের মত হালকা, নির্মল নদীর মত নিষ্কলুষ!

তোমার সেই মানসী মূর্তি আমি নিজে হাতে গড়েছি। সে আমার গ্যালাটিয়া···। আমি কোন মতেই সহ্য করব না আমার সেই মানসী প্রতিমার গায়ে একটি আঘাতের চিহ্ন। তাই কোনদিন জানতে চাইনি তুমি দীর্ঘাঙ্গী না খর্বকায়া, তুমি শ্যামা না শুভ্রা, তুমি গাঢ় রঙের শাড়ি ভালবাস না হাল্‌কা রঙের। যা ইচ্ছা পর তুমি, শুধু টেনে খুলে ফেল না আমার মানসীর ধূপছায়া রঙের শাড়িখানি।

তাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তোমার ফটোখানি তুমি আমাকে পাঠিও না। আমার ফটোও আমি তোমাকে পাঠাব না। যদি এই বিপুলা পৃথিবীর কোন প্রান্তে দৈবাৎ দেখা হয় তোমাতে আমাতে, তাহলে আমাকে যেন তোমার মনে হয় ও একজন মানুষ। না হলে, তুমি পারবে না আত্মসংবরণ

করতে, হঠাৎ পরিচয় দিয়ে বসবে আর সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে আমার স্বপ্ন।

আমার সব কথাই তোমাকে জানালাম। সাধারণ মানুষের জীবন আমার কাছে অলভ্য। একজন সাধারণ মানুষ যা চায়, যা পেয়ে খুশী হয়, হয়তো তা তৃপ্তি দিতে পারবে না আমাকে—কে জানে? কোন নারীর দেহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে হয়তো নিঃশ্বাস গাঢতর হবে না। আমার শুষ্ক ওষ্ঠাধরে পাবে না সেই নারী মোহ-মদিরার কোন স্পর্শ এ অনুমান করার সপক্ষে যুক্তি আছে। লক্ষ্য করেছি ক্লাশের আর পাঁচটা ছেলে চায় মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে, গল্প করতে, অন্তরঙ্গ হতে। আর আমি অনবরত সুযোগ খুঁজি কি করে ওদের এড়িয়ে যাওয়া যায়। মনে আছে, একদিন দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংসে উপরে ওঠবার সময় সিঁড়ির দিকে না গিয়ে লিফটের দিকে গিয়েছি। শরীরটা ভাল ছিল না, জ্বর নিয়েই ক্লাশে গিয়েছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য হল লিফ্‌টে একটি মহিলা আর লিফ্‌টম্যান ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি নেই। সিঁড়ির দিকে ফেরবার জন্য পা বাড়াতেই মেয়েটি বললে, 'কি হল মিস্টার রায়, ক্লাসে যাবেন তো? আসুন।' বুঝলাম আমাদের ক্লাসেরই কোন মেয়ে। ও আমাকে চেনে, আমি ওকে চিনি না। শুনতে না পাওয়ার ভান করে ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম ও কি ভাবল?

তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে স্বাহা, আমি সিনেমা দেখিনি গত দশ বারো বছর। গল্প উপন্যাস অবশ্য পড়ি -না পড়লে পাস করতে পারব না, তবে প্রেমের দৃশ্য, মিলনের দৃশ্য, বিশেষ করে নারীর রূপবর্ণনার পৃষ্ঠাগুলো অন্যমনস্কের মত উলটে যাই।

এমন অসম্পূর্ণ অসুস্থ মানুষ নিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না। তোমাকে এত কথা লিখলাম, কারণ তুমি সব কথা খুলে লিখতে বলেছিলে। বিনিময়ে আমার একটি মাত্র সর্ত, তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়িও না কখনও। এই লিপি-বন্ধুত্বই হবে আমাদের ভালবাসার শেষ দিগন্ত।

পারলে ক্ষমা কর আমাকে। আর নেহাৎ অসম্ভব না হলে দু ফোঁটা চোখের জল ফেল বিধাতার এই বিচিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ভবতরণবাবুর বাড়িতে যেতেই ইলা চুপি চুপি এসে বললে, বড়দি আজ এসেছে, মেজদিকে আজ দেখতে আসবে মাস্টারমশাই।

দেখতে আসবে! সংবাদটা চমকপ্রদ বইকি! ঘোষাল সাহেব রীতিমত অতি-আধুনিক সাহেব। সর্ববিষয়েই পশ্চিমখণ্ডের জীবনযাত্রার সুরে তিনি বেঁধেছেন তাঁর জীবনকে। চলনে বলনে সাজে পোশাকে তিনি ইঙ্গবঙ্গ সমাজের লোক। সুতরাং তিনি যে কন্যার বিবাহে এই প্রাচীন প্রথার মাধ্যমে অগ্রসর হবেন এটা কৃশানু স্বপ্নেও ভাবেনি। স্বাভাবিক হত, তার মতে, যদি নিত্য কতকগুলি স্যুটার আসত বাড়িতে। তাদের মধ্যে কারও সঙ্গে হত আইভির প্রণয়, কোর্টসীপ এবং পরে বিবাহ। ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার যে বিলাতি প্রবাদটা আছে—প্রণয়ের আগে বিবাহও তেমনি একটা অসম্ভব ব্যাপার নাকি ওঁদের মতে। পাণিপ্রার্থী অবশ্য কয়েকজন আসে মাঝে মাঝে। কৃশানু লক্ষ্য করেছে, আইভি দার্জিলিং থেকে আসার পর তাদের যাতায়াতটা অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন হয়েছে। ওদের মধ্যে আছে সদ্য-ফেরা ব্যারিস্টার, বিলাতী ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনিয়ার, ভূতপূর্ব রায়বাহাদুর রায়সাহেবদের অভূতপূর্ব নিষ্কর্মা সুপাত্র। এতদিন তারা আসত যেত মাঝে মাঝে, বলা উচিত কালে-কস্মিনে। দোষ দেওয়া যায় না তাদেব, ইলুকে লক্ষ্যস্থল করলে বছর দশেক পরে আসতে হয়। ইভাকে করলে আসা উচিত ছিল অনেক আগে। অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে যিনি বর্তমান, তিনি এ বাড়িতে সব সময়েই অবর্তমান, থাকেন দার্জিলিঙে। ফলে সশরীরে হানা দেওযার চেয়ে পাত্ররা পত্রযোগে যোগাযোগ-সূত্রটা জিইযে রাখতেন। এর ভিতর একমাত্র জয়ন্ত শীল ছিল অতি উৎসাহী। ইলুকে টফি আর ভবতারণকে দুষ্প্রাপ্য পুরাতন বই এনে দিত সে। আইভি না থাকলেও ঘুরঘুর করত ভবতারণের বাড়িতে। বেচারী প্রেমের সেই পর্যাযে পৌঁছেছে যেখানে প্রেয়সীর অবর্তমানে তার ব্যবহৃত চেয়ার টেবিল, তার পড়াব বই, তার মাথার চিরুণীর স্পর্শেও মূর্খ প্রেমিক সুখের সন্ধান পায়।

সে যাই হোক, আপাতত ইলুর কাছে প্রাপ্ত লেটেস্ট বুলেটিন হচ্ছে মেজ-দিকে দেখতে আসবে। সুতরাং ইলুকে আজ বেশীক্ষণ আটকে রাখা চলে না।

আসলে তার সকাল সকাল ফিরে যাবার আরও একটি কারণ ছিল। ইলুর খবরের সঙ্গে আরও একটুকরা সংবাদ ছিল—বড়দি আজ এসেছে! কৃশানু ইলুকে নিয়ে পডতে বসার অল্প পরেই এল তার জলখাবার কেষ্টবেরায়ার হাতে। আর তৎক্ষণাৎ কৃশানুর মনে হল মেজদিকে যখন দেখতে আসবে তখন ইলুকে আজ বেশীক্ষণ আটকে রাখা উচিত নয়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় অকারণেই ওর দৃষ্টি উঠে যায় দ্বিতলের ক্যান্টিলিভার বারান্দাটায়, দ্বিতলের জানলায়, ত্রিতলের ছাদে। নেই, কেউ নেই সেখানে।

ইভা কিন্তু এসেছে। ওর ছোট বোনকে আজ দেখতে আসবে। ওদের মা নেই, সুতরাং ইভার দায়িত্ব আছে বইকি। জীবনানন্দবাবুর জীবনের আশা দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। সুকান্তর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। ভবতারণবাবুকে সে কথা বলেছে ইভা—সন্ধানের ব্যবস্থা তিনি করছেন। ইভাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা ভবতারণই করেছেন। তিনি জানতেন ইভা ছাড়া এ কাজ হবে না।

কানপুর থেকে কোন চৌধুরী মশাই তাকে দেখতে আসছেন শুনে একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিল আইভি। বলেছিল: আয়াম নো কমডিটি, দেখতে আসবে মানে?

ইভাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। সে জানে কিভাবে আইভিকে শান্ত করতে হয়। মা-হারা এই বোনটিকে সে ভালভাবেই চেনে—যদিও বয়সে সে এমন কিছু বড় নয়। বেশ তো, ওখানে যদি বিয়ে না করতে চায়, নাই করবে আইভি, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো এটা হতে পারে না। কিন্তু বাপি যখন এ ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করেছেন তখন তো তাঁদের সামনে যেতেই হবে আইভিকে। না হলে বাপির অপমান।

আইভি রেগে বলেছিল, হোক অপমান, আই কেয়ার এ ফিগ'

কথাটা রূঢ়! অত্যন্ত রূঢ়। বাপের অপমানের আশঙ্কায় অন্য কোন মেয়ে এমন তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে না। করলে বিস্মিত হবার কথা শ্রোতার। ইভা কিন্তু একটুও অবাক হয় না। হয় না, তার কারণ ইভা জানে পূর্ব-ইতিহাসটা।

সরমা যখন মারা যান ইভা তখন কিশোরী, ইলা শিশু আর আইভি বালিকা, কিন্তু বয়স অনুপাতে আইভি বুঝতে শিখেছিল অনেক কিছুই। মায়ের তিল তিল করে মৃত্যুবরণের আসল কারণটা শুধু ইভাই যে বুঝতে পেরেছিল তাই নয়, বুঝেছিল আইভিও। সরমা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে। শুধু রূপের কৌলিন্যেই ঘোষাল-পরিবারে আজীবন থেকে যাবার ভিসা দেওয়া হয় তাঁকে এ তরফ থেকে। নিষ্ঠাবান প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ-পরিবার থেকে এলেও সরমা নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন

এ পরিবারের নতুন পরিবেশের সঙ্গে। সংস্কারের সঙ্গে মনে মনে লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল তাঁর অন্তরদেশ। সে-কথা বাইরের কেউ জানত না। এমন কি ভবতারণের সন্ধানী গোয়েন্দা চোখকেও মাঝে মাঝে ফাঁকি দিতেন তিনি। পর্ক ধরতে না পারলেও ফর্ক ধরতে শিখেছিলেন ; যদিও লক্ষ্মী পূজাটা ছাড়েননি—তবু পক্ষীবিশেষের অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছেন আহারের টেবিলে, শেরী ধরতে না পারলেও পার্টিতে যাবার কায়দায় শাড়ি পরতে শিখেছিলেন। এত করেও কিন্তু সরমা নাগাল পেলেন না ভবতারণের। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ করে ক্রমে তলিয়ে যেতে শুরু করলেন ঘোষাল সাহেব। সরমা তখন যৌবনের মধ্যগগন অতিক্রম করেছেন। সে উদ্যম তখন আর তাঁর নেই। সব ছেড়েছুড়ে অবরুদ্ধ করলেন নিজেকে পুজোর ঘরের চতুঃসীমায়। তাঁর সে দুরন্ত অভিমানকে দ্রব করতে এগিয়ে এলেন না ঘোষাল—স্রোতের জলে ভেসেই চললেন সরমা কূল থেকে দূরে আরও দূরে।

ইভা বাপিকে ক্ষমা করেছিল—তার ধারণা ভবতারণের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যাওয়া ছিল তাঁব সাধ্যাতীত। প্রবৃত্তির কাছে মানুষ যে কতদূব অসহায় তা বুঝতে শিখেছিল ইভা সেই কিশোরী বয়স থেকেই। বোধ করি জীবনের সেই প্রথম পাঠই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে পরিণত জীবনে বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর বিমুখতাকে সহ্য করতে, তাই উপেক্ষিতা মেয়েটি আজও পুডিং তৈরী করতে ভোলে না।

আইভি কিন্তু ক্ষমা করতে পারেনি তার বাপকে। তিল তিল করে বদলে গেল আইভি বয়ঃসন্ধীর কাল থেকেই। উদগ্র হয়ে উঠল সে মাথা চাড়া দিয়ে। বাপিকে আঘাত করবার জন্য সুযোগ খুঁজত যেন। উচ্ছৃঙ্খলতায়, ঔদ্ধত্যে সে ছাড়িয়ে উঠতে চাইল বাপেব যৌবনকালেব রেকর্ড! তার আচরণে ভবতারণ আহত হচ্ছেন বুঝতে পারলে খুশী হত আইভি—যেন দেখিয়ে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি করত। মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে যেন সে!

ভবতারণবাবু সব দেখতেন, শুনতেন, কিন্তু চুপ করেই থাকতেন তিনি—সাহস করে শাসন করতেন না মধ্যমা কন্যাকে। ইভা জানে আইভিকে তিনি মনে মনে ভয় পান। যেন কণ্টকিত হয়ে থাকেন, কখন আইভি বলে বসে—এ তো তোমারই শিক্ষা বাবা!

বাপকে সহ্য করতে না পারলেও দিদিকে ভীষণ ভালবাসত সে। ইভাকে অবশ্য দিদি বলে ডাকে না আইভি। নাম ধরেই ডাকে ; বান্ধবীর মত ব্যবহার করে। কিন্তু দিদির জন্য পারে না এমন কোন কাজ নেই তার।

শেষ পর্যন্ত দিদির অনুরোধে আইভি রাজী হল দেখনেওয়ালাদের সামনে দেখা দিতে। গেল সে, কিন্তু উদ্ধত বিদ্রোহীব মতই।

সন্ধ্যাবেলা এলেন ভদ্রলোকেরা। চৌধুরী সাহেব বৃদ্ধ মানুষ। কানপুরে মস্ত ট্যানারীব কারবার। বিলাত-ফেরত বিলাতী কেতার মানুষ। শোনা যায় তিনি নাকি ঘোষাল সাহেবেব চেযেও উগ্র পর্যায়ের সাহেব। এসেছেন কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবী পরে। সিল্কেব চাদর কাঁধে। হাতীর দাঁতের ছড়ি হাতে, হরিণের চামড়ার চটি পাযে। অগাধ সম্পত্তির মালিক। ছেলেটিকে বিলাতেই লেখাপড়া শিখিয়েছেন স্কুলপর্যায় থেকে। একটি সুন্দরী শিক্ষিতা আধুনিকা পাত্রী খুঁজছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এসেছে অল্পবযসী একটি ছেলে। স্যুটেডবুটেড। বরের বন্ধু।

ওঁদের দুজনকে ভবতারণ নিয়ে এসে বসালেন দ্বিতলের বড় ঘরে। অল্প পরে ইলুর হাত ধরে আইভি এসে বসল ঘবে। নিজে প্রসাধন করেনি, তা দেখলেই বোঝা যায়, কারণ সাজটা উগ্র হয়ে ওঠেনি মোটেই। ইভার নির্দেশমত বৃদ্ধকে সে প্রণাম করল, হাত তুলে নমস্কাব করল পাত্রের বন্ধুকে। পর্দার আড়ালে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইভা—যাক, তাহলে বিসদৃশ কিছু করবে না আইভি। পর্দাব এ পাশে আসায় কোন বাধা ছিল না, বস্তুতঃ আসবেই ভেবেছিল ইভা, কিন্তু চৌধুরী সাহেব হঠাৎ চৌধুবীমশাই সেজে মেয়ে দেখতে আসায় সে অন্তরালবর্তিনী হযে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করল।

চৌধুবী মশাই প্রশ্ন করেন, নামটা কি মা তোমার ?

এ অবধারিত প্রশ্নটা হবে জানা ছিল। ইভা বলেছিল, নাম জিজ্ঞাসা করলে বলবি শ্রীমতী আইভি ঘোষাল।

আইভি বলেছিল, কেন ? মিছে কথা বলব কেন ? 'শ্রী' আমার ত্রিসীমানায় নেই, চিরকাল যা বলোছ, তাই বলব—মিস আইভি ঘোষাল।

ইভা ওকে ছদ্ম তাড়না করে বলেছিল, দূর পাগলি। তা বলে না।

সে কথাগুলি মনে পড়ল আইভির। বলল, আমাব নাম আইভি।

বৃদ্ধ একটু হেসে বলেন, আইভি ? আইভি মানে কি মা ?

আড়াল থেকে ইভা বুঝতে পারে মর্মান্তিক চটেছে আইভি এই অপ্রাসঙ্গিক অসঙ্গত প্রশ্নে। বৃদ্ধকে আইভি আপাদমস্তক দেখে নেয় একবার, রিংয়ে

নামবার আগে যেমন করে তাকিয়ে দেখে যোদ্ধা তার প্রতিপক্ষকে। তবু বিচলিত না হয়ে বলে, আইভি হচ্ছে এক রকমের ক্রিপার, Ficus pumila !

বৃদ্ধ তাঁর টাকের ওপর হাত বুলিয়ে বলেন, ইংরাজিটা আবার আমি ভাল বুঝি না মা, যা বলার তুমি বাংলায় বল, কেমন ?

আইভি জানতো ভদ্রলোক বার তিনেক ইয়োরোপ আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। সে কোন জবাব দেয় না। জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

গান গাইতে জান ?

না। আইভি চোখে চোখ রেখে বলল।

নাচতে ?

না। স্বর চড়েছে এক পর্দা।

বৃদ্ধ একটিপ নস্য নেন। আইভি বলে, বাই দ্য ওয়ে, আপনার ছেলে নাচতে জানে ?

ভবতারণ সচকিত হয়ে ওঠেন। বরের বন্ধু রুমাল দিয়ে মুখটা মোছে। ইলু পর্যন্ত সাদা হয়ে যায়। চৌধুরী সাহেব, অর্থাৎ বর্তমানে চৌধুরী মশাই কিন্তু বিরক্ত হলেন না, হেসে বলেন, জানে। তোমার এক নম্বর হার হল।

আইভি নড়েচড়ে বসে।

আমার ছেলে খুব ভাল টেনিস খেলতেও জানে। কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটিকে রিপ্রেজেন্ট করেছে।

মানে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে বলতে চান ?

বৃদ্ধ হেসে বলেন, ঠিক তাই। তুমি টেনিস খেলতে জান ?

জানি।

রাঁধতে ?

সামান্য।

চৌধুরী বলেন, এর হাতের লেখাটা একটু দেখতে চাই, একটু কাগজ কলম দেবেন তো ঘোষাল মশাই।

এবার ভবতারণও বিরক্ত হয়ে ওঠেন। চৌধুরী সাহেব সম্বন্ধে তিনি কি ভুল সংবাদ পেয়েছিলেন না কি ? শুনেছিলেন তিনি আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত লোক। কিন্তু এ কী ধরণের পরীক্ষা। মনে মনে কণ্টকিতও হয়ে ওঠেন। আত্মজাকে চিনতে তো বাকি নেই তাঁর। ইলু এনে দেয় কাগজ কলম। চৌধুরী বলেন—রবীন্দ্রনাথ থেকে যে কোন একটি পংক্তি লেখ তো মা।

আইভি লক্ষ্য করল, লাইন না বলে এবার সাবধানে পংক্তি বলেছেন তিনি। একটা আণ্ডারকাট সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন চৌধুরী। বিনা-বাক্যব্যয়ে খস্‌খস্ করে কি যেন লিখে কাগজটা ফেরত দেয় চৌধুরীর হাতে। চৌধুরী কাগজটা নিয়ে দেখেন। স্মিত হাসি ফুটে ওঠে ওঁর ওষ্ঠপ্রান্তে। কাগজখানা তিনি বাড়িয়ে ধরেন ভবতারণের দিকে; বলেন সুন্দর হাতের লেখা।

ভবতারণ দেখেন কাগজে লেখা আছে সংক্ষেপে বলতে গেলে হিংটিংছট!

মুখটা লাল হয়ে উঠল তাঁর। বুঝলেন এ অধ্যায়ের এখানেই যবনিকা। ছাব্বিশ খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে থেকে মুহূর্তমধ্যে এমন একটি মোক্ষম লাইন যে খুঁজে নিয়ে তুলে ধরতে পারে বাপের বয়সী ভদ্রলোকের হাতে, তার নির্বাচন ফলাফল জানতে আর বাকি কি? ভবতারণ আশা করেন, আর কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন হবে না নিশ্চয় চৌধুরী মশায়ের। কিন্তু তাঁর আশা নির্মূল করে বৃদ্ধ মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করেন, মনে কর আমার ঘরে তুমি এসেছ। এখন একদিন আমার বাড়িতে, মানে তোমার বাড়িতে একজন অতিথি এসেছেন। ঘরে শুধু চাল ডাল আর তেল নুন আছে। তুমি কি ভাবে অতিথি-সৎকার করবে?

যেন স্থানটা হাজরা রোড নয় মুচকুন্দপুর গ্রাম, আর সময়টা উনবিংশ-শতাব্দীর শেষ পাদ। আইভি মর্মভেদী দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষকে একবার দেখে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললে, চাকরকে হোটেলে পাঠাব।

চৌধুরী হেসে বলেন, ধর, চাকর নেই।

তাহলে আপনার ছেলেকে বাজারে পাঠাব।

ধরা যাক্ ছেলেও বাড়ি নেই।

তখন আপনাকেই বলব।

আমাকে? হা-হা করে হাসেন চৌধুরী মশাই। বলেন, বেশ তুমি যেন আমাকে বললে বাজারে যেতে; কিন্তু ধর আমি জবাবে বললাম, আমি যে কপর্দকহীন মা, আমার কাছে তো একটি পয়সা নেই। আমি একেবারে দেউলে হয়ে গেছি।

আইভি হাসল। প্রতিপক্ষের ছিদ্র এতক্ষণে নজরে পড়েছে তার। এবার নিশ্চিত নক-আউট। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে, আমি তখন চালে-ডালে মিশিয়ে খিচুড়ি রাঁধব। ডাল বেটে বড়া ভেজে অতিথিকে খেতে দেব।

একগাল হেসে বৃদ্ধ বলেন, পাস্‌ড উইথ ডিস্টিংশন!

অর্থাৎ সসম্মানে পাস করেছি?

করেছ। এখন তুমি যেতে পার।

ইলু উঠে দাঁড়ায়। হাত ধরে আকর্ষণ করে আইভির। সে ওঠে না। বলে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই আপনার?

চৌধুরী বলেন, না মা, নেই। তুমি ভিতরে যাও।

এবার তা হলে আমার একটি প্রশ্নের জবাব দেবেন?

ভবতারণবাবু উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। তাড়াতাড়ি বলেন, তুমি ভিতরে যাও আইভি।

যাচ্ছি, তবে যাবার আগে একটা কৌতূহল চরিতার্থ না করে যেতে পারছি না। আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন এবার?

চৌধুরী সহাস্যে বলেন, বল।

আইভি এক নিঃশ্বাসে বলতে থাকে, অতিথি তো খুশী হয়ে চলে গেলেন। তারপর আমি বললাম - বাবা, ওবেলা কি রান্না হবে? আপনি কি জবাব দেবেন?

ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা।

আইভি শুধু মনে মনে গুনছে এক-দুই-তিন-চার।

আপনি ন্যাচারালি বলবেন আমরা যে দেউলিয়া মা। আমি বলব—আপনার এতবড় সম্পত্তি উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলেন কি করে? আপনি কি জবাব দেবেন?

এবারও বাক্যস্ফূর্তি হয় না চৌধুরী মশায়ের।

পাঁচ ছয় সাত।

ভিতরের দরজা খুলে ঘরে আসে ইভা। আইভির বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করে। সে কিন্তু একগুঁয়ে জন্তুর মত মাটি কামড়ে ধরে বলে চলে, একদিনের অতিথিকে আপ্যায়ন করার দায় ছিল আমার। কিন্তু আমাকে যে আপনি চিরদিনের অতিথি করে নিয়ে গেছেন সে দায় থেকে কিভাবে আপনি মুক্তি পাবেন দেউলিয়া হয়ে যাবার পর?

ইভা জোর করে ওকে টেনে তোলে, কী পাগলামী করছিস আইভি।

পাগলামি নয় ইভা। ভদ্রলোককে আমি শুধু বুঝিয়ে দিতে চাই—নো প্রবলেম কুড বি সল্‌ভড্‌, দ্যাট স্টার্টস্‌ উইথ এ্যান্‌ এ্যাবসার্ড হাইপথেসিস। পরীক্ষক যে অঙ্ক নিজে কষতে পারেন না, সেটি প্রশ্নপত্রে দেবার কোন

অধিকার তাঁর নেই, এটাই শুধু বুঝিয়ে দিতে চাই আমি। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

আট নয় দশ!

নক-আউট চৌধুরী সাহেব নির্বাক পড়ে রইলেন। দুই বোনকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল আইভি।

ভবতারণবাবু তাঁর আত্মজাকে ডেকে কোন কৈফিয়ত তলব করলেন না; ইভা জানতো তা তিনি করবেন না, করবার সাহস তাঁর নেই। ইভা কিন্তু তাই বলে তো চুপ করে থাকতে পারে না। মাতৃহীন ছোট বোনের দায়িত্ব যে তার। যৌবনচঞ্চল উচ্ছল প্রকৃতির এই ছোটবোনটির জন্যে তার মনে উৎকণ্ঠার অবধি নেই। তার নিজের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। জীবনে চলার পথে যে সাথী এল তার সঙ্গে হাত ধরে চলার সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত। স্বামী তাকে নেয় না, এ যে কত বড় বঞ্চনা, কত বড় লজ্জার কথা সে কথা একমাত্র ইভাই বোঝে। তবু তাকে হাসতে হয়, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। মনের মত সাথী না পাওয়ার দুর্ভাগ্যের কথা মর্মে মর্মে জানে ইভা। তাই তার একান্ত ইচ্ছা অন্তত আইভির বেলা যেন আবার নির্বাচনে ভুল না হয়। আইভি যেন তার দ্বিতীয় সত্তা, সে যেন দ্বিতীয় ইভা। তাই আইভির জীবনের শান্তিতে যেন তারই অশান্ত আত্মার তৃপ্তি। কানপুরের সম্বন্ধটা ভেঙে গেছে, যাক, তাতে দুঃখ নেই। অজানাকে বড় ভয় ইভার, অচেনাকে বিশ্বাস করতে মন ওঠে না। চৌধুরী-তনয়কে সে চোখে দেখেনি, তাই বিশ্বাস করতে পারে না। সে যদি ভুল বোঝে আইভিকে, যদি না চিনতে পারে। কেমন ধরণের মানুষ সে তাই বা কে জানে? সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত—এসব বিশেষণের মূল্য কি? ও দিয়ে কি মানুষের মনকে যাচাই করা যায়? মনটাই তো সব। আরও দুটি সুন্দর, স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত মানুষকে কি দেখেনি ইভা? তারা কি ওর মনের রামধনুর উপর কালো মেঘের আস্তরণ টেনে দিয়ে উধাও হয়ে যায়নি কোন অলক্ষ্য দিগন্তে?

এ বরং ভালই হয়েছে। কৃশানু রাজি আছে আইভিকে বিয়ে করতে। কৃশানু। কৃশানু রায়। ইভার জোড়া ভুরুতে জেগে ওঠে একটা কুঞ্চন। মনে পড়ে সব কথা। প্রথম দিন থেকে ওদের মেলামেশার ঘটনাগুলো রোমন্থন করতে থাকে। মনে পড়ে শেষ দিনের শেষের কথাটা। কৃশানু বলেছিল—

আপনার বাবাকে বলবেন তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজি আছি। আরও মনে পড়ল ইভা প্রশ্ন করেছিল—কি করে বুঝলেন? কৃশাম্বু উত্তরে বলেছিল—মা গঙ্গা আজ আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শুনে তীব্র আঘাত পেয়েছিল ইভা। সে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন আজও তার বুকে লেগে আছে। তারপর থেকে আর সে একদিনও কৃশাম্বুর সামনে এসে দাঁড়াতে পারেনি। পারেনি হেসে কথা বলতে, কৌতুক করতে, তার বন্ধুত্বের সখীত্বের স্বীকৃতি পাওয়ার পরেই সে সরে গেছে নেপথ্যে। কারণ ইভা ইভাই, পত্রলেখা নয়।

সংস্কৃতের ছাত্রী ছিল ইভা। কাদম্বরী তার ভালভাবে পড়া আছে। কবি বাণভট্টের অপূর্ব সৃষ্টি কাদম্বরী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ইভাও বলে, কবি অন্ধ!

যুবরাজ চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর সঙ্গে মিলনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। কাদম্বরীর ধ্যানে তাঁর দিন যায়, রাত্রি যায় স্বপ্নে। এমন সময়ে কৈলাস নামে এক কঞ্চুকী রাজকুমারের পদপ্রান্তে এনে নামিয়ে দিল একটি অনতিযৌবনা নারীকে—পত্রলেখা। কবি বলছেন, তার মাথায় ইন্দ্রগোপকীটের মত রক্তাম্বরের অবগুণ্ঠন, ললাটে চন্দনতিলক, কটিতে হেমমেখলা, কোমলতনুলতার প্রত্যেক রেখাটি যেন সদ্য নূতন অঙ্কিত। কঞ্চুকী রাজকুমারকে জানালেন—এই অপরূপ নারীরত্নটি পরাজিত কুলুতেশ্বরের দুহিতা, বন্দিনী, পত্রলেখা এর নাম। এই অনাথা রাজদুহিতাকে রাজকুমারেব তাম্বূলকরকবাহিনীভুক্তা করা হয়েছে। কঞ্চুকী আরও বললেন—ইহাকে সামান্য পরিজনের মত দেখিও না, শিষ্যার ন্যায় দেখিও, অন্তরঙ্গ সুহৃদের ন্যায় তোমার নর্মসহচরী করিও।

পত্রলেখা হল রাজকুমারের অন্তরঙ্গ বান্ধবী। চন্দ্রাপীড় তার সঙ্গে কাদম্বরীর কথা বলতেন, কাদম্বরীর প্রতি তাঁর মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করতেন। পত্রলেখা হাসত, গল্প করত, রাজকুমারকে নানাভাবে সেবা করত। রাজকুমার যখন দিগ্বিজয় যাত্রা করেন তখন একই হস্তীপৃষ্ঠে সে তাঁর কোল ঘেঁষে বসে, তিনি যখন শিবিরে রাত্রিকালে নিজ শয্যায় শায়িত তখন 'ক্ষিতিতলবিন্যস্ত কুথার' উপর সখী পত্রলেখা প্রসুপ্তা থাকে। ক্ষণকালের জন্যও এই সেবাপরায়ণা প্রিয়সখীর প্রতি কোন চিত্তচাঞ্চল্য বোধ করেছেন রাজকুমার চন্দ্রাপীড়, এমন কথা ঘুণাক্ষরেও ইঙ্গিত করেননি কবি বাণভট্ট। পত্রলেখা কিছুদিন কাদম্বরীর সঙ্গে একত্র বাস করে যখন রাজকুমারের কাছে ফিরে এল দূতী হিসাবে খবর

দিতে, তখন রাজকুমার আনন্দের আতিশয্যে প্রিয়বান্ধবী পত্রলেখাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন।

আশ্চর্য! পত্রলেখার মত পূর্ণযৌবনা প্রিয়সখীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করেও কি রাজকুমারের বুকের মৃদঙ্গ বেজে ওঠেনি? শিরায় শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততর হয়নি? তপ্তযৌবনের তাপটুকু কি তাঁর কপাটবক্ষে স্পর্শ করেনি? সেই আলিঙ্গনবদ্ধ মুহূর্তটিতেও কি কাদম্বরীর আলেখ্যের উপরে পত্রলেখার বাস্তব উপস্থিতিটা উপলব্ধি করতে পারেননি যুবরাজ! তবে সে কথা কেন লিখলেন না বাণভট্ট?

কাদম্বরী পড়তে পড়তে, মনে আছে ইভার, সে বলেছিল, ঠিকই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, কবি অন্ধ!

আজ তার মনে হয়, কবি অন্ধ নন। পত্রলেখার চিত্তচাঞ্চল্যের কথা কবি লেখেননি—কারণ সে কথা তাঁকে বলেনি পত্রলেখা। কবির কানে কানে এসে নায়ক-নায়িকারা কথা বলে যায়, ঔপন্যাসিকের নিদ্রাহীন রাত্রে তার উপন্যাস-বর্ণিত পাত্র-পাত্রীরা এসে হানা দেয়। তারা দাবী করে—লেখককে তার আধোতন্দ্রার ঘোর থেকে টেনে তুলে বলে, কই, আমার কথা কই বলছ? আমাকে সৃষ্টি করেছ তুমি, তাই আমার প্রাপ্য কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে তোমাকে।

ইভা নিজে কবি নয়, লেখক নয়—তবে এটা সে জানে। দুঃখের বিষয়, পত্রলেখা কোনদিন কবি বাণভট্টের কাছে গিয়ে তার দাবী জানায়নি কখনও। তার ইতিকথা যে বড় সঙ্কোচের, বড় লজ্জার। কোন লজ্জায় সে বলবে—ওগো কবি, তুমি লেখ আমার কথা। ঐ তোমার গল্পের নায়ক—যে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেও তোমার নায়িকার চিন্তায় বিভোর থাকে, তাকে আমি ভালবাসি—এই কথা কটা লিখে রেখ তোমার কাব্যে।

কোন নারী এ কথা বলতে পারে না। আর কেউ না জানলেও ইভা জানে!

রবীন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, হতভাগিনী বন্দিনীর প্রতি কবির ইহা অপেক্ষা উপেক্ষা আর কী হইতে পারে? একটি সূক্ষ্ম যবনিকার আড়ালে বাস করিয়াও সে আপনার স্বাভাবিক স্থান পাইল না। পুরুষের হৃদয়ের পার্শ্বে সে জাগিয়া রহিল, কিন্তু ভিতরে পদার্পণ করিল না। কোন দিন

একটা অসতর্ক বসন্তের বাতাসে এই সখীত্ব-পর্দার একটি প্রান্তও উড়িয়া পড়িল না।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমরা বলি, কবি অন্ধ।'

ইভাও ঐ সুরে সুর মিলিয়েছিল একদিন। আজ বোঝে ভুল করেছিল সে। কবি অন্ধ নন। কবিই চক্ষুষ্মান, কবিই দ্রষ্টা, মুর্খ পাঠকপাঠিকাই অন্ধ। কবি ঠিকই চিনেছিলেন চন্দ্রাপীডকে। পুরুষ জাতটাই অমনি। হয়তো পত্রলেখাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাদম্বরীকে কল্পনা করেছিল সে; পত্রলেখার দেহে কাদম্বরীর স্পর্শ কল্পনা করেই মনে মনে তৃপ্ত হয়েছিল চন্দ্রাপীড। ভেবেছিল, পত্রলেখা আজ চোখে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিয়েছে আর পাঁচজনের মতই স্বাভাবিক সে।

দুঃখ নেই তাতে, কাব্যে উপেক্ষিতা হয়েই থাকবে ইভা। সে যদি কোন ঔপন্যাসিকের একটি চরিত্র হত তাহলে সেই লেখকের বিনিদ্র রজনীতে সে কোন দাবী নিয়ে উপস্থিত হত না। পত্রলেখার মতই সে নীরব উপেক্ষা সয়ে সরে থাকত। চন্দ্রাপীড-কাদম্বরীর মিলনদৃশ্যটিকে এগিয়ে আনত শুধু।

এতদিনে মনকে জয় করেছে সে। আর ছেলেমানুষী করবে না কখনও। ছেলেমানুষী বইকি। সেদিন তো ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। কেন বোকার মত বলে বসেছিল কৃশানুকে, আমি আপনার মনের কথা জানি।

কি জানত সে? কি জানে? যা জানত তা তো সব ভুল। ইভা অন্যপূর্বা, তার প্রতি দৃষ্টিই নেই কৃশানুর। সে ঘর বাঁধতে চায়—জীবনের পাঠ নিতে চায়। ইভার কথা সে চিন্তাও করে না। অলস প্রণয়ের অহেতুক উচ্ছ্বাস নেই তার। আইভিকেই সে সাথী হিসাবে চায়, শুধু মনে তার কী একটা সংশয় আছে বলে বাধা। কৃশানু নারীভীত, তাই বিয়ে করতে তার ভয়। মা গঙ্গা তাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সে আর পাঁচজনের মতই সাধারণ মানুষ।

কাব্যপাঠের আগে ব্যাকরণ পড়তে হয়, না হলে কাব্যের রসাস্বাদন করা যায় না। কাব্যটাই লক্ষ্য, ব্যাকরণটা অপরিহার্য একটা উৎসর্গ মাত্র। কৃশানু আইভিকাব্য পড়তে উন্মুখ। ইভার ব্যাকরণ নয়। কাব্যই হবে তার শয্যাসঙ্গিনী, চিত হয়ে পড়বে সে কাব্যগ্রন্থ—বারে বারে ফিরে ফিরে। তাই কাব্য চিরকাল থাকবে তার বুকে। আর ব্যাকরণ বুক-কেসে।

তা হোক, তাই চায় ইভা। কাব্যে উপেক্ষিতাই সে থাকবে চিরকাল।

নায়ক নায়িকার মিলনদূতীর ভূমিকা তার। কৃশানুর সম্মতি তো আছেই, ভবতারণও রাজি হয়েছেন। সমস্যা এখন একমাত্র আইভিকে নিয়ে। আইভিকে আকৃষ্ট করতে হবে কৃশানুর দিকে। এটা সে করবে।

আইভিকে ডেকে ইভা প্রশ্ন করল, তুই এভাবে ভদ্রলোককে অপমান করলি কেন?

আইভি উদ্ধতভাবে বলে, অপমান তো আমি করিনি, তিনি অপমানিত হয়ে থাকতে পারেন।

ইভা ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলে, তুই কি চাস? তোব বিয়ের কথায় আমরা না থাকি?

সেটাই তো স্বাভাবিক।

অর্থাৎ তুই নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবি?

যদি কবি কখনও।

তার মানে বিয়ে করাব ইচ্ছেই নেই তোর? তোর সেই থিয়োরী তো?

শুধু থিয়োরী নয় ইভা। আর পাঁচটা মেয়ের মত আমি কারও হেঁসেলে গিয়ে খোকাব মা সাজতে পারব না। তার মানে এ নয় যে পুরুষ আমার জীবনে আসবে না, কিন্তু এমনভাবে আসবে না যাতে আমি ঘাড় গুঁজড়ে পড়ে মরি।

ইভা বলে, শুধু থিয়োরীকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে কাটবে ভেবেছিস তোর জীবন?

আইভি হেসে বলে, ছেলেমানুষের মত কথা বলিস না ইভা। আমি কি তাই বলছি। শুধু থিয়োরীকে জড়িয়ে ধবব কেন? যখন যাকে ভাল লাগবে তখন তাকেই জড়িয়ে ধরব, শুধু দেখতে হবে তাতে জড়িয়ে না পড়ি যেন।

ইভা একদৃষ্টি ওর দিকে তাকিয়ে বলে, আমার কাছেও চাল মারবি?

চাল আবার মারলাম কোথায়?

তুই ভাব দেখাস যেন ডজন ডজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে তোব খুব ভাব—যেন তাদের সকলের কাছেই তুই সুলভ। বিশ্বাস করতে বলিস আমাকে তাই?

বিশ্বাস অবিশ্বাস অবশ্য তোমার কথা। আমি তো এ কথা বলিনি যে সকলের কাছেই সব সময়ে আমি সুলভ, আমি শুধু বলতে চাই প্রত্যেকের কাছেই ক্ষেত্রবিশেষে আমি অলভ্য নই।

মিথ্যা কথা!

মিথ্যা কথা মানে?

মিথ্যা কথা মানে মিথ্যা কথা! আমি কি তোকে চিনি না? তুই মায়ের মতই পিউরিটান। ধরা দিবি তুই?

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে আইভি, বলে, তুই পুরুষমানুষ হলে তোকেই বিয়ে করতুম। স্ত্রীর প্রেমের একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে এতবড অন্ধ পুরুষ আর পাব কোথায়। চোখের উপর পরপুরুষ কণ্ঠলগ্না দেখেও তুই ভাবতিস স্বপ্ন দেখেছি।

ইভা জবাব দেয় না।

কি? রাগ করলি?

না রাগ করিনি। বেশ, মেনে নিলাম দেহের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা তোর আছে। কিন্তু দেহই কি সব? তাতেই কি মানুষ শান্তি পায়?

আইভি বলে, অন্ধের সঙ্গে আলোর বর্ণালী নিয়ে কি আলোচনা করব ইভা? দেহ মন—কোন কিছুকেই কখনও খাদ্য তুলে দিয়েছিস্‌ তুই যে বোঝাব?

ইভা ধমক দিয়ে বলে, আমার কথা থাক। তোর কথা বল। মনটা কি কিছুই নয়? স্বামীস্ত্রীর একনিষ্ঠ প্রেমের কি কোন মূল্য নেই?

মূল্য নেই? বলিস কি? সে প্রেম তো স্বর্গীয়! আমাদেব এই বাড়িতেই দু-দুটো উদাহরণ চোখেব উপর দেখেও অস্বীকাব করতে পারি প্রেমের একনিষ্ঠ মাহাত্ম্য?

ইভা জবাব দিতে পারে না।

আইভিও বুঝতে পারে কথাটায় আঘাত পেয়েছে ইভা। তাই তাড়াতাড়ি লঘু করে বলে, মনের ক্ষুধাও মেটাতে হবে বইকি। তবে সে ক্ষুধা মেটাতে তুই পথ্যেব কোন বৈচিত্র্য বরদাস্ত করিস না। নিত্য ত্রিশদিন একই মেনু বরাদ্দ তোর আইনে। আমি সেটা মানি না। মনকে আমিও খেতে দেব। তবে নিত্যনূতন খাদ্য। জয়ন্ত শীল যদি ফার্পোতে নিয়ে গিয়ে আমার মনকে বিরিয়ানি পোলাও খাওয়ায় তো খাওয়াক, তাই বলে খালেব ধারে পা ছড়িয়ে বসে কৃশানু রায় যদি আমাকে কোঁচড়-ভরা মুড়ির মোয়া অফার করে—

বাধা দিয়ে ইভা বলে, কার নাম বললি? কৃশানু রায়? ইলুর মাস্টার মশাই?

হ্যাঁ ; কেন, আপত্তি আছে তোর ?

ইভা বলে, না, আমার আর আপত্তি কিসের ? সাবালিকা হয়েছ যখন তখন যা ইচ্ছে করতে পার। তবে এ বিষয়ে বড় বোন হিসাবে তোমাকে সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য মনে করি আমি।

ইভার গাম্ভীর্যে, তার হঠাৎ 'তুই' ছেড়ে 'তুমি' বলার ভঙ্গিটায় আইভির ভুরু কুঁচকে ওঠে, বলে, কেন ? সাবধান করার কি আছে ?

আছে। দু তরফ থেকেই সাবধান করার প্রয়োজন আছে। কৃশানুবাবুকে আমি খুব ভালোভাবে স্টাডি করেছি। তাকে জয় করা যায় না। মেয়েমানুষের দিকে চোখ তুলে তাকায়ই না সে।

কেন ? নারী নরকের দ্বার বলে ?

হয়তো তাই। লোকটা ভীষণ রকমের পিউরিটান। নিজের চারদিকে একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ তুলে রেখেছে যেন। আজ সাত-আট মাস পড়াচ্ছে ইলুকে অথচ এখনও মুখ তুলে কথা বলে না আমার সঙ্গে। জানিসই তো, আমি একা একা থাকি, ভাব করতে চাইলাম ওর সঙ্গে। ও এগিয়ে এল না। ওর ছবি আঁকার হবি আছে। স্কেচবুকটা ইলুর মারফত দেখেছিলাম একদিন। একটাও ফিমেল ফিগার নেই তাতে। জিজ্ঞাসা করলাম কারণটা। হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

আইভি উত্তেজিত হয়ে বলে,—'স্নব'।

হয়তো তাই আমার বন্ধুত্ব সে অস্বীকার করল, করুক ক্ষতি নেই। আমি খোলা মনেই এগিয়ে গিয়েছিলাম। আঘাতটা আমার বাজেনি। তাই তোকে সাবধান করে দিতে চাই। শুধু শুধু অপমানিত হতে যাবি কেন ?

আইভি মুখ টিপে হাসলে।

হাসলি যে ?

তুই জানিস না তাই। এসব তথাকথিত পিউরিটান ভালো ছেলেগুলো হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল। আমার তো আর চিনতে বাকি নেই কাউকে। অস্ট্রিচের মত ওরা বালির মধ্যে মুখ গুঁজে শত্রুর আক্রমণ এড়াতে চায়। মনের চারিদিকে বালির বাঁধ বেঁধে ওরা কামনার বন্যাকে রুখতে চায়। কিন্তু তুই বলেছিলি সাবধান করার দুটো কারণ। দ্বিতীয়টা কি ?

ইভা গম্ভীর হয়ে বলে, বাবা জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ তোর

জয়ন্ত শীল নয়। এ বড় মারাত্মক খেলা আইভি। হয়তো কখনও খেলা করতে করতে সত্যিই ভালবেসে ফেলবি ওকে। কিন্তু বিয়ে তোদের হবে না কিছুতেই।

বিয়ের কথা উঠছে কি করে? অসহিষ্ণু হয়ে বলে আইভি।

এখন উঠছে না, কিন্তু যদি কোনদিন তুলিস তুই নিজে থেকে তাহলে বাপি প্রচণ্ড বাধা দেবেন।

অনেকক্ষণ কোন জবাব দেয় না আইভি।

ইভা মনে মনে হাসে। আবার বলে, এ তোর জয়ন্ত শীল নয়।

এবারও চুপ করে থাকল আইভি।

ইভা বুঝতে পারে, ওষুধ ধরছে একটু একটু করে। তিল তিল করে যে ঔষধ প্রয়োগ করেছে ইভা, তিল তিল করেই তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকে রোগিণীর উপর। জয়ন্ত শীল ছিল একদিন আইভির প্রেমাকাশে অগুনতি নভোচারীর অন্যতম। প্রথম প্রথম তাকে মনে হত আইভির ভাগ্যগগনে সে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র মাত্র। ক্রমে দেখা গেল উজ্জ্বলতায় অন্যান্য আকাশচারীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে জয়ন্ত শীল—সেই একদিন হল আইভির আকাশের একমাত্র চন্দ্র! আইভির বিশ্বাস ছিল ভবতারণ ঘোষাল যতই প্রগতিপন্থী আধুনিক হন না কেন, তিনি জাত মানেন। দাদুর মৃত্যুর পর যথারীতি শ্রাদ্ধতর্পণ করেছিলেন তিনি। ইভার সম্ভাব্য একটি পাণিপ্রার্থীকে শুধু অব্রাহ্মণ বলেই নাকচ করেছিলেন একদিন—আর সব দিক থেকে বাঞ্ছনীয় হাওয়া সত্ত্বেও। পৈতাগাছটা এখনও ভবতারণের বুক-পিঠকে আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে প্রাচীনপন্থী সংস্কারের মতই। মদ খান, তবে মহালয়াতে উপবাস করে তর্পণও করেন। তাই আইভির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শীলের ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ কিছুতেই অনুমোদন করবেন না ঘোষাল সাহেব। সেই বিশ্বাসের জোর ছিল তার, গিয়েছিল বিদ্রোহীর মতই মাথা সোজা রেখে বাপের দরবারে জয়ন্তকে সঙ্গে নিয়ে। জানিয়েছিল জয়ন্তকে সে বিবাহ করতে চায়। অশ্বমেধ ঘোড়া আটকে লবকুশ যে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে, ভঙ্গিটা ছিল তার ঠিক তেমনি উদ্ধত। রামচন্দ্রের মতই যুদ্ধদান করেন নি ভবতারণ, আদর করেছিলেন, আশীর্বাদ করেছিলেন দুজনকে। জয়ন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। ভবতারণের বাধাটাকেই সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে হয়েছিল

তার। বেচারি চিনতে পারে নি আইভিকে। বাবা রাজি হলেন, বেঁকে বসল মেয়ে।• কিছুতেই রাজি হল না জয়ন্তকে বিয়ে করতে। জয়ন্ত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল—কার্যকারণে কোন সূত্র খুঁজে পাইনি সে। ইভা কিন্তু অবাক হয়নি। সে আইভিকে ঠিকই চিনেছিল। আর চিনেছিল বলেই আরও জোর দিয়ে বলল, বাপি কিছুতেই এ বিয়ে অনুমোদন করবেন না। এ তোর জয়ন্ত শীল নয়।

ওষুধ ধরল। আইভি কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে বলে, এ জয়ন্ত শীল নয় মানে ?

মানে বাপি জাত মানেন। তবে সে জাত অর্থনৈতিক জাতিভেদ, জন্মগত নয়। বাপির মনুসংহিতায় জয়ন্ত শীল আর আইভি ঘোষাল এক জাতের মানুষ; তারা ধনীর দুলাল। কৃশানু রায় ব্রাহ্মণ হলেও অসবর্ণ, সে দরিদ্র !

আইভি এ বিশ্লেষণের কোন জবাব দিল না।

মনে মনে হাসল ইভা।

স্বাহার চিঠি পড়ে কৃশানু বুঝতে পারে, সে মর্মান্তিক চটেছে।

স্বাহা লিখেছে, 'আমার দুঃসাহসকে অভিনন্দন জানাবার কিছু ছিল না। আমি তোমার মত ভাববিলাসী সেন্টিমেণ্টাল কবি নই। জীবনদর্শনে আমি পুরোপুরি প্র্যাগম্যাটিক। ভাল—কতটা ভাল তা যাচাই করি, মন্দ—কতটা মন্দ পরখ করি। ভালমন্দ বিচার না করে বাজি ধরার ভান করি না! তোমার মত মনে মনে কোন মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করা আমার কাছে পাগলামি; অবাস্তব একটা মনগড়া ছবিকে মানুষের চেয়ে বেশী মর্যাদা দেওয়া আমার মতে শুধু অন্যায় অপরাধ নয়—পাপ! তাই তোমার সব খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আছে, এবং সে কৌতূহল কি করে চরিতার্থ করতে হয় তাও জানা আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেট হাতড়ে বি. এ.তে ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড, ইণ্টারমিডিয়েটে নাইন্থ এবং ম্যাট্রিকে চারটে লেটার পাওয়ার সংবাদ পেয়েই তৃপ্ত হইনি। তোমাদের ক্লাসের একটি মেয়ের বোন আমাদের কলেজে পড়ে, তার কাছ থেকে তোমার যাবতীয় সংবাদও পেয়েছি। তুমি না লিখলেও আমি জানি—তোমার চোখে চশমা নেই, হাতে নেই আংটি, ঘড়ি পর না তুমি। কানা-খোঁড়া নও জেনেই সন্তুষ্ট হইনি, এ কথাও জানি চিন্তা করবার সময় তুমি মাথার সামনের

চুলগুলো টানতে থাক। তোমার সহপাঠিনীর মতে অবিন্যস্ত চুলে নাকি তোমায় আরও ভাল মানায়!

কে তোমার সেই সহপাঠিনী? কি হবে নামটা বলে? তুমি তো শুধু নামটাকেই চিনবে। মানুষটাকে তো চিনতে পারবে না। তাই নামটা জানানো অর্থহীন।

তোমার যুক্তি আমি মানি না। তোমাব মূর্তির কাছে আমি হার মানতে পারব না। আমার সমস্ত অপূর্ণতা নিয়েই আমি তোমার সেই মানসী মূর্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। এভাবে তোমাকে এড়িয়ে যেতে দেব না, আমার নারীসত্তাকে এ ভাবে অপমান করতে দেব না তোমাকে।

তুমি ভেবেছ কি? এতই যদি মানসীমূর্তির প্রতি দরদ তোমার, তা হলে আমার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলতে কেন? চিঠিগুলি পূবে হাওয়ায় ছেড়ে দিলেই তো কবিত্বটা ভালমত জমত। চিঠি না লিখে কবিতা লিখলেই পারতে। বাঁধানো খাতায় তুলে বাখলে পারতে মানসী প্রতিমার উদ্দেশ্যে লেখা কবিতা।

শোন। টুক্‌লির বিয়ে স্থিব হয়েছে। পাটনায় নিয়ে এসে বিযে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু মাসীমাব আগ্রহাতিশয্যে তাঁর ওখান থেকেই বিয়ে হচ্ছে। অনেক দিন ধরেই বিয়ের কথা হচ্ছিল—হঠাৎ দিন স্থির হয়েছে। ১৭ই আশ্বিন। ছেলে স্কলারসীপ নিয়ে আগামী নভেম্বরে বিলাত যাচ্ছে তাই আশ্বিনেই বিয়েটা দিতে হচ্ছে তাড়াহুড়া করে। আমি ১৩ই আশ্বিন অর্থাৎ পয়লা সেপ্টেম্বর বুধবার ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেসে কলকাতা পৌছাব ভোর পাঁচটা-দশে। তুমি স্টেশানে আসবে। কোন কারণেই যেন ভুল না হয়। ধুতি পাঞ্জাবি পরে এস। একডজন রজনীগন্ধার একটা তোড়া নিয়ে এস, যাতে তোমাকে চিনতে পারি আমি। আমার পরনে থাকবে—না ধূপছায়া রঙের ঢাকাই শাড়ি নয়, ডীপ নীল রঙের একটা ক্রেপ সিল্ক। আমারও হাতে থাকবে একটা রজনীগন্ধার তোড়া। আমি সেকেণ্ড ক্লাস মেয়েদের গাড়িতে যাব। ট্রেন থেকে নেমে যদি তোমাকে না চিনতে পারি তাহলে হুইলারের স্টলের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করব আমি। তুমি নিশ্চয় আসবে। অন্যান্য কথা সাক্ষাতে হবে।'

চিঠিখানা কৃশানু পেয়েছে আগস্টের বাইশ তারিখে। যথেষ্ট সময় হাতে রেখেই চিঠি লিখেছে স্বাহা। অর্থাৎ কৃশানুকে একটা জবাব লেখবার সুযোগ

ও সময় দিয়েছে। জবাব লিখতে বসেও ছিল কৃশানু। কিন্তু কি লিখবে স্থির করে উঠতে পারে না। মনটা তার চঞ্চল হয়ে আছে।

কাল ইলাকে পড়িয়ে ফেরবার সময় ড্রইংরুমে সাক্ষাৎ হয়েছিল ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে। বসে বসে কি একটা রিপোর্ট পড়ছিলেন তিনি। কৃশানুর সঙ্গে চোখোচোখি হতে হাত তুলে নমস্কার করেছিল কৃশানু। ভবতারণ ফাইলের দিকে তাকিয়েই বলেন, তোমার ছুটি হতে আর কতদিন বাকি?

এখনও দিন সাতেক।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচটা মুছতে মুছতে ভবতারণ বলেন, সাপোস, ইউ টেক এ প্লেসার ট্রিপ টু দার্জিলিঙ।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কৃশানু। ওঁর কথা বলার ধরণই ওই। সোজা কথা সহজভাবে বলতে পারেন না। হয় শেষটা আগে বলেন, শুরুটা পরে, না হয় মাঝখান থেকে আরম্ভ করে সমাপ্ত করেন প্রারম্ভ দিয়ে। সমস্ত বক্তব্যটা না শুনলে ওঁর কথাবার্তা খাপছাড়া মনে হয়। এতদিনে ওঁর এ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কৃশানু সম্পূর্ণ অবহিত হয়েছে। ও অপেক্ষা করে।

ভবতারণ নিজেই পরিষ্কার করেন তাঁর বক্তব্য—আইভিকে দার্জিলিঙে পাঠাতে হবে। ও অবশ্য একাই যেতে পারে কিন্তু আমি ঠিক তা চাই না। তুমিও যেতে পার। দার্জিলিঙ থানার ও সি জগদীশ আমার পরিচিত, তাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। তার বাসাতেই উঠতে পার তুমি। আইভিকে পৌঁছে দিয়ে দিনকতক দার্জিলিঙ বেড়িয়ে ফিরে আসতে পার তুমি।

কৃশানু বুঝতে পারে এক্ষেত্রে তার ভ্রমণের যাবতীয় ব্যয়ভার ঘোষাল-সাহেবই বহন করবেন। ওর ভিতরে একজন ভবঘুরে আছে। বেড়াতে পারলে ও আর কিছু চায় না। ওর পক্ষে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা শক্ত। এদিকে পাটনা থেকে স্বাহাও কলকাতায় আসছে। তাকে এড়ানোর এ এক অপূর্ব সুযোগ। স্বাহা যে ধরণের মেয়ে, হয়তো ওর মেসে এসেই হানা দিয়ে বসবে। সেটা সে চায় না। স্বাহার চিঠিতে কেমন যেন একটা চ্যালেঞ্জের সুর আছে। সেটা বরদাস্ত হয়নি কৃশানুর। দৃপ্ত ভঙ্গিতে স্বাহা ওকে হুকুম করেছে হাওড়া স্টেশনে যেতে। যাবে না স্থির করেছিল মনে মনে। কিন্তু মনের উপর ওর জোর নেই। তাছাড়া স্বাহা যদি এসে মেসে হাজির হয়? তখন? সাময়িক পশ্চাদপসরণ মন্দ নয়। এই সুযোগে কলকাতা

ত্যাগ করাই সবচেয়ে নিরাপদ। সুতরাং সব দিক থেকেই ভবতারণের প্রস্তাবটা লোভনীয়, একমাত্র বাধা যাত্রাসঙ্গিনী হবে আইভি। কিন্তু অবিমিশ্র ভাল কি আছে কিছু দুনিয়ায়?

ভবতারণের উদ্দেশ্যটা আন্দাজ করতে পেরেছে সে। কানপুরের সেই ভদ্রলোকের মেয়ে দেখার ব্যাপারটা শুনেছিল কৃশানু ইলুর কাছে। মনে মনে খুশীই হয়েছিল। খুশী হয়েছিল অবশ্য অন্য কারণে—ভদ্রলোকের নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছিল আইভি। বেশ করেছিল। কৃশানু বুঝতে পারে যে ভবতারণ আন্দাজ করেছেন কানপুরের পাত্র এখন আকাশকুসুম। তাই কৃশানুর দিকে নজর পড়েছে এবার। ওদের দুজনকে একটা সুযোগ দিতে চান তিনি। দেখতে চান কৃশানু এবং আইভি পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে কি না। ভবতারণের মনোবিশ্লেষণ ঠিক হয়েছে কিনা যাচাই করতে বলে, পুজার ছুটির তো আর মাত্র সাতদিন বাকি। এখন যে আবার যাবেন আইভি দেবী?

ভবতাবণ গম্ভীর হয়ে বলেন ওদের পূজার ছুটিটা বড নয়, তাছাডা ও ছুটিতে দার্জিলিঙেই থাকবে বলছে।

কারণটা জিজ্ঞাসা করা যায় না। তাই এবার ঘুরিয়ে বলে, তাহলে ইলুকেও নিয়ে যাই না।

ওর হাফ-ইয়ার্লি হয়ে গেছে?

কৃশানুর মনে পড়ে, হয়নি। পরীক্ষা শেষ হলেই ছুটি হবে ওদের স্কুলের। ভবতারণকে যতটা এলোভুলো মনে হয় আসলে তো তিনি তা নন। এমনভাবে জবাবগুলি দিয়ে গেলেন যাতে ওদের যুক্তভ্রমণের উদ্দেশ্যটাকে বুঝতে দিলেন না কৃশানুকে। তবু ও বুঝল ঠিকই।

কবে যেতে বলেন?

শুক্রবারে আসাম-লিঙ্কে। শিলিগুডি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে চলে যেও বরং।

ভবতারণবাবু নিজেই এসেছিলেন ওদের তুলে দিতে। প্রথম শ্রেণীর একটি ছোট কামরা। চারটি বার্থ। পূজার ছুটির ভিড় এখনও শুরু হয়নি। কৃশানুকে তাই নিরাশ হতে হল। ওরা দুজন ছাড়া তৃতীয় যাত্রী নেই কেউ ও কামরায়। মালপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে কৃশানুর নজরে পড়ে ইভাও এসেছে স্টেশনে। সে এসেছে একেবারে শ্রীরামপুর থেকে সোজা—ওদের তুলে

দিতে। আইভির পাশে গিয়ে ইভা বসল। অন্তরঙ্গ সখীর মত কি কলবল করতে থাকে দুজনে নিম্নস্বরে।

কৃশানুর মনে পড়ল সেই শ্রীরামপুরের অভিযানের পর থেকে এ দীর্ঘ তিন চার মাস ইভা তার সামনে আসেনি একবারও, কথাও বলেনি একটিও। এর কারণটা কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। ইভাই একদিন আইভির সঙ্গে তার বিবাহপ্রস্তাব তোলে। ইতস্তত: করেছিল কৃশানু, বিচলিত হয়েছিল ইভা। এখন সে সম্মতি দিয়েছে, কোথায় চটুল কৌতুকময়ী হয়ে উঠবে, না সরে গেছে নেপথ্যে। বুদ্ধিমতী ইভা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে কেন হঠাৎ কৃশানুর উপর এই দায়িত্বটা দিয়েছেন ভবতারণ। ও শুধু রক্ষক হিসাবেই যাচ্ছে না, আইভির সঙ্গে একটা সম্ভাবনার সূত্রটা যাচাই করতেই যাচ্ছে। সুতরাং যাত্রার পূর্বক্ষণে ইভার একটা শুভেচ্ছাবাণীর প্রয়োজনীয়তা আন্তরিক ভাবে অনুভব করল সে।

কৃশানু বাঙ্কের উপরকার মালপত্র ঠিক মত গুছিয়ে রেখে ইভার মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়। হাত দুটি বুকের কাছে জড় করে ধবে বলে, নমস্কার। আমাকে একেবারে চিনতেই পারছেন না মনে হচ্ছে।

ইভা চকিতে একবার মুখ তুলে তাকায়। প্রতিনমস্কাব করে না। বলে, চিনতে পারলেই যে সবসময়ে চিনতে হবে তার মানে কি?

পরমুহূর্তেই আইভির মাথাটা কাছে টেনে এনে নিম্নকণ্ঠে কি যেন বলতে থাকে। কৃশানু সামলে নেয় নিজেকে। রীতিমত অপমানিত বোধ করে সে। আর কোন কথা বলার চেষ্টা না করে ও পাশের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে একলা।

ওর সৌভাগ্য—সময় হয়ে গিয়েছিল। অল্পক্ষণেব মধ্যেই গাড়ি ছাড়ল। একবার ইভার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে কৃশানু, সে একদৃষ্টে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে।

অপস্রিয়মান শিয়ালদহ স্টেশানের দিকে মুখ ফিরিয়ে আইভি একটা রেশমী রুমাল নাড়তে থাকে। কৃশানুর কিন্তু কিছু ভাল লাগে না। ও পাশের বেঞ্চির একেবারে একপ্রান্তে চুপটি করে বসে থাকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে।

এই মাত্র যে ঘটনাটা ঘটল, কৃশানুর মনে হচ্ছে সেটা ইতিপূর্বেও ঘটেছিল তার জীবনে। এমন মাঝে মাঝে হয়। মানসিক রোগমুক্তির সন্ধানে কিছু

কিছু মনস্তত্ত্বের বই এনে এককালে পড়েছিল কৃশানু। তাই জানত এই জাতীয় 'স্মৃত্যাভাস' বা paramnesia-র পিছনে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা সব সময়েই থাকে। যে ঘটনা প্রকৃতপক্ষে প্রথম শুনছি বা দেখছি, এরকম স্মৃতিবিভ্রমের ফলে হঠাৎ মনে হয় যেন পূর্বেই এ ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। কেন এ ধরণের স্মৃত্যাভাস হয় তা বলা কঠিন অবশ্য। এক এক মনোবিদ পণ্ডিত এক এক কথা বলেন। অবশ্য বার্গসঁ প্রমুখ অধিকাংশ বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদের মতে এ রকম মনে হওয়ার পিছনে বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা থাকেই। কৃশানুর মনে হল একটি মেয়ের সামনে ঠিক এই ভঙ্গিতে আগেও একবার সে এসে দাঁড়িয়েছিল, যুক্তকরে নমস্কার করে চিনতে না পারার জন্য অভিযোগ করেছিল। আর অতি পরিচিতা মেয়েটি হুবহু এই ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে নিযে বলেছিল চিনতে পারলেই যে সব সময়ে চিনতে হবে তার মানে কি?

কথাটা এই মাত্র শুনেছে সে, কিন্তু যেন এই প্রথমবার নয়। ইভার এই দেখেও-দেখতে-না-পাওয়ার উপেক্ষাভরা ভঙ্গিটি যেন তার অতি পরিচিত। কোন একজনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বেদনাহত, অপমানিত হয়ে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা যেন এই প্রথম নয় ওর। জানা গানের বেদনাবিধুর কলির মত, প্রথম শ্রবণের অনুভূতিটাকেই আর একবার নতুন করে আঘাত করল যেন।

কিন্তু কেমন করে তা হবে? ইভার সঙ্গে ওর আলাপ মাত্র ছয় সাত মাসের। এর ভিতর এ ঘটনা আর ঘটেনি। এই কয়মাসের ঘটনা পরিষ্কার মনে আছে তার। সে স্মৃতি এত সহজেই ঝাপসা হয়ে যায়নি। এর ভিতর কোনদিন সে ইভাকে চিনতে না পারার অভিযোগ করেনি, ইভাও চিনতে পারা সত্ত্বেও এমন মুখ ঘুরিয়ে বসেনি কখনও। তা হলে? অথচ ইভা ছাড়া দ্বিতীয় কোন মেয়ের সঙ্গে এ জাতীয় কথোপকথন ওর পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।

কিন্তু তাহলে কেন মনে হচ্ছে ঠিক এ ঘটনা আগেও ঘটেছে ওর জীবনে?

একটা গল্প মনে পড়ল কৃশানুর। গল্প নয়, সত্য ঘটনা। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের জীবনের একটা ঘটনা। তিনি তাঁর এই কেস-হিস্ট্রিটা দিন-পঞ্জিকা থেকে প্রকাশ করে গেছেন। কোথায় পড়েছে মনে নেই, তবে কেস-হিস্ট্রিটা মনে আছে।

ডাক্তার বসু একবার একটি ভূতে পাওয়া রোগিণীর চিকিৎসা করতে

যান। মেয়েটির বয়স অল্প, ফিটের সময় 'বক্তার' হত—অর্থাৎ অনর্গল আবোল-তাবোল বকে যেত। সে বলত, তার নাম অমুক, তার গ্রাম তমুক, ইত্যাদি। একদিন ফিটের মধ্যে সে চীৎকার করে বলে ওঠে: তোদের বাড়ির মেয়ে এমন অশুচি হয়ে থাকে কেন? তাই তার উপর আমি ভর করেছি। আমি কে? কেন, রোজ বলি তবু শুনতে পাস নে। আমি অমুক গাঁয়ের অমুকের বউ গো! ভাতারের সঙ্গে ঝগড়া করে গলায় দড়ি দিয়েছিলুম। মাগো! শূন্যে ঝুলছিলুম গলায় ফাঁস আটকে। এ্যাদ্দিনে তোদের মেয়ের দেহে এসে ভর করে বেঁচেছি।

রোগিণীর বাবা পোস্টাল গাইড দেখে গ্রামটির হদিস পান, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সেখানকার পোস্টমাস্টারকে চিঠি লিখে জানতে পারেন যে চার পাঁচ মাস আগে গাঁয়ে সত্যি সত্যি ঐ নামেব একটি স্ত্রীলোক স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া কবে আত্মহত্যা করেছিল। রোগিণীর পক্ষে সেই আত্মঘাতিনীর নামধাম জানার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কৃশানুর মনে আছে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁর কেস-হিস্ট্রিতে লিখেছিলেন, "রোগিণীর এক আত্মীয় ভূতে অগাধ বিশ্বাসী, তিনি আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যদি ইহা হিস্টিরিয়া বলেন, তবে এই সকল আশ্চর্য ঘটনা কিরূপে ঘটিল? আমি রোগিণীকে সুস্থ অবস্থায় অনেকবার প্রশ্ন কবিয়াও কিছুই ধরিতে পাবি নাই। সত্য কথা বলিতে কি, অনেকদিন পর্যন্ত আমি এই ব্যাপারের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পাবি নাই। হঠাৎ একদিন রোগিণীর ফিটেব সময় উপস্থিত হই। ফিট না ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা কবিতেছিলাম। ঘরেব দেওয়াল-আলমারির একটা তাকে 'বঙ্গবাসী'র কতকগুলি পুরাতন সংখ্যা ছিল। সময় কাটাইবার জন্য সেগুলি উল্টাইতেছি, এমন সময় রোগিনীর মুখে শোনা সেই গ্রামটির উল্লেখ দৈবাৎ দেখিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলাম। পাঠ কবিয়া দেখি, 'বঙ্গবাসী'র সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, 'অমুক নাম্নী স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত কলহ করিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে।' এইটুকু পড়িবামাত্র সমস্ত ব্যাপারটা আমার নিকট জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণী কোন না কোন সময়ে সেই সংবাদ পাঠ করিয়াছে, আর অজ্ঞাতসারে ঘটনাটি তাহার মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফিটের সময কল্পনায় সে নিজেকে ঐ আত্মঘাতিনী প্রেতাত্মাদ্বারা অভিভূত মনে করে। ফিট ছাড়িয়া গেলে

রোগিণীকে 'বঙ্গবাসী'খানি দেখাইলাম। তাহার পর আর কখনও তাহার ফিট হয় নাই।"

কৃশাহুর মনে আছে ডাক্তার বসু মন্তব্য করেছিলেন : দৈবক্রমে কাগজখানি হস্তগত হইয়াছিল বলিয়াই প্রকৃত রহস্য প্রকাশ পাইল, নতুবা অন্য কোন প্রকারে ঘটনাব সঠিক তথ্য নির্ণীত হইত কিনা সন্দেহ।

কৃশাহুর মনে হল এই যে ওর মনে হচ্ছে এ ঘটনা তার জীবনে ইতিপূর্বেও ঘটেছে, এও হয়তো অমনি কোন একটা অভিজ্ঞতার ফল।

গাড়ি উইলিংডন ব্রীজ পার হয়ে গেল। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখে সামনের বেঞ্চিতে বসে আইভি একখানা ইংরাজি সিনেমা সাপ্তাহিক দেখছে। গাড়িতে ওঠার পর একটা কথাও হয়নি তার সঙ্গে। কামরার ভিতবের চেয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েই যেন স্বস্তি পেল। জানলা দিয়ে দেখা অপস্রয়মান দৃশ্যগুলির মধ্যেই অবগাহন করল কৃশাহু।

ট্রেনে যেতে যেতে এই একটা চিন্তা ওকে প্রায়ই অভিভূত করে। দৃশ্যপট অনবরত বদলে যাচ্ছে। কোথাও ছোট ছোট গ্রাম, ছেলেরা খেলা করছে, খাটিয়ায়-বসা মেরজাই-গায়ে প্রৌঢ় মানুষটি হুঁকার কলকেতে ফুঁ দিচ্ছে। কোথাও ফাঁকা মাঠেব মাঝখানে রাখাল-ছেলে নির্জন বিরলপত্র বাবলা-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। পাচনবাড়িতে ঠেস্ দিয়ে পিচুটিভরা দুচোখ মেলে দেখছে অপস্রয়মান গাড়িটাকে। কোথাও স্টেশান স্টাফ-কোয়ার্টারে মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য-জীবনের একটা খণ্ডচিত্র। হয়তো বারান্দায় বসে কেউ তেল মাখছে, নয়তো বাগানে গাছের গোড়া খুঁড়ে দিচ্ছে। অথবা জানলার পর্দা একটু সরিয়ে কাজলকালো দুটি নয়ন মেলে রেলবাবুর সদ্যবিবাহিতা বধূ দেখছে ওর বাপের বাড়ির দেশের দিকে ছোটা রেলগাড়িটাকে। কৃশাহু দেখে আর ভাবে এই যে ছোট ছোট দৃশ্য আমরা দেখছি আর ভুলছি, অথচ একবারও মনে নিচ্ছি না যে এইসব দৃশ্যগুলিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে কৃশাহুর অজানা এক একটা সৌরজগৎ। সেখানে হাসি আছে, অশ্রু আছে, আছে বিরহ-মিলন, কলহ-অভিমান। ওদের ঐ জীবনচক্রের পরিক্রমায় কৃশাহুর কোন ঠাঁই নেই। ওদের সেই ঠাসবুনোট জীবনে কৃশাহু রায়ের পক্ষে একান্ত স্থানাভাব। সেখানে সে হাসিঅশ্রু বিজড়িত কৃশাহু রায় নয়—সে শুধু ট্রেনের কামরার একজন লোক। তার কাছে ওরা যেমন মাঠের মাঝখানে দাঁড়ানো রাখাল-ছেলে, খাটিয়ায় বসা একজন প্রৌঢ় অথবা রেলবাবুর সদ্যবিবাহিত একজন

নববধূ। ওকে ওরা কেউ মনে রাখবে না। ট্রেনের কামরায় দেখা হাজারটা মুখের মধ্যে ওদের কাছে তার কোন বিশেষ নেই। কৃশানুও নিঃশেষে ভুলে যাবে ঐ লাঠি ঠেকো দেওয়া রাখাল ছেলেকে, ঐ উত্থান-বিলাসী রেলবাবুকে, কিংবা বাপের বাড়ির জন্যে মন কেমন করে ওঠা ঐ ডাগোর-চোখো নতুন বৌকে।

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল কি একটা বেজগি-স্টেসনে। সিগন্যাল পায়নি বোধ হয়। জনশূন্য প্ল্যাটফর্ম। ডাকগাড়ির এ দুর্মতি হবে তা কি করে জানবে ঐ ঝিমন্ত মেঠাইওলা, আর নলীকোর্তা রেলকুলি? আশপাশের কামরা থেকে কয়েকজন নেমে পড়েছে প্ল্যাটফর্মে। অধৈর্য হয়ে উঠেছে দেড় মিনিটেই—যেন গন্তব্যস্থলে দেড় মিনিট পরে পৌছলে ওয়াটারলু যুদ্ধ জেতা সম্ভব হবে না ওদের। উকিঝুঁকি মেরে দেখছিলেন ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালটা দেখা যায় কিনা। কারও মতে সামনে একটা মালগাড়ি আছে, কারও মতে চেন টেনেছে কেউ, কেউ বলছেন লাইন মেরামত হচ্ছে। ওদের ভাষা ভাষা সংলাপ ভেসে আসছে। অনেকে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ার অপরাধে অন্তিম ফতোয়া জারি করলেন—শালাব গভরমেণ্ট না পালটালে আর কিছুটি হবে না।

হঠাৎ ওদের কামরার ওপাশ থেকে কে যেন কাকে আচমকা ডেকে উঠল—নরু। এ, নরে—ন।

কৃশানু এমন জোরে চমকে উঠেছে যে আইভি পর্যন্ত চকিতে মুখ তুলে ওর দিকে একবার তাকায়। কৃশানু লজ্জিত হয়ে আবার জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে বসে থাকে। আইভি আবার ডুবে যায় সিনেমা সাপ্তাহিকে।

সমস্যাটার আকস্মিক সমাধান হয়ে গেছে হঠাৎ। ঐ অচেনা লোকটা অকস্মাৎ ঐ ভাবে ডেকে ওঠায় ওর লুপ্ত স্মৃতি ফিরে এসেছে। ও এমন ভাবে চম্‌কে উঠেছিল যেন ওকেই নাম ধরে ডেকেছে কেউ।

ঘটনাটা ওর জীবনে ঘটেনি। ঘটেছে শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' বইতে। বইটা কবে, কখন, কোথায় পড়েছিল তা আর আজ মনে নেই, কিন্তু পড়বার সময় নিশ্চয়ই সে নায়কের সঙ্গে একটা একাত্মবোধ অনুভব করেছিল। তাই দয়ালের বাড়িতে বিজয়া যখন নরেনকে চিনতে না পেরে বলেছিল—'চিনতে পারলেই যে সব সময় চিনতে হবে, তার মানে কি?' তখন নরেনের বুকে যে বেদনাটা বেজেছিল সেটা বুক পেতে গ্রহণ করেছিল কৃশানু রায়।

সব ভুলে গেলেও সেই বেদনার স্মৃতিটা নিশ্চয় আজও অম্লান হয়ে বিঁধে আছে ওর বুকে। তাই ইভার কথাটা শুনে ওর মনে হয়েছিল তার একটা পুরাতন ক্ষতেই বুঝি নতুন করে আঘাত পেল সে।

নতুন করে ভাবতে বসে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে কৃশাম্বুর কাছে। বিজয়া যে কারণে সেদিন চিনেও চিনতে পারেনি নরেনকে, আজ ইভাও কি সেই একই কারণে চিনতে পারল না তাকে? তার মানে ইভা তাকে ভালবাসে? চমকে ওঠে কৃশাম্বু আপন মনেই। হয়তো তাই ঠিক, ইভা তাকে ভালবাসে, আর কৃশাম্বু অজান্তে কখন মাড়িয়ে দিয়ে বসে আছে সেই নিভৃত প্রেমকে।

মাথাটা ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে আসছে কৃশাম্বুর। ইভা নিশ্চয় তাকে ভালোবাসে। প্রথম দিন থেকে সব কথা খুঁটিয়ে মনে পড়তে থাকে তার। খাবারের থালা নিয়ে অন্নপূর্ণার মূর্তিতে তার নিত্য আবির্ভাব—বাড়ি থেকে বের হবার সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও ময়ূরকণ্ঠি রঙের মাইশোর সিল্ক শাড়ি পরে থাকা, হঠাৎ কৃশাম্বুর আগমনে 'স্বপ্নোনু, মায়ানু, মতিভ্রমনু কপ্তং নু তাবৎ কলমেব পুণ্যৈঃ' উদ্ধৃতি মনে পড়ার কারণগুলি বুঝতে পারে। ইভা বলেছিল—আমি জানি আপনার মনের কথা। আপনি একটি মেয়েকে মনে মনে ভালবাসেন; আর এও জানেন তাকে দূর থেকেই শুধু ভালোবাসা যায়, তাকে ঘরে আনা যায় না।···এ কথা কেন বলেছিল ইভা? সে তো জানে না কৃশাম্বুর মনের মাধুরী দিয়ে গড়া মানসী প্রতিমার কথা! তাহলে কাকে সে 'মীন' করেছিল?

কার কথা যে সে বলেছিল বুঝতে এবার আর ভুল হল না কৃশাম্বুর। ইভা শুধু ভালবেসেই থামেনি, সে বিশ্বাস করেছে সেও ভালবাসা পেয়েছে। ওর আরও মনে পড়ে সেই মৃত্যুভয়তাড়িত বিহ্বল একটি মুহূর্তের কথা। ইভা যখন আশ্রয় খুঁজেছিল ওর বুকে! স্বামীসান্নিধ্যবঞ্চিতা অনাদৃতা একটি পূর্ণযৌবনা নারী ক্ষণিক নিরাপত্তার সন্ধানে এসে পড়েছিল কৃশাম্বুর বুকে। ওর দ্রুতস্পন্দিত নরম বুকের যে অনুরণন শুনেছিল কৃশাম্বু বুক পেতে সেখানে শুধুই কি ছিল মৃত্যুভয়ের আর্তি? আর কিছুর আভাস কি সে পায়নি? মৃত্যুবিভীষিকা দূরে চলে যাবার পরেও কয়েকটি মুহূর্ত দেরি হয়েছিল ইভার নিজের অবশ দেহটা আলিঙ্গনমুক্ত করে নিতে। সে অবশতা কি শুধুই মৃত্যুভয়জনিত—সে বিলম্বের কি আর কোন ভাষ্য হতে পারে না? ওর উষর

জীবনের অযুত মুহূর্তের ভিতর থেকে সেই আট-দশ সেকেণ্ড কি চুরি করেনি ইভা? ওর জীবনের লক্ষ কোটি মুহূর্তের ঐ আট দশটি সেকেণ্ড কি শাশ্বত আসন পাতেনি ওর স্মৃতির যাদুঘরে!

আর নির্বোধ কৃশানু তাকে আত্মসংবরণের সুযোগ মাত্র না দিয়েই হানল নতুন আঘাত: আপনার বাবাকে বলবেন, তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজি আছি।

মরমে মরে যায় বেচারি। বুঝতে পারে কেন সেই দিনের পর থেকে ওর সামনে এসে দাঁড়ায় না ইভা। কেন আজ তাকে চিনতে পারার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। কৃশানু যে তার সলজ্জ প্রেমকে পদদলিত করে ছুটে চলে এসেছিল আইভির মদিরারক্তিম উষ্ণ প্রেমের সন্ধানে।

আইভি। চোখ তুলতেই চোখোচোখ হয়ে যায় তার সঙ্গে। হয়তো চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে নানা অভিব্যক্তি ফুটে উঠছিল ওর মুখে—একদৃষ্টে তাই লক্ষ্য করছিল আইভি। ও চোখ তুলে তাকাতেই আবার দৃষ্টি নত করে বইতে। কৃশানু এদিকে ফিরে বসে। এভাবে নীরব যাত্রাটা বিসদৃশ, দৃষ্টিকটু—কিন্তু ওর একেবারেই ইচ্ছা করছে না এখন আইভির সঙ্গে কোন বাক্যালাপ। ওর মনটা ভরে রেখেছে ইভা, দেহটা আটকা পড়েছে আইভির সান্নিধ্যে।

আপন মনেই আত্মবিশ্লেষণ করে চলে কৃশানু। একটা অদ্ভুত মানসিক রোগে সে ভুগছে আকৈশোর। কোন ডাক্তারের পরামর্শ নেবার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই—চেষ্টাও করেনি কখনও। এটা কি রোগ তা সে জানে না। ডাক্তারী শাস্ত্রে যদি এর নামকরণ না হয়ে থাকে তবে কৃশানু নিজেই তার নামকরণ করতে পারে উইমেনোকোরিয়া। রোগনির্ণয় অর্থাৎ ডায়াগনসিস তো হল, এখন জানতে হয় রোগের উৎপত্তিস্থল। কেন হল এ রোগ, আর কি ভাবে সারবে।

কৃশানুর বিশ্বাস রোগের কারণটা হচ্ছে ওর জীবনের বিচিত্র পরিবেশ। শৈশব থেকেই নারী সাহায্য পায়নি সে। মাকে হারিয়েছে জ্ঞান হবার আগে। বিমাতাকে পায়নি কোনদিন। বিমাতার কন্যা ছিল না একটিও। মাসী, পিসি, দিদি, বউদি—কিছুই জোটেনি ওর বরাতে। পাড়াপ্রতিবেশীর কোনও অন্তঃপুরচারিকার সঙ্গেও যদি দৈবাৎ ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হত তাহলে এ দশা হত না। ওর বাবা ছিলেন ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারী। যেখানেই বদলি হয়েছেন সেখানেই ও দেখেছে আরণ্যক জীবনকে। শৈশব পার করে কৈশোরে পদার্পণ করল যখন, তখন বাবা বদলি হয়ে এসেছেন

একটা আধা শহরের সাব-অফিসে। তখন প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের মেয়ে-বউ-গৃহিণীদের যে না দেখেছে তা নয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে বোন-বউদি-মাসীমার সম্পর্ক পাতাবার মত মনটা গেছে জঙ্গলে হারিয়ে। সেই যুগ থেকেই নত হয়ে গেছে ওর দৃষ্টি।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মত নিষ্কলুশ হলে ভাবনা ছিল না—তার একটা গতি হতে পারত, কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকলেও অজ্ঞ ছিল না সে। তাই ঋষ্যশৃঙ্গের মত চোখ তুলে তাকাতে পারত না। মিরান্দার মত নির্জন দ্বীপে পিতার সান্নিধ্যে নরনারীর যৌনবোধের সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেই বেড়ে ওঠেনি। শকুন্তলার মত তপোবনের ছায়া পড়েনি ওর জীবনে—কপালকুণ্ডলার মত কাপালিক-প্রভাবিত জীবন নয় ওর। ওরা সবাই সমাজ সংসার থেকে ঘটনাচক্রে দূরে সরে গিয়ে মানুষ হয়েছে—পূর্ণযৌবনের মাঝখানে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে জীবনের আদি সত্যকে। তারপর কাব্য-উপন্যাসের ঘাত-প্রতিঘাতে ভেসে গেছে তারা। কিন্তু কৃশানু তো জীবনরহস্যের আদি সত্যকে মধ্য যৌবনে প্রথম জানছে না—আর সে তো ওদের মত একটা লেখকের মনগড়া কিছু নয়, সে যে রক্ত-মাংসের মানুষ।

মোট কথা এতদিনে ও বুঝতে শিখেছে নারীভীতিটা তার স্বকপোল-কল্পিত। একজন সাধারণ পুরুষমানুষের যে জৈবিক বৃত্তি আছে—তারও তাই আছে। সেদিন গঙ্গাবক্ষে একটি এক-তারা-জ্বলা সন্ধ্যায় ও প্রথম বুঝতে শিখেছে এই সত্যটা। দ্রুতস্পন্দিত একটি বুকের টরে-টক্কায় ও শুনেছে সেই গোপনবার্তা বুক পেতে। হয়তো দৃষ্টিবিভ্রমটাও একটা সাময়িক রোগ—চিকিৎসাযোগ্য মানসিক বিকারমাত্র। সেই হিষ্টিরিয়া রোগিণীর মত তার রোগমুক্তির বিশল্যকরণীও হয়তো লুকিয়ে আছে লাইব্রেরীর কোন এক তাকে। কেউ যদি সেই বিশেষ পৃষ্ঠাটি খুলে ধরে ওর চোখের সামনে—দেখিয়ে দেয় এই রোগের প্রকৃত উৎপত্তিস্থলের আদি উৎসমুখ—তাহলেই হয়তো রোগমুক্তি হবে ওর। কিন্তু ন্যাশনাল লাইব্রেরীর গন্ধমাদনের কোন তাকের কোন গ্রন্থের কোন পৃষ্ঠায় লুকিয়ে আছে সেই বিশল্যকরণী—কে তার সন্ধান এনে দেবে? হয়তো এবার 'বঙ্গবাসী'র পৃষ্ঠায় নয়, বঙ্গনারীর দেহেই পাঠ করতে হবে সে সংবাদ। মনের নিরুদ্ধ কামনাই নাকি এ জাতীয় রোগের উৎপত্তিস্থল। অন্তত বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ তাই বলে থাকেন। কি সেই নিরুদ্ধ কামনা, কেমন করে তা চরিতার্থ হবে তা কৃশানু জানে না। আন্দাজ করে,

হয়তো বিবাহই ওর রোগমুক্তির একমাত্র রাজপথ ; কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। যদি তা না হয়, তাহলে সে ভুলের মাশুল যে দিতে হবে দুজনকে ! এখন কোন কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে না কাউকে, কিন্তু তখন ?

ইভা ওর জীবনে প্রথম নারী। ইভা তাকে ভালোবাসে। সে ? হঁ্যা, এতক্ষণে স্বীকার করতে বাধ্য হয় কৃশানু। সেও ইভাকে ভালবাসে। মনটা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। নিজের মনকে সে চিনতে পারেনি এতদিন। মনের গোপনলোকে তিল তিল করে গড়ে উঠে ছিল ওর প্রেমের তাজমহল। না হলে সেদিন কিছুতেই জিজ্ঞাসা করতে পারত না ইভাকে—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে না বলে যদি চুপি চুপি কথা বলে তখন কি বলবে সে, তুমি না আপনি ! আর এ প্রশ্নের জবাব দিতে বেধে যেত না ইভার। না হলে, সেই চরমতম মুহূর্তে কিছুতেই সে বলতে পারত না—ভয় কি ইভা, আমি তো আছি !

কৃশানুর উপেক্ষিত যৌবনের ইতিকথায় তার অজান্তেই এনেছে ইভা প্রথম প্রেমের স্পর্শ—ওর প্রাণপদ্মের পাপড়ি দল মেলেছে সূর্যোদয়ের প্রথম আলোকস্পর্শের ছোঁওয়ায়।

শুধু কি তাই ? কে বলতে পারে হয়তো ঐ স্বামীত্যক্তা মেয়েটির অনাঘ্রিতা যৌবনের পূর্বাকাশে সেও প্রথম উদয়ভানু। সুকান্তের সঙ্গে হয়তো তার মিলনই হয়নি কখনও— ! কে জানে।

তবু !

হঁ্যা, ইভা অন্যপূর্বা ! আজও সে লুকিয়ে লুকিয়ে পুডিং তৈরী করে। ইভা আইভি নয়। সে তার নিষ্ঠাবান মাতামহীর দৌহিত্রী, তার একনিষ্ঠ মায়ের কন্যা। তাই বিন্দুমাত্র পদস্খলন সে নিজেই সহ্য করবে না। তাই আজও সে শবরীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে—যদি ফিরে আসে সুকান্ত। শ্রীরামপুরের বনেদী জমিদারবাড়ির সেই লাজনম্র বধূটিকে—ঠিকই বলেছে ইভা—শুধু দূর থেকেই ভালোবাসা যায়। কৃশানুর নিরুদ্ধ কামনাসিন্ধু মন্থনে যে হলাহল উঠে আসবে তার প্রতিষেধক অমৃতের ঝারি হাতে ইভা কখনও উঠে আসতে পারে না। ওর রোগমুক্তির বিশল্যকরণী আর যেই এনে দিক ওকে—সে ইভা নয়। ইভা অন্তত পারবে না, পারা সম্ভব নয়। তার চেয়েও বড় কথা পারা উচিত নয় !

গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে আসে।

বর্ধমান।

অর্থাৎ প্রায় দু ঘণ্টা কেটে গেছে। গাড়ি এসে প্রবেশ করে সীতাভোগ মিহিদানার ছায়াতলে। কৃশানু মুখ বাড়িয়ে একটা চা-ওয়ালাকে ডাকে। বেলা এগারটা। কিন্তু চায়ের নাকি কোন সময় নেই। অর্থাৎ সব সময়ই চায়ের সময়। দু ভাঁড় চা কেনে। ওর কার্যাবলী আইভি লক্ষ্য করছে ঠিকই পত্রিকা পড়তে পড়তে।

চা খাবেন তো? আসুন।

চায়ের ভাঁড়টা বাড়িয়ে দেয় কৃশানু।

আমায় বলছেন? অবাক হওয়ার ভান করে আইভি।

কৃশানু হেসে বলে, ঘরে যখন তৃতীয় ব্যক্তি নেই, তখন আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব?

আইভি তেমনি অবাক দৃষ্টি মেলে বলে, বলেন কি! গত দু ঘণ্টা ধরেই তো ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। এতক্ষণ ধরে সব কথা আমাকেই বলছিলেন নাকি? কী কাণ্ড! আমি তো মন দিয়ে এতক্ষণ একটা কথাও শুনিনি।

এবার অবাক হওয়ার পালা কৃশানুর: গত দু ঘণ্টা ধরে আমি কথা বলেছি?

বলেন কি? বিড়বিড় করে কত কিছু বলে চলেছেন। কখনও ধমক দিচ্ছেন, কখনও হাসছেন, কখনও ছোটছেলেরা যেমন দেয়ালা দেখে চমকে চমকে ওঠে তেমনি চমকে উঠছেন।

কৃশানু লজ্জা পায়, বলে, আপনি এতক্ষণ তাহলে কিছু বলেননি কেন?

নির্জন ঘরে কোন অনাত্মীয়া মহিলার সঙ্গে বাক্যালাপ আপনি হয়তো পছন্দ করবেন না ভেবে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, ওর দুর্বলতার কথা কিছুটা জেনেছে আইভি। সম্ভবত তার দিদির কাছ থেকে। কতটা বলেছে ইভা? ইভাই বলেছে তো? না কি আইভি আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ছে ওর লাজুক প্রকৃতিকে ব্যঙ্গ করে? তাই নিঃসংশয় হবার জন্য বলে, আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা হল কেন আপনার?

আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে-আসা কোন এক হতভাগিনীর কাছেই শুনেছিলাম মনে হচ্ছে।

তিনি কি এ কথা বলেননি যে তাঁর বন্ধুত্ব আমি স্বীকার করে নিয়েছি?

এবার আর অভিনয় নয়। সত্যিই অবাক হয়ে আইভি বলে, কই, না তো!

হেসে কৃশানু বলে, ভাগ্যে আপনি জজসাহেব হননি। যে ভাবে এক পক্ষের সওয়াল শুনে রায় দেওয়ার অভ্যাস আপনার, তাতে সব মামলাই ফেঁসে যেত। নিন, ধরুন।

আইভি হাত বাড়িয়ে চায়ের ভাঁড়টা নেয়। একটা নয়, দুটোই। জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। বলে, কি বলে এই অখাদ্য পাঁচনগুলো খেতে চাইছেন আর খাওয়াতে চাইছেন আমাকে?

নিজেই সে উঠে যায় দরজার কাছে। রেলওয়ে ক্যাটারিঙের একজন তকমা-আঁটা বয়কে ডেকে এক পট চা আর দুটো টোস্ট অর্ডার করে। একটু পরেই ঝকঝকে প্লেটে করে চা-খাবার দিয়ে যায় বেয়ারা। বোলপুরে নিয়ে যাবে এসে। তখন লাঞ্চ সার্ভ করার অগ্রিম অর্ডারও লিখে নিল। নিপুণ হাতে টোস্টের ওপর মাখন লাগাতে লাগাতে চটুল ভঙ্গি করে আইভি বলে, বেশ, আপনার তরফের সওয়ালটাও শুনি।

কৃশানু কোন কথা বলে না। এই সামান্য ঘটনাটায় সে যেন বেশ বড় রকম একটা ধাক্কা খেয়েছে। খোলা মন নিয়ে সে এসেছিল আইভির সঙ্গে আলাপ করতে, বন্ধুত্ব করতে। কিন্তু সে মন ওর ভেঙে গেল এই ছোট ঘটনাটায়। ওর মনে হল এই মেয়েটি কোনদিন এসে দাঁড়াতে পারবে না ওর পাশে। জোর করে ওদের মেলানো যাবে না। সে মিলের মধ্যে লেগে থাকবে নিত্য অশান্তি। ওরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া, দেখতে একরকম হলে কি হবে। পোড়ামাটির ভাঁড় আর চীনে মাটির কাপ যেন। আগুনের তাপে পোড়-খাওয়া মাটির ভাঁড়কে রাখা যায় না ফুলকাটা শৌখিন চীনেমাটির কাপের পাশে।

কি হল? আপনি যে কোন জবাব দিলেন না?

কিসের, কি জবাব দেব?

কেউ বন্ধুত্ব করতে এলে আপনি মুখ ফিরিয়ে থাকেন কি না।

মুখ ফিরিয়ে থাকব কেন?

ফিরিয়ে না থাকুন, গোমড়া করে তো থাকেন।

সেটা আমার দোষ নয়, আমার স্রষ্টিকর্তার।

তার মানে আপনার এই গম্ভীর মুখ সত্ত্বেও আমাকে ধরে নিতে হবে যে,

ইচ্ছে হলে আপনার সঙ্গে এ দীর্ঘ যাত্রায় দু একটা কথা বলতে পারি আমি। সারাক্ষণ আমার মুখ বুজে না থাকলেও চলবে ?

নিশ্চয়। আপনাকে সঙ্গ দেবার জন্যেই আপনার বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন।

লেট এলোন মাই ফাদার!—হঠাৎ ধমকে ওঠে আইভি। যেন কৃশানু এই মাত্র ওর বাপ তুলে গাল দিয়েছে একটা।

চমকে ওঠে কৃশানু। সেটা লক্ষ্য করে মেয়েটি। নিজের এই হঠাৎ রুক্ষস্বরে যেন লজ্জিত হয়ে নরম স্বরে বলে, বলছিলুম, বাবার হুকুমে এসকর্ট করা যায়, সঙ্গদান করা যায় না—যদি না নিজের কোন তাগিদ থাকে।

এ মেয়েও যে লজ্জা পেতে জানে, এটা বোধ করি জানা ছিল না। কৃশানু তাই উপভোগ করে ওর লজ্জা পাওয়ার অভিব্যক্তিটা; হেসে বলে, নিজের তাগিদ আছে কিনা, তা তো পরখই করলেন না, তখন থেকে শুধু ধমকই দিচ্ছেন।

আইভি হাসলে। কাপে লিকার ঢালতে ঢালতে বলে, পরখ করে দেখতে অবশ্য পারি। কিন্তু আমি ইভা নই। তাই কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এলে আমি আপনি-আজ্ঞে করতে পারি না।

বেশ তো, না হয় তুমিই বলবেন।

তাই কি পারি, যতক্ষণ না অপর পক্ষও নেমে আসছে আমার সমতলে! বলে আইভি ধূমায়িত চায়ের কাপটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে কৃশানু বলে, বেশ, তুমিই বলছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথমেই তোমাকে একটা কটু কথা বলতে হচ্ছে। চা তুমি ভাল করতে জান না, চায়ে চিনি কম হয়েছে।

আইভি ছেলেমানুষের মত ঠোঁট উলটে বলে, দুর্ভাগ্য শুধু তোমার নয় কৃশানু, আমারও। তাই একটা কটু কথা দিয়ে শুরু করতে হচ্ছে এই 'তুমি' পর্যায়ের আলাপ। চা তুমি খেতে শেখনি। চা-খোরদের দায়িত্ব শুধু চুমুক দেওয়াতেই নয়, নিজ রুচি অনুযায়ী চিনি মিশিয়ে নেওয়াতেও। তোমার কাপে চিনি কম নয়, দেওয়াই হয়নি।

'থ্যাঙ্ক' বলে কৃশানু সুগার পটটা টেনে নিতে নিতে।

থ্যাঙ্ক-য়ু নয়—থ্যাঙ্কস, একাধিক ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য। প্রথমতঃ চা করে দিলাম, দ্বিতীয়তঃ চা খাওয়ার আধুনিক এটিকেট শেখালাম।

ক্রমশঃ বেশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে ওদের বন্ধুত্ব। কৃশানু লক্ষ্য করে

সে কোন জড়তা বোধ করছে না। হাসি-ঠাট্টা মস্করায় বেশ তাল দিয়ে যাচ্ছে। পায়ের পাতা থেকে ওঠা সেই সিরসিরানিটার কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। অসুখটা ওর সেরে গেছে নাকি? ধুয়ে গেছে গঙ্গার জোয়ারে? শেয়ালদা স্টেশানে এ ঘরের নিজনতাটাকে ও ঠিক বরদাস্ত করতে পারেনি, মনে হয়েছিল কামরাটায় আরও দু একজন যাত্রী থাকলে যেন ভাল হত। তখন কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল মনে মনে। আশা করেছিল অন্তত বর্ধমানে নিশ্চয় কেউ উঠবে ওদের কামরায়। এখন সে এতটা সহজ হয়ে উঠেছে যে বর্ধমান স্টেশান ছেড়ে কখন আবার দুটি যাত্রীকে নিয়ে রওনা হয়েছে ট্রেনেব সাথে এ কামবাটা তা খেয়ালই হয়নি। কথা প্রসঙ্গে কৃশানু বলে, তোমাকে একটা অভিনন্দন জানানো হয়নি।

অভিনন্দন কিসের?

ইলুর কাছে কানপুরী ইণ্টারভ্যুর বিবরণ শুনলাম। তখনই মনে হয়েছিল তোমাকে একটা অভিনন্দন জানানো উচিত। ছেলেমেয়ের বিবাহ জিনিসটাকে এইসব প্রাচীনপন্থী বৃদ্ধরা—

বাধা দিয়ে আইভি বলে, বিবাহ ব্যাপারে তুমি বুঝি নব্য-পন্থী?

একেবারে। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে।

না নেই। আমি বাজি বাখতে পারি।

কৃশানু বলে, না, রেখ না, খামোখা হেরে যাবে।

যাবো না। আমি জানি তোমার কি মত।

জান? বেশ, বল।

তোমার মতে বাপ মা ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে না। তারা পছন্দ মত নিজেরাই মনের মানুষ বেছে নেবে। তাই নয়?

ঠিক তাই। তোমারও কি তাই মত নয়?

না, নয়।

তা হলে তোমার মতটা কি?

আমার মতে marriage itself is a vulger taboo! ওটা একটা কুসংস্কার।

নব্যপন্থী কৃশানু রায়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন করার অবস্থা নেই।

আইভি মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে থাকে, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত,

তাহলে বিয়ে জিনিসটাকে আমি আইন করে উঠিয়ে দিতাম। নতুন ছাঁচে ঢালতাম সমাজকে।

কৃশানু এতক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে ; বলে, সেই নতুন ছাঁচে ঢালা সমাজের একটু আভাস যদি দিতে—

তুমি সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস কর ? কম্যুনিজমে ?

ইকনমিক্সের সেরা ছাত্রটি সংক্ষেপে শুধু বলল, করি।

তুমি বিশ্বাস কর, খেতখামার কলকারখানা সব কিছুর উন্নতি ব্যাহত হয়ে আছে পুঁজিবাদীদের জন্য ? ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থা চালু থাকার জন্য ?

কৃশানু স্টেটমেণ্টটা সংশোধন করে দেয়, আমি মনে করি পুঁজিবাদ এসব অগ্রগতির অন্যতম প্রধান বাধা।

তাহলে আমার থিয়োরীটা এখন মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা কর।

আইভি বলতে থাকে তার উর্বর মস্তিষ্কের নয়া আবিষ্কারের থিসিস্। সে সমাজতন্ত্রবাদের একজন গোঁড়া সমর্থক। কম্যুনিজম আমাদের ব্যক্তিগত মালিকানার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছে—ধর্মের আফিং-খাওয়া নেশার হাত থেকে মুক্ত করেছে সমাজকে। আইভি কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট নয়। ব্যক্তিগত ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা যদি যৌথ হতে পারে তবে যৌথ সংসারই বা হবে না কেন ? কোন একটি বিশেষ নারীর উপর কোন একটি পুরুষের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া হবে কেন ? ক্ষেত-খামার শস্য দেয়, কল-কারখানা দেয় ফিনিস্‌ড প্রডাক্টস্—সবাই তা ভাগ করে নেয় যৌথ কারবারে। নারীও একটি মেশিন—মানব-শিশু প্রজননের যন্ত্র। তার উপর সমাজের যৌথ দাবী থাকার ব্যবস্থা কেন হবে না ?

বাধা দিয়ে কৃশানু বলে, তা কেমন করে হবে ? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি সুনির্দিষ্ট না থাকে তাহলে পিতৃপরিচয় দেবে কেমন করে ভবিষ্যৎ যুগের মানুষ ?

আইভি অম্লানবদনে বলে, দেবে না। পিতৃপরিচয় কথাটা তো একটা taboo ! গোত্রের মত, জাতের মত, কালার-ক্রীডের মত ! তখন কেউ বলবে না আমি অমুক লোকের ছেলে—বলবে আমি অমুক গাঁয়ের ছেলে।

কিন্তু শৈশবে কে তাকে পালন করবে ? বাপের যদি ঠিক না থাকে তবে বাপের দায়িত্বেরও তো ঠিক থাকবে না।

দায়িত্ব স্টেটের—প্রাথমিক দায়িত্ব যে যৌথ পরিবারের সন্তান সেই

কোয়াপারেটিভ সোসাইটির। মাতৃসদন থেকে শিশুরা যাবে নার্সারীতে; সেখান থেকে স্কুলে, কলেজে, য়ুনিভার্সিটিতে—ক্রমে কর্মক্ষেত্রে। পিতৃপরিচয় কপালে এঁটে যাবে না। এখনও একদল অনাথ আশ্রমের ছেলেরা এমনি করে মানুষ হয়ে ওঠে—তাদের পিতৃপবিচয় থাকে না। পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষীর পিতৃপরিচয় নেই। তাতে তাঁদের বড় হতে বাধেনি। বাধা হয় বিয়ে করতে কারণ আর পাঁচজন তাদের মত পিতৃপরিচয়হীন নয় বলে।

কৃশানু ধমক দিয়ে বলে, তোমার এই থিয়োরীটাই ভালগার!

তোমার তাই মনে হচ্ছে কারণ তুমি একটা সেট্-আইডিয়া নিয়ে থিয়োরীটা বিচার করছ। সংস্কারমুক্ত বিচারশক্তি নেই তোমার। একটা পূর্ব-সংস্কারের ইয়ার্ড-স্টিকে মাপতে চাইছ আমার থিসিসকে। সেই মাপকাঠিটা বাঁকা—সেটা আমার থিয়োরীর দোষ নয়।

উত্তেজিতভাবে কৃশানু বলে, তুমি বলছ কি! হাজার হাজার বছরের এই সমাজ-ব্যবস্থা, দেশ-কাল-ভৌগোলিক ব্যবধান অতিক্রম করে মেনে নেওয়া সর্বজনস্বীকৃত স্বামী-স্ত্রীব সম্পর্ক তুমি এক তুড়িতে উড়িয়ে দিতে চাও?

আইভি বলে, উত্তেজিত হলে বিচার করা যায় না। যুক্তি দিয়ে তর্ক কর। প্রমাণ কর আমার যুক্তিতে গলদ আছে। প্রথমত হাজার হাজার বছর কোন নিয়ম চললেই প্রমাণ হয়না সেটা সুনিয়ম। নিকোবারে, আফ্রিকায় আর প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপপুঞ্জে ক্যানিবলেরা মানুষ খায়। ওদের সমাজব্যবস্থাও হাজার হাজার বছরের পুরনো, আর্য সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন তাদের ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত পেট্রিয়ারক্যাল ফ্যামিলির এ ব্যবস্থা খুব কিছু প্রাচীন নয়। বড়জোর দশ কি পনের হাজার বছরের পুরাতন। তার আগেব লাখখানেক বছর পিতৃপরিচয় বলে কোন কিছু ছিল না মানুষের ইতিহাসে। তখন স্বামী-স্ত্রী বলে কোন কিছু ছিল না—ছিল নারী ও পুরুষ। সুতরাং সময়ের দীর্ঘতাই যদি একটি ব্যবস্থার ভালমন্দের মাপকাঠি হয় তোমার মতে, তাহলে আমার মতটাই ভাল বলে প্রমাণিত হচ্ছে নাকি?

তুমি কি সেই অসভ্য যুগে ফিরে যেতে বলছ মনুষ্য সমাজকে?

অসভ্য কথাটায় আমার আপত্তি আছে। আমি বলছি প্রাচীনযুগের সেই সমাজ-ব্যবস্থাটাই আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া উচিত।

কেন, অসভ্য কথাটায় তোমার আপত্তি কিসের?

সভ্যতার সংজ্ঞা কি তোমার মতে?

কৃশাহু রাগ করে বলে, সভ্যতা শব্দটা এমন কিছু আপেক্ষিক নয় যে তুমি আর আমি তার ভিন্ন অর্থ করব। সভ্যতার সংজ্ঞা একটাই।

আইভি অনেক কিছু জানে না। রাঁধতে জানে না, শেলাই করতে জানে না, মশারী টাঙাতে জানে না, কিন্তু অন্তত একটি জিনিস সে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে জানে—তর্ক করা। এমন আটঘাট বেঁধে স্থির মস্তিষ্কে তর্ক করে যে ওদের শিক্ষায়তনের বড় একটা কেউ ওব সঙ্গে তর্ক করতে ভেড়ে না। আইভি একটু হেসে বলে, তবু তর্কশাস্ত্র বলে বিচার্যবিষয়ে ব্যবহৃত শব্দগুলির সংজ্ঞা আগে নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত। সভ্যতার সংজ্ঞা হিসাবে আমি যদি শচীশের জ্যেঠামশাই জগমোহনবাবুর দেওয়া ডেফিনিসানটা ব্যবহার করি তুমি আপত্তি করবে?

জগমোহনবাবু কে? তাঁব ডেফিনিসানটাই বা কি?

সভ্যতা হচ্ছে প্রচুবতর লোকের প্রভুততম সুখসাধনের সুব্যবস্থা।

মেনে নিলাম।

বেশ, তা হলে গান পাউডার, ডিনামাইট, এ্যাটমিক এনার্জিব আবিষ্কারকে তুমি কি বলবে? সভ্যতার অগ্রগতি?

একটু ভেবে নিয়ে কৃশাহু সাবধানে বলে, নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি নয়।

আর ক্যামেরা, টেলিভিসান, রেডিওব আবিষ্কাবকে?

নিঃসংশয়ে সভ্যতাব অগ্রগতি বলব। কেন, তুমি বল না?

না।

কেন নয়? রেডিও আবিষ্কৃত হওয়াতে কত সহস্র লোকের সুবিধা হয়েছে। যেসব কথা, যেসব গান, বক্তৃতা, বানিং কমেণ্টারি তারা কিছুতেই শুনতে পেত না, সেগুলো শুনতে পাচ্ছে—এটা সভ্যতার অগ্রগতি নয়?

সভ্যতার পূর্ব স্বীকৃত সংজ্ঞা হিসাবে নিশ্চয়ই নয়—

কেন নয়?

আমি যদি বলি ভারতবর্ষের বারো আনা লোক জানে না রেডিও কি বস্তু, শতকরা চব্বিশজন জানে রেডিও কি, আর শতকরা একজনের রেডিও আছে তা হলে কি খুব বেহিসাবী কথা বলা হয়?

কি জানি, আমার ধারণা নেই।

ধারণা না থাকলেও আমি বোধ হয় খুব কিছু ভুল বলিনি। তাহলে দেখ

রেডিওর আবিষ্কার শতকরা একজনকে দিয়েছে আনন্দ, আর চব্বিশজনকে দিয়েছে রেডিও না থাকার দুঃখ। বাকি বারো আনা লোকের অবশ্য এ আবিষ্কারে কোন লাভ ক্ষতি হয়নি। রেডিওযন্ত্র যদি আবিষ্কার না হত তাহলে বস্তুত এই চব্বিশজনের কোন দুঃখ থাকত না। শতকরা ঐ একজনেরও কোন ক্ষতি হত না, কারণ তাদের কোন খেদ থাকত না। চাঁদে যেতে পারছি না বলে আজ তোমার আমার মনে যেমন কোন খেদ নেই। আজ থেকে একশ বছর পরে হয়তো অনেকেই সে দুঃখ পাবে যখন তার প্রতিবেশীকে চন্দ্রমুখী রকেটে রওনা হতে দেখবে।

কৃশানু বিরক্ত হয়ে বলে এ তো শুধু তর্কের ঝোঁকে তর্ক করছ তুমি।

মোটেই না। একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝবে আমার একটা কথাও অযৌক্তিক নয়। তুমি যাকে সভ্যতা বলছ তা প্রচুরতর লোককে এনে দিয়েছে শুধু প্রভূততর অভাববোধ। জটিল করে তুলেছে জীবনকে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদটা শুধু বাড়িয়ে তুলেছে। মিল-মালিক আর মিল-শ্রমিকের জীবন-যাত্রায় যে প্রভেদ সেটা ছিল নিওলিথিক যুগের যে-কোন দুটি মানুষের জীবনযাত্রায় অচিন্তনীয়। তোমার সভ্যতা মিলিয়ানে একজনকে করেছে মিলিওনেয়ার—প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে সেই সৌভাগ্যবানকে, বিনিময়ে ন লক্ষ নিরানব্বই হাজার ন শো নিরানব্বই জনকে পীড়িত করেছে অসংখ্য অভাববোধের যন্ত্রণায়। তুমি যাকে অসভ্যযুগ বলছ, মানে আমি যাকে প্রাচীনযুগ বলছি, সে যুগে অধিকাংশ মানুষের এ দুঃখ ছিল না—কাঁচি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মত তারা জানত না তারা কি পায়নি। কিন্তু আমাদের মূল তর্কের বিষয় ছিল 'বিবাহ' প্রথাটা বহুল ও দীর্ঘকাল প্রচলিত একটা কুসংস্কার কি না।

এ তর্কের কচকচি আর ভাল লাগছিল না, কৃশানুর। সে হেসে বললে, নিশ্চয় কুসংস্কার। মেয়েদের সতীত্ব জিনিসটাও একটা কুসংস্কার তা হলে?

আইভি কিন্তু হাসে না, জোর দিয়ে বলে, নয় কি? সতীত্বের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করলে তুমি চটে যাবে, কিন্তু ভেবে দেখ কথাটার কোন মানে হয়? চুমু খেলে বাংলা সিনেমার সতীত্ব হানি হয়, ইংরাজি ছবির হয় না। আয়নার ভিতর দিয়ে মুখ দেখালেও হানি হয় পদ্মিনীর, পঁচিশবার ডিভোর্স করলেও হয় না কোন হলিউড স্টারের! সতীত্ব একটা টাবু নয়?

এবার বিরক্তি স্বীকারই করে বসে কৃশানু, এ আলোচনা আমার আর ভাল লাগছে না।

তার কারণ তোমার দীর্ঘদিনের সংস্কারে আঘাত লাগছে। আরও কারণ হচ্ছে যুক্তি দিয়ে তুমি আমার মতকে খণ্ডন করতে পারছ না।

কৃশানু রাগ করে বলে, সে জন্যে নয়, আমার খারাপ লাগছে এই জন্যে যে, যে কথা তুমি মানো না—শুধু তর্কের খাতিরে তাই বলে চলেছ বলে।

আমি মানি না কেমন করে জানলে?

তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তাহলে তুমি সেটাকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না?

নিশ্চয়ই করব। তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হলে করব না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কৃশানু বলে, প্রচলিত বিবাহ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তোমার এ জেহাদের কারণটা কি?

ব্যক্তিগত মালিকানা আমি পছন্দ করি না বলে। রামবাবুর স্ত্রী শ্যামবাবুকে ভালবাসেন, তবু তিনি শ্যামবাবুর ঘরে শুতে যেতে পারেন না। কেন? না স্ত্রীর উপর রামবাবুর মনোপলি কারবার।

কেন? সে ক্ষেত্রে রামবাবুর স্ত্রী তো বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনতে পারেন।

পারেন না। কারণ ক্যাপিটালিস্ট রামবাবু আইন বাঁচিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা করছেন। স্ত্রীকে ধরে মারেন কিনা তার সাক্ষী নেই, না খাইয়ে রাখেন কিনা তার প্রমাণ নেই। অন্য স্ত্রীলোকের ঘরে যেদিন রাত্রিবাস করেন সেদিন রাত্রে বাড়িতে থাকার সাজানো এ্যালেবাই রেখে যান। ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, আদালত বিবাহবিচ্ছেদ মেনে নিলেও সমাজ নেয়নি। তৃতীয়ত, হয়তো রামবাবুর স্ত্রী সত্যই চিরদিনের জন্য ঠাঁই বদল করতে চান না। হয়তো রামবাবু বড়লোক, শ্যামবাবু ভবঘুরে আর্টিস্ট।

অর্থাৎ মিসেস রাম গাছেরও খেতে চান, তলারও কুড়াতে চান।

ঠিক তাই। আমার ইউটোপিয়ান সমাজ-ব্যবস্থায় সেটা সম্ভব।

কৃশানু জোর দিয়ে বলে, শুধু সম্ভব হলেই তো চলবে না, দেখতে হবে সেটা বাঞ্ছনীয় কি না। রামবাবুর ব্যভিচারিণী স্ত্রীর এ কদর্য বাসনায় ইন্ধন যোগানো আদৌ উচিত কিনা সেটাও ভেবে দেখতে হবে।

ব্যভিচারিণী আর কদর্য বিশেষণ দুটো তুমি তোমার অন্ধ সংস্কারের

জন্যেই ব্যবহার করেছ। সংস্কার-মুক্ত হলে দেখতে এটা খুবই স্বাভাবিক একটা জৈব প্রেরণা, খিদে পাওয়া, তেষ্টা পাওয়া অথবা ঘুম পাওয়ার মত।

কিন্তু রামবাবুর স্ত্রীকে এ ক্ষেত্রে খাওয়াবে কে? ভরণ-পোষণ করবে কে?

যখন যার কাছে থাকবে তখন সেই। কেউ না থাকলে স্টেট। বিনিময়ে মেয়েটি তার শ্রমদান করবে। এ মাসে রাম, ও মাসে শ্যাম, পরের বছর হয়তো যদুবাবুর সংসারযাত্রা নির্বাহ করবে। লোকে যেমন বাটলার রাখে, সেক্রেটারী রাখে তেমনি স্ত্রীর সঙ্গে একটা কণ্ট্রাক্ট করবে।

কৃশানুর গায়ের মধ্যে কেমন যেন ঘিন্‌ঘিন্‌ করে ওঠে। বলে, এ আলোচনা বন্ধ কর বাপু। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

সে কথা তুমি আগেও একবার বলেছ। হয়তো জেনারালাইস করাতে তোমার সংস্কারে বাধছে। স্পেসিফিক হলে এটাকেই কাব্য বলে মনে হত। আমার একটি বান্ধবীর কথা বলি। স্বামী তাকে নেয় না—ওদের মতের মিল হয়নি, আলাদা থাকে। বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে উঠছে না নানা কারণে। আমি জানি একফোঁটা ভালবাসা পাওয়ার জন্য কাঙাল হয়ে আছে তার মন, তার উপেক্ষিত অনাদ্রিত যৌবন বিদায় নিচ্ছে তিলে তিলে। এমন সময়ে সে হঠাৎ একটি ছেলেকে ভালবাসল। অথচ মুখ ফুটে সে কথা সে স্বীকার করতে পারল না। তুমি কি চাও গুমরে গুমরে কেঁদে মরুক সে সারা জীবন?

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে কৃশানুর। কার কথা বলছে আইভি? কি বলতে চায় সে?

ভাগ্যক্রমে ট্রেনটা বোলপুরে এসে পৌছনোতে ছেদ পড়ল এ প্রসঙ্গে। বয় এসে প্লেটগুলো নিয়ে যায়। লাঞ্চ আসে পরিবর্তে। স্টেনলেস-স্টীলের ছোট ছোট বাটিতে থালা দুটি সাজানো। গদির ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে ওরা আহারে বসল। সৌভাগ্যই বলতে হবে কৃশানুর ট্রেনে এলেন নতুন একজন যাত্রী। একজন বিদেশী মহিলা। সম্ভবত য়ুরোপীয়, আমেরিকানও হতে পারেন, নিঃসন্দেহে টুরিস্ট। এখান থেকে যখন উঠছেন তখন নিশ্চয় শান্তিনিকেতন দেখতে এসেছিলেন। মালপত্র বাঙ্কে গুছিয়ে দিয়ে পয়সা নিয়ে কুলিটা চলে গেল। মহিলা বৃদ্ধা, ঈষৎ স্থূলকায়া। ওদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বসলেন বেঞ্চের একপ্রান্তে। কৃশানু ইংরেজিতে প্রশ্ন করে, কেমন দেখলেন শান্তিনিকেতন?

ভদ্রমহিলা একগাল হেসে বলেন, ইয়েস।

কৃশানু হকচকিয়ে যায়। ভদ্রমহিলা কানে খাটো নাকি? তাই এবার একটু উচ্চতরকণ্ঠেই প্রশ্ন করে, গোয়িং ফার?

এবারও একগাল হেসে উনি বলেন, ভেরি নাইস।

কৃশানুর কণ্ঠরোধ হলে কি হবে, খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছে এবার আইভি। বিদেশিনীও অপ্রস্তুতের একশেষ। তাড়াতাড়ি কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, নো ইংলিশ।

কৃশানু মনে মনে বলে, সেকথা এখন বলা বাহুল্য।

আইভি কিন্তু হাল ছাড়ে না। ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন করে, ফ্রেঞ্চ জানেন?

বুড়ি মেম একেবারে লাফিয়ে ওঠে। জড়িয়ে ধরে আইভিকে। বেচারি আজ একমাস যাবৎ মন খুলে কথা বলতে পারেনি সেই দিল্লী কনস্যুলেট অফিস ছাড়ার পর থেকে। আইভিকে একেবারে গ্রাস করল বুড়ি মেম। আইভিও ফরাসী বলার লোক পায় না। কথিত ভাষাটা অভ্যাস নেই ওর, উচ্চারণ এবং ব্যাকরণও হয়তো নির্ভুল নয়; কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না আলাপে। অনর্গল দুজনে বকতে থাকে। বুড়ি মেমই কথা বলে বেশী। কৃশানু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। আরও খুশী হল বাঙ্কের উপরে রাখা মেমের ট্রাঙ্কের দিকে নজর পড়ায়। লেবেল আঁটা আছে—মেম দার্জিলিঙের যাত্রী। অর্থাৎ আজ রাত্রে এই নিরালা কামরায় একটি অতি আধুনিকা তরুণীর সঙ্গে সতীত্বের সংজ্ঞা নিয়ে আর তাকে তর্ক করতে হবেনা। ওর কণ্টকিত মন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

আরও কয়েক ঘণ্টা নির্বিঘ্নে কেটে গেল। তিন পাহাড় স্টেশানটা পার হওয়ার সময় সে একবার আইভির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল অদূরবর্তী পাহাড়ের তিনটি চূড়ার দিকে—কিন্তু ওরা তখন ফরাসী সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মিল খুঁজতে ব্যস্ত।

হঠাৎ একসময় আইভি বলে, তোমার স্কেচবুকটা এনেছ তো, দেখি।

কৃশানু অবাক হয়ে বলে, স্কেচবুক! তুমি কি করে জানলে সে কথা?

বাজে কথা বল না। স্কেচবুকটা বার কর। এ ভদ্রমহিলার নাম মাদাম সার্লট রচেস্টার। একটা ফ্রেঞ্চ জার্নালের ইনি আর্ট ক্রিটিক।

আইভির উপরোধে অগত্যা বার করতে হল ছবির খাতাখানা। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দেখলেন ছবিগুলি। খুব খুশী হলেন। একটা সাপুড়ের

স্কেচ-চিত্র ওঁর খুব ভাল লাগল। বারে বারে সেটার প্রশংসা করলেন। আইভি বলে, এটা ওঁকে উপহার দাও না কৃশানু।

আমার আপত্তি নেই।

ছবি পেয়ে বুড়ি মেম তো ভারী খুশী, বলে, আর্টিস্টকে নাম সই করে দিতে হবে। কৃশানু তাই দিল। আরও খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর গাড়ি এসে পৌছাল সকরিগলিঘাটে।

নৈশ আহার স্টীমারেই সারল ওরা। তারপরে ওপারে পৌছে মনিহারীঘাট থেকে আবার নতুন গাড়ি। কৃশানু তিনটে কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে আগে গিয়ে পৌছল। মালপত্র সাজিয়ে নিতে নিতেই আইভিরা এসে গেল। বুড়ি মেমের কি মতিচ্ছন্ন হল, কিছুতেই রাজি হল না ওদের সঙ্গে এক কামরায় যেতে। কৃশানু বারে বারে প্রতিবাদ করল অঙ্গভঙ্গি করে, আইভিকে দিয়েও বলালো, কিন্তু মেম নাছোড়বান্দা। আবার কুলি ডেকে তার মালপত্র বার করে চলে গেল পাশের একটা কামরায়। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যে হয়। আবার দুজনে এক কামরার নির্জনে। কৃশানু কি করবে ভেবে পায় না। অসহায়ের মত বলে, ম্যাডাম রচেস্টার আমাদের ওপর চটে গেলেন কেন বল তো?

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আইভি মুখটা মেরামত করছিল, মুচকি হেসে বলে, কি জানি!

কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে? শেষ মুহূর্তে এক মাড়বারী ব্যবসায়ী এসে উঠলেন ওদের কামরায়। চতুর্থ বার্থ টা খালিই পড়ে রইল। কৃশানুর মনে হল আইভি যেন আশাহত হয়েছে। মাড়বার-তনয় উপরের বার্থে নিজের বিছানাটা বিছাতে থাকেন। গাড়ি ছাড়ল। আইভি বাথরুমে গেল বেশ বদলাতে—নৈশ পোশাক পরতে। আইভির বিছানায় পড়েছিল একখানা পত্রিকা। সময় কাটাবার জন্য সেটা হাতে তুলে নিয়ে কৃশানু দেখে, সেটা ইংরেজি মাসিক নয়, ফরাসী ম্যাগাজিন—চিত্রবহুল। অন্যমনস্কের মত প্রথম পাতাটা খুলেই চমকে ওঠে। পৃষ্ঠার মাথায় লেখা আছে—টু মিসেস কে. রয়, নীচে রচেস্টারের সই আর আজকের তারিখ।

রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যায়। একটা নিরুদ্ধ রাগে ফুলতে থাকে কৃশানু। তাই ম্যাডাম রচেস্টার ওদের ছেড়ে অন্য কামরায় গিয়ে উঠল। কিন্তু এ মিথ্যাচরণ কেন করল আইভি? কি চেয়েছিল সে? নির্জন ঘরে কৃশানুর

সঙ্গে রাত্রিটা কাটাতে ? তার মানে— ? সত্যিই কি সে পাপপুণ্য মানে না ? সতীত্বধর্ম স্বীকার করে না !

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আইভি দেখল, কৃশানু ঘুমিয়ে পড়েছে নিজের বিছানায়।

সারারাত ঘুম হল না কৃশানুর। শুধু এপাশ ওপাশ করল। ওর মনে হল আইভিও ঘুমতে পারছে না। এপাশ ওপাশ করছে বারে বারে। মাড়বারী ভদ্রলোক অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ভোর রাতে ওর মধ্যেই কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কে তাকে ঠেলা দেওয়ায় কৃশানু উঠে বসে, দেখে আইভি ওকে ডাকছে। আইভির পরণে একটা ঢিলে স্ল্যাকস, পায়ে চপ্পল, মাথায় একটা রেশমী রুমাল বাঁধা, চিবুকের নীচে গিঁট দেওয়া। কৃশানু চোখ মেলে দেখে, ঘরে মাড়বারী ভদ্রলোক নেই। ভোর হয়ে গেছে। ঘরের ভিতরের সবুজ আলোটা ম্লান হয়ে আসছে বাইরের আলোর ক্রমঔজ্জ্বল্যে। আইভি ওকে জানলার বাইরে তাকাতে বলল।

অপূর্ব দৃশ্য, তুষারকিরীট পর্বতশ্রেণী রাতারাতি মাথা তুলে জেগে উঠেছে দিগন্তের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। পূব আকাশটা লালে লাল। এখনও সূর্যোদয় অবশ্য হয়নি। ঠাণ্ডা একটা বাতাস বইছে কাচ-তোলা খোলা জানলা দিয়ে। এমন একটি নিষ্কলুষ প্রভাত আসেনি কৃশানুর জীবনে, কিন্তু ওর মনে হল, দেহমন ওর ক্লান্ত, ভারাক্রান্ত।

আইভির রসবোধকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল, অহেতুক বকবক না করে শান্তভাবে সে বসে আছে জানলার ধারে।

কেমন যেন আলিস্যি লাগছে, মুখ ধুতে যেতেও ইচ্ছে করছে না। কৃশানুও নিশ্চুপ গিয়ে বসল জানলার ধারে। হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল তার। প্রশ্ন করল, কটা বাজে ?

সওয়া পাঁচটা।

মনে মনে হাসল কৃশানু। আজ বুধবার, তেরই আশ্বিন অর্থাৎ পয়লা সেপ্টেম্বর, এখন সওয়া পাঁচটা !

ট্রেনজার্নি-ক্লান্ত আইভির মুখখানা দেখতে দেখতে ওর মনে ফুটে উঠল আর একখানি মুখ। আর একটি মেয়ে। হাওড়া স্টেশনে হুইলারের স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একা। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে আছে। হাতে

একগুচ্ছ রজনীগন্ধা—বিষণ্ণ, ম্লান। পরনে ওর ধূপছায়া রঙের একখানা ঢাকাই শাড়ি, কপালে টিপ।

কিন্তু তা কেমন করে হবে? স্বাহার তো ডীপ নীল রঙের একটা ক্রেপ সিল্ক পরে আসার কথা। তাহলে ওর মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠা এ মেয়েটি কে?

কাল সারারাত তোমার ঘুম হয়নি, নয়? আইভি প্রশ্ন করে।

না, একেবারে ভোর রাতে একটু ঘুম এসেছিল। এ ভদ্রলোক কখন নেমে গেলেন?

এই মাত্র।

আমার যে সারারাত ঘুম হয়নি তা জানলে কি করে?

আমারও যে ঘুম হয়নি।

কেন ঘুম হল না বল তো আমাদেব?

আইভি একটু চুপ করে থেকে বলে, তোমার কেন হল না জানি না, আমার হল না নিজের পাপে।

তুমি পাপপুণ্য মান তাহলে?

আইভি হেসে বলে, সে কথা আলোচনা করতে হলে প্রথমে পাপপুণ্য বলতে তুমি কি বোঝ তা জানতে হয়।

কৃশানুও হেসে বলে, অর্থাৎ পাপপুণ্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হয়।

ঠিক তাই। কিন্তু তাহলে তুমি চটে যাবে, তাই 'পাপ' কথাটা উইথড্র করে আমি বলব নিজের দোষে।

নিজের কি দোষে?

কাল একটা অন্যায় করেছিলাম, জানলে। ওই ফরাসী ভদ্রমহিলাটি আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে ভুল করেছিলেন। তাঁর সে ভুলটা আমি ভেঙে দিইনি।

আমি জানতাম।

আইভি চমকে উঠে বলে, জানতে? বাজে কথা। কেমন করে জানতে?

ভদ্রমহিলার ভাবগতিক দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার, নিঃসন্দেহ হলাম ঐ ম্যাগাজিনটা দেখে।

আইভি চমকে ওঠে, বিছানার উপর পড়ে থাকা মাসিক পত্রিকাটির দিকে একনজর দেখে নিয়ে বলে, কিন্তু তুমি তো ওটা দেখনি।

দেখেছি। তখন তুমি বাথরুমে ছিলে।

আইভি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নীচু গলায় বলে, কই, তুমি তো কিছু বলনি।

বলব আবার কি?

এমন মিথ্যা কথা কেন বললাম আমি, তা জানতে?

কৃশানু তেমনি নির্বিকারভাবে বলে, প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিল না, কারণটাও আমি জানতাম।

ধক্ করে জ্বলে ওঠে আইভির চোখ দুটো। উত্তেজিত হয়ে বলে, মানে? কি জানতে তুমি?

কৃশানু দৃঢ়স্বরে বলে, এ আলোচনা থাক আইভি। তুমি অনেক কিছু মান না—যা আমি মেনে থাকি। ভারতীয় হিন্দু নারীর সম্বন্ধে আমার মনে একটা পবিত্র ধারণা আছে; সেটা তুমি নাইবা ভেঙে দিলে।

হঠাৎ কি যেন হল আইভির। একেবারে চুপ করে গেল। সামান্য কটা কথা, কিন্তু মনে হল সে যেন প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়েছে এ কথায়। মুখরা আইভি মূক হয়ে গেল মুহূর্তে। জানলা দিয়ে পূর্বদিগন্তের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে।

কৃশানু লক্ষ্য করে, দিনের প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়েছে আইভির কপালে। রেশমী রুমালের ফাঁক দিয়ে উঁকি-মারা দু এক গোছা কুন্তলায়িত কুন্তলচূর্ণ উড়ছে এলোমেলো হাওয়ায়। আইভির দু চোখের কোণে চিক্‌চিক্ করছে দু বিন্দু জল—হৈমন্তী শিশরবিন্দু যেন! অছিলা হোক আর সত্যই হোক—চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়ার অজুহাতে রুমাল দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে মুছে নেয় একবার। কৃশানু দুঃখ পায়। বোঝে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত করেছে সে। হয়তো ওর অনুমান সত্য নয়। মুখে বড় বড় বুকনি দিলেও আইভি হয়তো মনে মনে এখনও কিশোরীই রয়ে গেছে। হয়তো নিছক একটা কৌতুকপ্রিয়তাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই ছেলেমানুষীতে। রচেস্টার বাংলা বোঝে না, কৃশানু বোঝে না ফ্রেঞ্চ, এই সুযোগে দুজনকে লুকিয়েই হয়তো সে একটা মজার খেলায় মেতে ছিল। আর কিছু উদ্দেশ্য হয়তো সত্যিই ছিল না তার।

ক্ষোভম্লান কণ্ঠে বলে, আমাকে মাপ কর আইভি।

রুমাল দিয়ে কয়লার গুঁড়োটা বার করতে করতে আইভি বলে, মাপ চাইবার তো কিছু নেই; এ অপমান আমার প্রাপ্য।

একটু কাছে সরে এসে কৃশানু বলে, আমি বুঝতে পারিনি, একটা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তুমি বুড়ি মেমকে ঠকাতে চেয়েছিলে। তোমার আচরণের যে কদর্য ইঙ্গিত আমি করেছি নিশ্চয়ই সেটা অন্যায় হয়েছে আমার।

আইভি নতনেত্রে বলে, ভুল ধারণা তোমার। কৌতুকপ্রিয়তার জন্যে মিথ্যা কথা বলিনি আমি, আমার অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

ভ্রূ কুঁচকে কৃশানু বলে, অন্য উদ্দেশ্য ? মানে ? কি বলতে চাইছ তুমি ?

আইভি জবাব দেয় না।

রোখ চেপে যায় কৃশানুর, বলে, তুমি কি সত্যিই একটা রাত আমার সঙ্গে নির্জন ঘরে কাটাতে চেয়েছিলে ?

আশ্চর্য নির্লজ্জ মেয়েটা ! মাথা না তুলে বলে, হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ কথা খুঁজে পায় না কৃশানু। কি বলতে পারে এরপর ! আর কি বাকি রইল জানতে ? আর কি জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে ? পারলে, এখনই চেন টেনে গাড়ি থেকে নেমে যেত সে। যে নারী পাপ-পুণ্য মানে না, সতীত্ব-ধর্ম মানে না—পরপুরুষের সঙ্গে রাত্রিবাস করবার জন্য যে এমন মিথ্যা কুহক রচনা করতে পারে, আর সেকথা অকুণ্ঠস্বরে স্বীকার করতে যার বাধে না, সে তো কালসাপ ! তার সঙ্গে এক মুহূর্ত থাকতে আছে ? যে কোন মুহূর্তে ও তো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে কৃশানুর উপর তার একটা খেয়াল চরিতার্থ করতে।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে না ?

আর কি জিজ্ঞাসা করব ?

কেন একটা রাত তোমার সঙ্গে নির্জন ঘরে কাটাতে চেয়েছিলাম ?

কৃশানু প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে, প্লিস আইভি। স্টপ। সব নির্লজ্জতারই একটা সীমা থাকা উচিত।

আইভি চিৎকার করে না। শান্ত কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলে, ওয়েল, আই কাণ্ট স্টপ নাউ ! কিছু না শুনতে কথা ছিল না ; কিন্তু আধখানা শুনে যা ইচ্ছে কনক্লুশান টানতে দেব না তোমাকে। আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে। তারপর শিলিগুড়ি পৌছে তুমি অন্য ট্যাক্সি নিও, আমি বাধা দেব না।

কৃশানু কোন কথা বলে না।

জানলার বাইরে দিয়ে ঐ দূর পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে আইভি একেবারে অন্য গলায় গল্প বলার সুরে সুরু করে, আমার অনেক বন্ধু আছে, জানলে? ঘনিষ্ঠ বন্ধু সব। বয় ফ্রেণ্ড। পুরুষ-বন্ধু আমাদের হস্টেলের আরও অনেক মেয়ের দু একটি করে আছে। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠে আমার কাছে ওরা দাঁড়াতে পারে না। ওরা একসঙ্গে একটি দুটির বেশী বন্ধুর সঙ্গে মিশতে পারে না। আমার অন্তত ডজনখানেক বন্ধু আছে—তার মধ্যে জনা ছয়েকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার।

বাধা দিয়ে কৃশানু বলে, এ সব কথা আমার শুনে কি লাভ?

আইভি যেন শুনতেই পায় না ওর কথা। একভাবে বলে চলে, কিন্তু আমার ভ্যানিটি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নয়। ঐ দু একটি বন্ধুর কাছেই ওরা ধরা দিতে বাধ্য হয়েছে—তারা নিজেদের অস্পৃশ্য রাখতে পারি নি, এ বিষয়ে আমিই একমাত্র ব্যতিক্রম। আমাকে যেন নেশায় পেয়ে যায়, জানলে? স্কি করবার সময় নিপুণ খেলোয়াড় দেখাতে চায় অতলস্পর্শ খাদের কত কাছ থেকে সে ঘুরে আসতে পারে। আমারও যেন তেমনি নেশা চেপে যায়। নতুন কোন ছেলের সঙ্গে আলাপ হলেই ইচ্ছা করে ওকে আমার দিকে আকৃষ্ট করি, ওকে নিয়ে খেলাই। কিন্তু সাপ-খেলানোর মত এমন করে খেলাব যে ওর প্রতিটি দংশন পড়বে আমার হাতের ঝাঁপিতে—স্পর্শ করতে পারবে না সে আমায়। তুমি বিশ্বাস করবে কি কৃশানু যে আমার প্রায় আধ-ডজন অন্ধ প্রেমিক আছে, অথচ এতটা বয়সেও আমি জানতে পারিনি পুরুষ মানুষে চুমু খেলে কেমন লাগে। আমি জানি, এ কথা শুনে তোমার একটা দুরন্ত লোভ হচ্ছে, কিন্তু আমি এ কথাও জানি তুমি এক পা এগিয়ে এলেই আমার ডান হাতটা সজোরে গিয়ে পড়বে তোমার বাঁ গালে, যেমন পড়েছিল ইতিপূর্বে কয়েকজনের।

কাঠের পুতুলের মত বসে থাকে কৃশানু।

আইভি এক নাগাড়ে বলে চলে, কাল আমার একটা দুরন্ত লোভ হয়েছিল, জানলে? একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে ইচ্ছা হয়েছিল। এতদিন এটা সাহস পাইনি। কারণ মনের মত মানুষও পাইনি। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বিশ্বাস করতে পারিনি। হাজার হোক আমার চেয়ে ওদের গায়ের জোর বেশী! কাল তোমাকে দেখে ভীষণ লোভ হল আমার। মনে হল তোমার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে রাত কাটানো চলবে। তোমাকে দেখে,

কি জানি কেন, আমার মনে হয়েছিল, তুমি একেবারে পশু হয়ে উঠবে না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আমাকে স্পর্শ করবে না তুমি।

কিন্তু কাল যে তুমি বলেছিলে, কেউ তোমার গায়ে হাত দিলেও সেটাকে তুমি দুর্ভাগ্য বলে মনে কববে না ?

তুমি ভুলে গেছ কৃশানু। আমি বলেছিলাম, ইচ্ছার বিরুদ্ধে না দিলে মনে করব না।

কিন্তু নিজের মনকেই কি মানুষ চিনতে পারে ? মধ্যরাত্রেব নির্জনতা মানুষের মনে মোহ বিস্তার করে। কে জানে, খাদের মুখে এসে হঠাৎ মোড ঘোরার ইচ্ছাটা যদি মিলিযে যেত তোমার ? যদি ঝাঁপ দিয়ে পড়ার ইচ্ছাটা জাগত মনে ?

দু হাতে মুখ ঢেকে আইভি বলে ওঠে, তাহলে বুঝতাম, ক্ষ্যাপার পরশ পাথর খুঁজে ফেরাব পালা শেষ হয়েছে।

কৃশানুর বুকেব মধ্যে গুড গুড করে ওঠে।

টেন শিলিগুডিতে এসে পৌছাল।

একটা ট্যাক্সি নিল কৃশানু।

শিলিগুডি থেকে দার্জিলিঙ। পৃথিবীব অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুন্দর পথ। এঁকে বেঁকে বিসর্পিল-গতিতে গুডি মেবে মেরে উঠছে গাড়িটা পাহাড়ের গা বেয়ে। আইভি একেবারে চুপ করে গেছে। ওর কথাই বসে ভাবছে কৃশানু। আশ্চয এই দুনিয়া, আর বিচিত্র এই সৃষ্টি। কী অদ্ভুত মনোজগৎ গডে তুলেছে আইভি। সে নিত্য নতুন বন্ধুত্ব করতে চায়। নিত্য নতুন মানুষকে তিল তিল কবে আকৃষ্ট করতে চায় নিজের দিকে। আরও কাছে, আরও কাছে—তবু একচুল ব্যবধান সে রেখে যায় বরাবর। সাপ খেলায় যে বেদনী তার মতই ও নেশায় মাতাল। সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখায় যে মেয়ে ও যেন তাদের জাতের। ও পড়তে পডতে পড়বে না। কৃশানুর সঙ্গে একঘরে রাত কাটাতে চায়, আর কিছু নয়—শুধু নতুন অভিজ্ঞতা একটা। অনাত্মীয় একটি যুবকের সঙ্গে স্পর্শ বাঁচানো একটা রাত্রি এক কক্ষে অতিবাহিত করা। তার জন্য ও মিথ্যা কথা বলতেও কুণ্ঠিত নয়। চারদিকে আগুন জ্বালতে চায় সে—অথচ নিজের গায়ে এক ফোঁটা আঁচ লাগবে না, তবেই না খেলা।

ভারী করুণস্বরে আইভি বলে, তুমি আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারনি, নয় ?

ওর হাত দুটি টেনে নিয়ে কৃশানু বলে, করেছি। আমি বলেই করেছি। কারণ আমিও ঐ রকম একটা অদ্ভুত মানসিক রোগে ভুগছি। যার জন্য মেয়েদের সঙ্গ আমি এড়িয়ে চলি।

আইভি কৌতূহলী হয়ে বলে, কী রোগ ?

আজ বলার সময় নেই, একদিন বলব।

না, আজই বলতে হবে। বন্ধু বলে তুমি আমাকে স্বীকার করেছ, আমার সব কথা তোমাকে বলেছি, তুমিই বা কেন বলবে না ?

বলব, কিন্তু আজ আর সময় কোথায় ? ঐ দেখ দার্জিলিঙ স্টেশন দেখা যাচ্ছে। আগে তোমাকে হস্টেলে নামিয়ে দেব, না আগে আমি নেমে যাব ?

আইভি মাথা নেড়ে বলে, এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে না। আগে-পিছে নামা চলবে না। একসঙ্গেই নামব।

মানে ?

মানে বুঝবে এখনই।

একটু পরে ট্যাক্সিটা রাস্তার একধারে দাঁড় করিয়ে রেখে আইভি নেমে এসে বলে, এস।

কৃশানু ওর কথামত নেমে আসে, বলে এ কোথায় এলে ?

এটা একটা হোটেল। আজকে একটা বেলা এখানে মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস রায় থাকবেন। তোমার সব কথা শুনে বিকালে ছেড়ে দেব তোমাকে। এস।

প্রতিবাদে কৃশানু কি একটা কথা বলবার উপক্রম করেই থেমে যায়। স্যুটধারী ম্যানেজার ততক্ষণে নেমে এসেছে। আইভি তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। অনর্গল বক্‌বক্‌ করে চলে। আইভির কোন বান্ধবী নাকি এখানে সস্ত্রীক উঠেছিল, তারা খুব প্রশংসা করেছে হোটেলের, ফিরে গিয়ে। তাই একদিনের জন্য এসেও সে খুঁজে বার করেছে হোটেলটা। বাগানের দিকে তাকিয়ে বলল, হাউ লাভলি, ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার স্বামী কিন্তু খুব অর্থোডক্স, হ্যাম, পোর্ক, বীফ কিচ্ছু চলবে না।

ম্যানেজার বিগলিত হয়ে বলল, কিচ্ছু ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা সে করে দেবে।

অগত্যা অদৃশ্য গাঁটছড়া বাঁধা কৃশানু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে দ্বিতলে। দোতলা বাড়ি—ছোট্ট। কোণার দিকে সবচেয়ে ভাল ঘরখানা পছন্দ হল আইভির। দোতলার এক প্রান্তে। হোটেলের চাকর মালপত্র এনে পৌঁছে দিল ঘরে। জিজ্ঞাসা করল কি কি খাবে ওরা মধ্যাহ্নে। আইভি নীচে গিয়ে ম্যানেজারের খাতায় কি সব লিখিয়ে দিয়ে এল।

হোটেলটা শহরের প্রবেশপথে একান্তে। কার্টরোড থেকে এক চিলতে একটা ফ্যাকড়া নেমে গেছে গভর্ণর হাউসের দিকে। তারই বাঁকের মাথায় পাথরে গড়া বাড়িটা। অসংখ্য মরসুমি ফুল ফুটে আছে সামনের বাগানে। চারিদিক ছিমছাম পরিষ্কার। হোটেলের চাকরটাও বেশ কর্মিৎকর্মা। বাচ্চা নেপালী চাকর। সর্বদাই হাসিখুশী। কুতকুতে চোখদুটো সবসময়ই আধবোজা, একটু খুশী হলে একবারে বুজে যায়। আইভি ওকে দিব্যি খাটিয়ে নিচ্ছে। দুপাশের দুখানি খাটে আলাদা দুটি বিছানা পেতে দিয়ে, জল বদলিয়ে চলে গেল ছেলেটা।

কৃশানু একটা ইজিচেয়ারে টান হয়ে পড়ে। দেখতে থাকে চেয়ে চেয়ে ঘরখানাকে। কাঠ-পাথরের বাড়ি। পার্টিসান দেওয়ালগুলো সব কাঠের। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা। দেওয়ালের মাঝখানে আগুন জ্বালবার ম্যাণ্টেলপীস। খান কয়েক ছবি টাঙান আছে দেওয়ালে। দার্জিলিঙেরই দৃশ্যাবলী। বড় বড় দুটো জানলা বাইরের দিকে। পর্দা দেওয়া। বারান্দার দিকে একটি মাত্র দরজা। জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা যায়। ঘরের লাগাও বাথরুম।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে কৃশানু তার এই দুঃসাহসিক আচরণের কথাই ভাবছিল। কী দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে ওর। মাসকতক আগে যেদিন ইভা ওকে একটা টেবিলক্লথে নক্সা আঁকতে দেয়, সেদিন তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারা যায়নি। আর আজ সে একটি অনাত্মীয়া তরুণীকে এনে তুলেছে একটা হোটেলে। তার চটুল রসিকতায় অভিভূত হওয়া দূরে থাক, যোগ দিচ্ছে কৃশানু অনায়াসে। রীতিমত দুঃসাহসিক হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? কৃশানু এই যে আইভির স্বামীর পরিচয় বহন করে এসে উঠল একবেলার জন্য এই হোটেলে, এটা কি তার দুঃসাহসের পরিচয়, না একান্ত ভীরুতার? আইভির ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার দৃঢ়তা ছিল না তার মনে। তাই স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দিয়েছে শুধু।

জগতের অনেক দুঃসাহসিকতার মূলেই যেমন আসলে ভীরুতা ছাড়া আর কিছু নেই, কৃশাহুর আজকের আচরণটাও কি তাই নয় ?

আইভি বলে, স্নান করবে তো ? গরম জল দিয়েছে, যাও স্নান করে এস।

হঠাৎ কেমন রাগ ধরে যায় কৃশানুর। কী পেয়েছে তাকে আইভি ? পাকা গিন্নির মত এ ভাবে হুকুম করার মানে ? গম্ভীর হয়ে বলে, না, স্নান করব না আমি।

আইভি ধমক দেয়, কুঁড়েমি কর না। ওঠ, যাও স্নান সেরে এস। এই নাও মাথার তেল আর সাবান। তোয়ালে এনেছ তো, না দেব ?

কৃশানু হেসে ফেলে ওর গিন্নিপনায়, বলে, থাকগে, বড্ড শীত করছে।

ট্যাক্সি যখন ক্রমশঃ উপরে উঠছিল তখনই স্যুটকেশ খুলে একটা পুরোহাতা সোয়েটার বার করে পরেছে কৃশানু। তার রীতিমত শীত করছে এই মধ্যাহ্ন বেলাতেও।

আইভি ওর হাতটা ধরে টানে, গেট আপ, য়ু ডরমাউস্। স্নান না করলে একটুও ফ্রেশ লাগবে না। গরম জল জুড়িয়ে যাচ্ছে।

অগত্যা কৃশানু বাথরুমে ঢোকে।

স্নান করে সত্যিই আরাম লাগে। গতরাত্রের অনিদ্রা আর ভ্রমণের গ্লানি যেন ধুয়ে গেল। জামাকাপড নিয়ে এবার আইভি গেল বাথরুমে। কৃশানু স্কেচখাতাটা নিয়ে এসে বসল জানলাব ধারে। পেনসিলটা বাব কবে আঁচড় টানতে থাকে। কিন্তু মন দিতে পাবেনা। কাল রাত্রে যদি সেই মাড়বারী ভদ্রলোক না এসে উঠত ওদের ঘরে তা হলে কি ঘটত ? নিশ্চয় বিসদৃশ কিছু করে বসত না কৃশানু। কিন্তু আইভি যদি অগ্রসর হয়ে আসত তাহলে তাকে বাধা দিতে পারত কি ? হয়তো অগ্রসর হতনা আইভি। মনে পড়ল আইভির সেই কথা কটা—কিন্তু আমি একথাও জানি যে তুমি এক পা এগিয়ে এলেই আমার ডান হাতটা সজোরে গিয়ে পড়বে তোমার বাঁ গালে।

আচ্ছা, কৃশানু কি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে গেছে ? না হলে, কই আইভির এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও তো দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি তার। এতদিন দূরে দূরে সরে থাকতে চেয়েছে, মনকে সজাগ রেখেছে ; তাতেই মন ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখন সে বিপদকে দেখে দূর থেকে সরে যায় না ; তাই মনও এসেছে ওর বশে। এই তো কাঠের পার্টিশনের ও পাশে জল ঢালার শব্দ উঠছে ; কই তার তো কোন চিত্তবিকার হচ্ছে না এতে।

মনে মনে আরও একধাপ এগিয়ে যায় ক্রমে। দেখাই যাক না কি হয়! একবার মনে কিসের যেন একটা বাধা, একটা সঙ্কোচ বোধ করে; কিন্তু পরক্ষণেই সেটা ঝেড়ে ফেলে। সে তো অসামাজিক, অশ্লীল কিছু করছে না। মনে মনে সে কি করছে তার কৈফিয়ত কার কাছে দিতে হবে? ঈশ্বর? কিন্তু তিনিই তো আসামী, তাঁর নিজের কি কৈফিয়ত আছে কৃশানুর মনকে এমন বিকৃত করে তৈরী করার?

…অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থেকে উঠে বসে ফের। না। চেষ্টা করেও আক্রমণটাকে আনতে পারল না। কাঠের পার্টিসানটাকে মনে মনে উড়িয়ে দেওয়া গেল না। দারুময় পার্টিসান মনে মনেও রইল অনড়।

খুশী হল কৃশানু। ভীষণ খুশী হল। তবে হয়তো সে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ওর রোগ নিশ্চয় ধুয়ে গেছে গঙ্গার জোয়ারে। নয়তো স্বাহার কাছে মন খুলে নামিয়ে দিয়েছে সে মনের বোঝা। আইভি ওর মনের অসুখের কথা জানতে চায়, কিন্তু অসুখটা হয়তো সেরেই গেছে। তাহলে অহেতুক সে লজ্জাকর ইতিহাস ওকে শুনিয়ে কী লাভ? কিন্তু না, সব কথা খুলে বলাই ভাল। বলে মনটা আরও হালকা করে ফেলা উচিত। ভবিষ্যতে আইভি না কোনদিন বলতে পারে কৃশানু তাকে ঠকিয়েছে। সব দুর্বলতার কথা, সব অপূর্ণতার কথাই খোলাখুলি জানিয়ে দেবে কৃশানু। তার পরেও যদি তুমি এগিয়ে আস তাহলে সে দায়িত্ব তোমার।

এই, কালা নাকি তুমি?

কৃশানু চমকে ওঠে। তন্দ্রা ছুটে যায় ওর। বাথরুমের দরজাটা একটু খুলে ওকে ডাকছে আইভি। বোধহয় অনেকবারই ডেকেছে। উঠে বসে বলে, কি, ডাকছ কেন?

আমার ঐ হাত-ব্যাগের মধ্যে একটা কিউটিকুরার কৌটা আছে। দেবে?

কৃশানু হাত-ব্যাগ হাতড়ে উদ্ধার করে পাউডারের কৌটা। বাথরুমের কাছে এসে সেটা দেয় আইভির দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা ভিজে হাতে।

ঘুমুচ্ছিলে নাকি?

না, ঠিক ঘুমাইনি। বলতে বলতে নত হয়ে যায় কৃশানুর দৃষ্টি।

অল্প কয়েকটা নীরব মুহূর্তের পরেই আবার বন্ধ হয়ে গেল ঈষদুন্মুক্ত দরজাটা।

ক সেকেণ্ড দেরী হয়েছিল আইভির? সেকেণ্ড-পল-অনুপল দিয়ে মাপা মুশকিল, তবে আন্দাজে কৃশানু বলতে পারে জোয়ার চলে যাবার যে-কয় সেকেণ্ড পরে উঠে দাঁড়িয়েছিল ইভা, এবারও সময়ের দৈর্ঘ্যটা ঐ জাতীয়ই। আর সেই নীরব কয়টি মুহূর্তেই এই প্রথম, হ্যাঁ কাল রওনা হওয়ার পর থেকে এই প্রথম, কৃশানু প্রয়োজন বোধ করল দৃষ্টি নত করার। আইভির বুকের উপর চাপা দেওয়া ছিল রাজহাঁসের পালকের মত সাদা একটা তোয়ালে। গরমজল-নিংড়ানো তোয়ালে থেকে এঁকে-বেঁকে-ওঠা বাষ্পীয় রেখাগুলো মনে হল যেন কতকগুলো সরীসৃপ। যেন মানবতার হৃদয়ের কোন কামনা বিসর্পিল রেখায় বাষ্পায়িত হয়ে বেরিয়ে আসছে তোয়ালে ভেদ করে। আপনিই দৃষ্টি নত হয়ে গিয়েছিল ওর।

দুপুরে আহারাদির পর চোখ দুটো ঘুমে ভেঙে আসতে চায়। কৃশানুর মধ্যে একজন ভবঘুরে আছে। ছুটিছাটায় প্রায়ই সে বেরিয়ে পড়ত, শুধু যেদিকে দুচোখ যায় নয়, যতদূর পকেট যেতে দেয়। এমন নিশ্চিন্ত প্রথম শ্রেণীর আরাম ওর জীবনে এই প্রথম। সুতরাং পথশ্রমে ওর এতটা ক্লান্ত হওয়ার কথা নয়—তবু কালরাত্রের অনিদ্রা আজ ওর চোখ দুটিকে যেন জোর করে বন্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু আইভি কিছুতেই ঘুমাতে দিল না ওকে। সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনল সে। হ্যাঁ, সব কথাই মন খুলে বলে ফেলে কৃশানু। ওর দুর্বলতার কথা, ওর মানসিক বিকারের কথা—ইভার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা, জলখাবার নামিয়ে রেখে ইভার ছুটে পালিয়ে যাবার কথা।

থামতেই আইভি বলে, তারপর?

তারপর আবার কি?

তারপর পুনর্মিলনের কথা!

চমকে উঠে কৃশানু বলে, ও আবার কি কথা! কি যা তা বলছ!

বাঃ! কাল তুমি বললে না—ইভার বন্ধুত্ব তুমি স্বীকার করেছিলে। সেটা কখন, কেমন করে হল? বাপি তোমাকে শ্রীরামপুরে যেতে বললেন, তুমি রাজি হলে, এখানে কখনও গল্প শেষ হতে পারে?

এরপর গম্ভীর হতে হয় কৃশানুকে; বলে, এর পরের কথা তো আমার একার কথা নয় আইভি। অপরের গোপন কথা বলার তো কোন অধিকার নেই আমার। ইভার কথা তোমাকে বলা যায় না; যেমন তোমার সঙ্গে আজকের এ অভিজ্ঞতার কথা ইভাকে বলা যাবে না কোনদিন।

আইভি দুহাতে মুখ রেখে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিল। তার গায়ের উপর আলতো-করে ফেলা ছিল একটা ইটালিয়ান কম্বল। মাথা ঝাঁকিয়ে আইভি বললে, সব কথাই বলা যাবে ইভাকে, তুমি না বললেও আমি ইভাকে সব কথা বলব।

বলবে? তোমার লজ্জা করবে না?

না। লজ্জা পাবার মত তো কিছু করিনি আমরা। ইভা আমার সব কথা জানে, যেমন আমিও ইভার সব কথা জানি।

না, জান না। তুমি জান, ইভা মনে মনে কাকে সবচেয়ে ভালবাসে?

জানি। এবং এও জানি, তুমি যার কথা ভাবছ তাকে নয়।

তার মানে? সুকান্তবাবুকে নয়?

জামাইবাবুকেই!

তবে যে তুমি বললে, আমি যার কথা ভাবছি তাকে নয়।

তুমি তো কথা ঘোরাচ্ছ। তুমি তো জামাইবাবুর কথা ভেবে এ প্রশ্নটা করনি আমাকে। আমার কথা বাঁক নিতেই সাবধান হয়ে এ কথা বলছ এখন।

তাহলে তুমি বলতে চাও, আমি অন্য কোন একজনকে মীন করেছিলাম?

ঠিক তাই।

কে সে?

শ্রীমান কৃশানু রায়।

মাথাটা আর তুলতে পারে না কৃশানু। এ মেয়েটার কি জানতে কিছুই বাকি নেই? কিন্তু ও যা বলছে তাই কি ঠিক? ইভা তাকে ভালবাসে না?

কী পাগল ছেলে তুমি! এতটা লজ্জা পাচ্ছ কেন? বল, তারপর কি হয়েছিল?

আমি যে কৃশানু রায়ের কথা ভাবছিলাম তা আন্দাজ করলে কি করে?

কাল যখন ইভা তোমাকে চিনতে পারল না, আর তাই দেখে তুমি যখন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে থাকলে, তখন আমি তো ছার, কুলিটা পর্যন্ত আন্দাজ করেছিল তোমাদের দুজনের সম্পর্ক!

দুজনের সম্পর্ক! কিন্তু তুমি যে এইমাত্র বললে ইভার মনে কোন মোহ নেই?

তাই বলেছি? তুমি কি সত্যিই এত ভুলো মানুষ, না কি প্রেমে পড়ায় সাময়িক বোকামি এগুলো?

কেন?

তুমি বললে, ইভা মনে মনে সবচাইতে কাকে ভালবাসে? আমি বললুম, জামাইবাবুকে, তার অর্থ হল ইভা তোমাকে ভালবাসে না?

হল না?

হল? তুমি যদি বল সবচেয়ে উঁচু গিরিশৃঙ্গ কোনটা, আর আমি বলি এভারেস্ট, তাহলে ইনফারেন্স হল কাঞ্চনজঙ্ঘা পীকটা নেই?

কৃশানু গম্ভীর হয়ে বলে, হিমালয় পাহাড়ের উচ্ছ্বাস অযুত গিরিশৃঙ্গে উন্মুখ হয়ে উঠতে পারে—মেয়েমানুষের মন পাহাড় নয়। স্বামীকে যদি কেউ সত্যি ভালবাসে তাহলে আর কোন কাউকে ভালবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয়; কৃষ্ণকে ভালবাসলে আর আয়ান ঘোষকে ভালবাসা যায় না।

বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন বুঝি? কিন্তু জীবনটা কাব্য নয় কৃশানু! নিঃসন্দেহে ইভা তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে, কিন্তু তাই বলে সুকান্তবাবুকেও সে ভুলে যায়নি। দিদি হচ্ছে আমার মায়ের মতন ··আই মীন, ভারতীয় নারীর যে বিশিষ্টতা, ওর তা আছে। ও তোমাকে ভালবাসলেও সেটা স্বীকার করতে পারছে না। না তোমার কাছে, না ওর নিজেব কাছে। তাই ও এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এতদিনে ও বুঝতে পেরেছে নিজের মনকে।

তোমার কাছে কি ইভা স্বীকার করেছে?

স্বীকার ঠিক করেনি—তবে বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। সে আমাকে সাবধান করে দিয়েছে যেন তোমার সঙ্গে বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে না মিশি। এমন করে সাবধান করে দেবার নিশ্চয় কোন কারণ ছিল। আমি জানি যে ইভা জানে, যে বাধা দিলেই আমি আরও উদ্দাম হয়ে উঠব। ইভা চায় আমি তোমাকে বিয়ে করি। ও আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসে—তাই আমাকে তার জীবনের এতবড় একটা সম্পদ উপহার দেওয়ার মধ্যেই সে একটা 'ভাইকেরিয়াস্ এন্‌জয়মেণ্ট' খুঁজছে।

কৃশানু ধীরে ধীরে বলে, তাকে সে আনন্দ পেতে দেওয়া কি একেবারেই অসম্ভব আইভি ?

মুচকি হেসে আইভি বলে, পারহ্যাপ্স ! তুমি বড্ড ভীতু, তোমাকে দিয়ে চলবে না।

কৃশানুও হেসে বলে, তোমাকে বিয়ে করা কি ভীষণ একটা দুঃসাহসিক কাজ ?

ভীষণ ! আমাকে বিয়ে করা মানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা ! তাইতো দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃসাহসী প্রেমিককে খুঁজছি আমি। জানো, এই হোটেলের একটি বোর্ডারের সঙ্গে আমার কয়েক মাস আগে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। ছেলেটা এতদূর ডেয়ারিং যে নিজেকে ফিল্ম ডিরেক্টার তরুণ গুপ্ত বলে পরিচয় দেয়। আমাকে সে ফিল্মে একটা চান্স পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ছেলেটা বোকা, কিন্তু তার দুঃসাহসকে আমি প্রশংসা করি।

তারপর কি হল ছেলেটার ?

ভেবেছিলাম তাকে নিয়ে যাব খাদের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত—শেষমুহূর্তে যখন সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে—তখন তার হাতের লেখা চিঠিতে তরুণ গুপ্তের সই দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম -জালিয়াতির অপরাধে কয় মাস জেলের ব্যবস্থা আছে আই পি. সি.-তে ? কিন্তু সে সুযোগ আর পেলাম না। ছেলেটি বোধ হয় কোনসূত্রে আমার পিতৃপরিচয় পেয়েই সাবধান হয়ে পালিয়েছিল। কাল তোমায় বলছিলাম না, পিতৃপরিচয়ই আমাদের সব সর্বনাশের মূল !

ও কথা যাক্, কিন্তু কী ধনুকভাঙা পণ আছে তোমার শুনি ?

ধনুকভাঙা পণের কথাও পরে হবে। শ্রীরামপুরে গিয়ে কি দেখলে তাই আগে বল।

কৃশানু অকপটে সব কথা বলে যায়। কোন কথাই গোপন করে না। চাঁপা রঙের শাড়ি আর দার্জিলিঙ পাথরের লকেট খুলে রেখে আসার কথা, পাম এনে দেওয়ার কথা, মাঝির ভুল ধারণার কথা। তারপর সে এসে পড়ে ভরাকোটালের বানের কথায়। মুহূর্তের বিহ্বলতায় কেমন করে ওর বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইভা। ওর সমস্ত দেহমন অন্তরাত্মা কেমন এক অনির্বচনীয় পুলকাবেশে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। কৃশানু কথা বলছিল জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে—যেন আপন মনে গল্প করছে। হঠাৎ

থেমে পড়ে। খাট থেকে কি মনে করে অকস্মাৎ নেমে পড়েছে আইভি কোন কথা না বলে হঠাৎ সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বিহ্বল হয়ে কৃশানু একাই বসে থাকে চুপ করে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আরও ঠাণ্ডা বেড়েছে। অলস মধ্যাহ্ন কখন অগোচরে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে জানতেও পারেনি। ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম এনে নামিয়ে রাখে হোটেলের চাকরটা; কাঞ্চা না কি যেন নাম ছেলেটার। প্রায় একঘণ্টা পরে ওর পিছন পিছন এসে ঢোকে আইভি।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

বাগানে বেড়াচ্ছিলাম।

এমন ছুটে বেরিয়ে গেলে যে হঠাৎ?

আমার খুশী। তুমি কি ক্লাস নিচ্ছ না কি, যে বাইরে যেতে হলে পার্মিসান নিতে হবে।

কৃশানুব বুঝতে কষ্ট হয় না আইভির মেজাজটা আবার বিগড়েছে, অবশ্য এবার যে কেন বিগড়ালো তা ঠিক বোঝা গেল না। বলে, চা খেয়েই এবার ওঠা যাক। বাঁধাছাঁদা করতেও তো কিছুটা সময় লাগবে।

চায়ের কাপটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আইভি বলে, কেন, কোথাও যাবে?

চায়ে একটা চুমুক দিয়েই ভুলটা বুঝতে পারে কৃশানু। চিনির পাত্রটা টেনে নেয়। বলে, কোথাও যাবে মানে? তুমি কি এখানেই থাকবে নাকি?

হ্যাঁ।

বেশ, থাক।

নিজের চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে আইভি বলে, থাক মানে? আমি কি একা থাকব নাকি?

কৃশানু ভ্রূ কুঁচকে বলে, কি বলতে চাইছ তুমি?

বলতে চাইছি যে কালকে সকালের গাড়িতে আমরা তুজনে দার্জিলিঙে পৌছাব—আর স্টেশন থেকে তুমি আমাকে সোজা হস্টেলে নিয়ে যাবে। না হলে এখন পৌছে আমি কৈফিয়ত দেব কি? কোন ট্রেনে এসেছি কলকাতা থেকে?

তার মানে আজ রাত্রিটা তুমি এ ঘরেই কাটাতে চাও?

আইভি কোন জবাব দেয় না। কৃশানুই আবার বলে, কিন্তু সে জন্যে যে অজুহাত খাড়া করেছ সেটা খুব জোরাল নয়।

এবারও আইভি চুপ করে থাকে।

কেন আইভি? তোমার সেই টাবু থিয়োরীর জন্যে? তোমার একটা খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে?

এবার ধীরে ধীরে আইভি জবাব দেয়। ওর দিকে তাকায় না। চায়ের কাপটায় চামচে নাড়তে নাড়তে সেই দিকেই তাকিয়ে বলে, না, আমার খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে নয়। আজ রাতটা এখানে থেকে গেলাম শুধু তোমার জন্যেই। কাল রাত্রে তোমার ঘুম হয়নি—আজও হবে না। আজ সারারাত জেগে তোমাকে একখানা ছবি আঁকতে হবে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে কৃশানু বলে, ছবি আঁকতে হবে? কেন? কিসের?

একইভাবে আইভি বলে, রোগ তোমার সারেনি কৃশানু—চাপা আছে মাত্র। ও রোগ এমনিতে সারে না। দৃষ্টিবিভ্রমের মুহূর্তটিতে তোমার অবচেতন মন যে দৃশ্যটি দেখবার জন্য কাঙালপনা করে, চর্মচক্ষুকে সেই ছবিখানিই নৈবেদ্য দিতে হবে। না হলে এ রোগের হাত থেকে তোমার নিষ্কৃতি নেই।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কৃশানু।

আইভি মুখ তুলে তাকায়। অদ্ভুতভাবে হাসে। বলে, কি? ভয় পেলে? আমি জানি, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না। দিও না, কেমন? ছবিখানা তোমার স্কেচবুকেও রেখ না। আমার ফিগারটা বড় পিক্যুলিয়ার। মুখ না আঁকলেও লোকে চিনে ফেলতে পারে।

এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করে কৃশানু বলে, আমি রাজি নই আইভি।

ভ্রূকুঁচকে আইভি বলে, কেন?

দুটি সর্তে আমি রাজি হতে পারি।

বল।

প্রথমত, কোন কারণেই আজ রাত্রে তুমি আমাকে স্পর্শ করবে না।

আইভি হেসে বলে, মেনে নিলাম ও সর্ত, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে স্পর্শ করব না। দ্বিতীয়টা?

কৃশানু লক্ষ্য করল—কথা দেওয়ার সময় অল্প উকিলের প্যাচ কষেছে

আইভি। কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলা যায় না। অর্থাৎ বলা যায়, কিন্তু তাহলে বলতে হয় নিজের উপরও অতটা সংযম নেই কৃশানুর। সেটা এই অবস্থায় স্বীকার করাটা ঠিক নয়। তাই বলে, দ্বিতীয়টা হচ্ছে, শুধু একরাত্রের জন্য নয়, দিতে হবে আমাকে সমস্ত জীবনের জন্য এ অধিকার।

এবারও আইভি হেসে বলে, সেটা কাল বলব।

না। সিটিং দেওয়ার আগেই তোমাকে মনস্থির করতে হবে। যদি নাকচ কর আমার প্রার্থনা তাহলে তোমাকে মডেল করে ছবি আঁকব না আমি।

আইভি কি যেন একটু ভাবে। তারপর বলে, আজকের রাতটা শুধু তোমার আর আমার। এ জীবনটা তো শুধু তোমার আর আমার নয়। তোমার পরিবারের লোকেরাও আছেন, আমারও?

বাধা দিয়ে কৃশানু বলে, আমার তিনকুলে কেউ নেই, যার কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হতে পারে। তোমার তরফে ইভার তো আগ্রহ আছেই, আর তোমার বাবা?

হ্যাঁ বাবাকে নিয়েই কথা। তোমার আমার বিয়ে তিনি কিছুতেই অনুমোদন করবেন না। একেবারে নিঃসম্বল হয়ে আমাদের দুজনকে নেমে আসতে হবে পথে। সে দুঃসাহসিক অভিযানের জন্যে আমি অবশ্য তৈরি; কিন্তু তুমি কি অতটা পারবে? তা যদি পারবে বলে মনে কর, তাহলে শুধু আজকের এই রাতটা নয়, আমার সারাজীবনটাকে দিতে পারি তোমার রঙ-তুলির হাতে তুলে।

কৃশানুর মুখে ফুটে ওঠে বিজয়ের হাসি। ওর হাত দুটি ধরে বলে এতক্ষণে সব কথা। বুঝিয়ে বলে যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নিশ্চিন্ত করে আইভিকে। জানায়—ভবতারণবাবুর পূর্ণ সম্মতি আছে। বস্তুত অনেক দিন আগে থেকেই তিনি মনোনয়ন করেছেন কৃশানুকে। আইভির সহযাত্রী করে কৃশানুকে দার্জিলিঙ পাঠানোর মূলে তাঁর যে গোপন বাসনা ছিল সেটাও জানায়। হেসে বলে, আমি শুধু তোমাকে এস্কর্ট করতেই আসিনি; আমি এসেছি একটা ডিপ্লম্যাটিক মিশন নিয়ে। আমার এ কূটনৈতিক অভিযানের সাফল্যে এখন তুমি আমাকে অভিনন্দিত করতে পার, ইচ্ছা হলে।

আইভি কোন কথা বলে না; ধীরে ধীরে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে চলে যায় বাইরে।

কৃশানু একা বসেই থাকে।

দু মিনিট—পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট;—ফিরে আসে না। তারপর অবশ্য আইভি ফিরে আসে। একা নয়, দুজন লোক নিয়ে। কৃশানুর দিকে একবারও তাকায় না মুখ তুলে। একটা কথাও বলে না। তার মালপত্র গুছিয়ে তোলে স্যুটকেশে। বেডিংটা বেঁধে দেয় কাঞ্চা। কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে চলে যাবার সময় ওর দিকে ফিরে শুধু বলে, আজ রাত্রের হোটেল চার্জ মেটানো আছে। কাল সকালে আপনি জগদীশবাবুর বাড়িতে চলে যাবেন। নমস্কার।

আকাশপাতাল কিছুই বুঝতে পারে না কৃশানু। স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে।

দিন সাতেক পরে কৃশানু কলকাতায় ফিরে এল।

ইতিমধ্যে অবশ্য পূজার ছুটি সুরু হয়ে গেছে কলকাতায়। দলে দলে যাত্রীরা আসতে সুরু করেছে শৈলপুরীতে। দার্জিলিঙে উৎসবের সবে সুরু। এ সময় সবাই ওঠে, নামে না বড একটা কেউ। কৃশানু জানত ইতিমধ্যে ওদের মেসের বাকি কজন নিশ্চয় চলে গেছে যে যার বাড়ি। শূন্য মেসে গিয়ে করারও কিছু নেই তাব। কিন্তু সাত দিনেই সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল দার্জিলিঙে।

আইভির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল হস্টেলে। দেখা হয়নি। মানে, দেখা করেনি আইভি। একদিন এসেছিল সে জগদীশবাবুর বাড়িতে। ওঁকে যেন চিনতেই পারেনি। মণিমালা বোধ হয় সেটা নজর করেছিলেন। প্রশ্নও করলেন কৃশানুকে, আইভির সঙ্গে আপনার আলাপ নেই?

না বলতে পারলেই বাঁচে, কিন্তু কৃশানু জানে প্রশ্নকর্ত্রীর অজানা নয়—সেই নিয়ে এসেছে আইভিকে দার্জিলিঙে। পরদিনই সে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হল। আপত্তি করেছিলেন মণিমালা, জগদীশবাবুও—কিন্তু কৃশানু রাজি হয়নি।

কলকাতার মেসে পৌছে দেখে ঘরে তালা মারা। রামনন্দনও নেই নাকি? হয়তো কিশুবাবুও নেই দেখে ছুটি নিয়ে সে ফুলওয়ারি গাঁয়ে গেছে এবার ছুটিতে। তালা খুলে ঘরে ঢুকে জানলাগুলো খুলে দেয়। বাইরে এখনও চন্‌চনে রোদ আছে, কিন্তু ওদের মেসের ঘুপচি ঘরে নেমে এসেছে

সন্ধ্যার অন্ধকার। আলোটা জ্বালতে হয়। গুমোট গরম। ফ্যান নেই ওদের ঘরে। বিছানাটা খুলে পেতে ফেলে খাটে। তক্তাপোশের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। পাশেই মেস ম্যানেজার সুব্রত দাশের চৌকিতে পড়ে আছে তালপাতার একখানা পাখা। সেটা নিয়ে জোরে জোরে হাওয়া খেতে থাকে। হাসি পায় কৃশানুর। সেপ্টেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি, অথচ গুমট গরম লাগছে আজ ওর। আসলে হয়তো সত্যিই গরম নেই—দার্জিলিঙের আবহাওয়া থেকে নেমে এসে এই দুরবস্থা হয়েছে ওর। গেঞ্জিটাও খুলে ফেলে শেষ পর্যন্ত।

দূরে কোথায় সানাই বাজছে। আসন্ন পূজার বারোয়ারী তলায় নাকি? কিন্তু ঢাকের আওয়াজ তো নেই। নাকি রেডিওতে বাজছে কোথাও? চুপচাপ শুয়ে শুয়ে সানাইয়ের সুরে ডুবে রইল কিছুক্ষণ।

সাতদিন ছিল সে দার্জিলিঙে। কত নতুন দৃশ্য দেখেছে, কত ঘুরেছে ছায়া-শীতল পথে পথে, কিন্তু ভারাক্রান্ত মনটা স্বস্তি পায়নি। কেন অমন অদ্ভুতভাবে সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে চলে গেল আইভি? কি কারণে আঘাত পেল সে? কিছুই বুঝতে পারেনি। কিন্তু মন বড় অবুঝ; প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একটা করে ব্যাখ্যা দিতে না পারলে সে সন্তুষ্ট হয় না। মনকে শেষ পর্যন্ত কৃশানু বুঝিয়েছিল আইভি যা মুখে বলে তাই সে বিশ্বাস করে, আইভি পাপপুণ্য মানে না, সতীত্ব তার কাছে একটা কুসংস্কারই। হয়তো এমনভাবে আরও কত রাত সে কাটিয়েছে তার অন্যান্য বন্ধুর সঙ্গে। কেউ কখনও ওকে স্পর্শ করেনি? বাজে কথা। কৃশানু বিশ্বাস করে না। চরিত্রহীন ফ্লার্ট একটা। সেদিনও সে একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চেয়েছিল। কৃশানুকে করতে চেয়েছিল তার একরাতের খেলার পুতুল, তার কামনার সাময়িক শিকার। হয়তো ভেবেছিল কৃশানু ঘাবড়ে যাবে ভবতারণবাবুর নাম শুনে। হয়তো একরাত্রির প্রসাদ নিয়ে কৃশানু সসঙ্কোচে সরে দাঁড়াবে, যেই শুনবে ভবতারণ ঘোষাল এটা বরদাস্ত করবেন না। পুলিস সাহেবের নাম শুনে আইভির আর একটি বন্ধু—কি যেন ফিল্ম ডাইরেক্টারের নাম নিয়ে যে খেলা করছিল আইভির সঙ্গে—সে যেমন কেটে পড়েছিল, হয়তো কৃশানুও তেমনি সরে পড়বে। কিন্তু তা হল না। ভবতারণবাবুর নাম শুনেও যখন পিছপাও হলনা কৃশানু তখন সাবধান হতে হল আইভিকে। বুঝল একরাত্রের সাময়িক ফুর্তিতেই শেষ হবে না এ অধ্যায়। এর জের টেনে চলতে হবে সারাজীবন। তাই তৎক্ষণাৎ নিজেই সরে গেল আইভি। অথচ কী দরাজ গলায় সে

বলেছিল বাপ ত্যাগ করলেও সে কৃশানুর হাত ধরে পথে নামতেও রাজি। লাইসেনসস্ ভাইপার!

মেয়েমানুষ জাতটাই এ রকম—ভাবে কৃশানু। এতদিন মুখ তুলে ওদের দেখেনি, শান্তিতে ছিল। কী কুক্ষণেই যে ইভার ফাঁদে পড়ে জ্ঞানবৃক্ষের ফলের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল! আজ এই কয়মাসে ওর সুখ শান্তি সব নষ্ট করেছে ওরা। ইভার ছলনায় প্রায় মরতেই বসেছিল তো সেদিন। আইভিও কম গেল না। সুখের সপ্তম স্বর্গে ওকে তুলে দিয়ে সোনা মইটি হাতে নিয়ে কেটে পড়ল। আর আছেন একজন পাটনা-বাসিনী এক লিপি-বান্ধবী। যাকে চিনি না, জানি না—তারই কী হুকুমের সুর! ভোর পাঁচটায় স্টেশানে হাজিরা দাও! ট্রামে উঠতে যার পয়সা থাকে না, অর্ধেক দিন হেঁটে এসপ্ল্যানেড চলে যায় তাকে কিনতে হবে এক ডজন রজনীগন্ধা। না হোক আট দশ আনা তো বটেই! সেই ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় এক অধ্যাপকের মৃত্যুতে গ্লোব-নার্সারি থেকে এক ডজন রজনীগন্ধা কিনেছিল। জীবনে সেই প্রথম আর শেষ! উনি হুকুম করে বসলেন অধ্যাপকের মৃত্যুতে যেমন ফুল কিনেছিলে এবার ছাত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তেমনি আবার ফুল কেন। কী? না আমি তোমার সঙ্গে রোমাণ্টিক প্রেম করছি! ধন্য করছি তোমাকে!

হঠাৎ কি মনে পড়ায় উঠে বসে একবার। ডাকবাক্সটা দেখলে হত। নিশ্চয়ই চিঠি এসেছে তাঁর। এতদিন চুপ করে থাকার মেয়ে তো তিনি নন। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, এরপর সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দেবে সে এই বিজাতীয়দের সঙ্গে। এতদিন যেমন ছিল তেমনিই থাকবে।

চিঠির বাক্সটা খুলে দেখে খানকয় চিঠি জমেছে এ কয়দিনে। ওর নামে আছে দুখানা। একটা শুভবিবাহ মার্কা। টুকলির বিয়ে হয়ে গেছে গতকাল রাত্রে। বাঁচা গেছে। দ্বিতীয়খানা? হ্যাঁ, যা আন্দাজ করেছিল। স্বাহার চিঠিই। খুলে পড়তে যাবে, এমন সময় কে যেন কড়া নাড়ল সামনের দরজায়। খোলা চিঠিখানা বালিশের তলায় চাপা দিয়ে বাইরে আসে কৃশানু।

বাইরে আধো অন্ধকারে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল এক অপরূপ বিস্ময়!

কৃশানুবাবু এখানে থাকেন? কৃশানু রায়?

অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে আধমিনিট নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে কৃশানু।

বারান্দার বাতিটা জালতে ভুলে যায়। আধো আলোয় দরজার চৌকাঠের ফ্রেমে বাঁধান একটি নারীমূর্তির অস্পষ্ট সিল্যুয়েট। বাতির সুইচটা জালা দরকার—এটা অভদ্রতা হচ্ছে। কিন্তু আলো জাললেই জানা যাবে ও শ্যামা না শুভ্রা, ও সুরূপা না রূপহীনা।

কৃশানুবাবু এখানে থাকেন? কৃশানু রায়? দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে মেয়েটি। মরিয়া হয়ে বাতিটা জেলে দেয় কৃশানু।

ওর বয়স কত? ওকি শ্যামা—না শুভ্রা? ওকি সুরূপা না অপরূপা? এসব কথা ভাববার অবকাশই পেল না কৃশানু। ওর চেহারার একটি জিনিস মাত্র নজরে পড়ল কৃশানুর—সেটাকে বলা যায় ব্যক্তিত্ব! যা মাপবার কোন মানদণ্ড নেই। বিবেকানন্দের চোখের দৃষ্টিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের চাপা ঠোঁটে যে ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে তা-শুধু বোঝা যায়, বোঝান যায় না।

মেয়েটি কোন উৎসব বাড়ি থেকে উঠে এসেছে অল্প সময়ের ছুটি নিয়ে। ওর সমস্ত শরীরে সে সংবাদের ছাপ। যেন টুকলির বিয়ের উৎসব এ নয়! ওর গায়ে জড়িয়ে রয়েছে গত রাত্রের বাসরঘরের কিসের একটা সৌরভ—বাসিফুলের, সেন্টের অথবা উৎসবমগ্না কিশোরী তরুণী যুবতী নারীর স্বতঃ-উৎসারিত একটা পদ্মগন্ধ। কিন্তু তা সত্বেও মনে হল কৃশানুর কারুকায-খচিত এই খাপটা বাহুল্য মাত্র—খাপের আড়ালে লুকিয়ে আছে বুদ্ধিদীপ্ত একখানি ঝকঝকে তলোয়ার। আর দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই সামলে নিয়ে কৃশানু বলে, থাকেন, কিন্তু এখন তো নেই।

দার্জিলিঙ থেকে ফেরেন নি এখনও?

দার্জিলিঙ! দার্জিলিঙের কথা ও জানল কোথা থেকে? কৃশানু শুধু গম্ভীর হয়ে বলে, না। ফিরতে বোধ হয় ওর দেরী হবে।

ও! দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে কি যেন ভাবছে স্বাহা।

কৃশানু এলে কিছু কি বলতে হবে? প্রশ্ন করে কৃশানু।

না। বলতে কিছুই হবে না। চিঠিতেই আমি লিখব। আপনার নামটা শুধু জেনে যাই, চিঠিতে উল্লেখ করব। না হলে বিশ্বাস করবে না হয় তো যে আমি এসেছিলাম।

ও আচ্ছা, আমার নাম সুব্রত দাশ।

ও, আপনিই তো মেসের ম্যানেজার।

সত্যিই অবাক হতে হয় এবার। বলে, আপনি কি করে জানলেন?

মেয়েটি হেসে বলে, আপনাদের মেসের রামনন্দন আমার পরিচিত। যদি কিছু না মনে করেন তাহলে একটা অনুরোধ করি—

বলুন, বলুন—

কৃশানুবাবুর ঘরটা একবার দেখে যেতে পারি ?

অনায়াসে। আসুন আমার সঙ্গে। কৃশানু আমারই রুম-মেট।

জানি সে কথা। বলে মেয়েটি ওর পিছনে পিছনে আসে।

ঘরে এসে প্রথমেই গেঞ্জিটা গায়ে চড়ায়। এতক্ষণে একটু ভদ্রস্থ লাগে। বিছানার চাদরটা ভীষণ ময়লা। ট্রেনের কালিমায় মলিন। এর উপর ওকে বসতে বলা যায় না। কাঠেব ফোল্ডিং চেয়ারটা ঠেলে দেয় মেয়েটির দিকে, বলে, বসুন। এটাই আমাদের ঘর। কোনটা কৃশানুর সীট বলে দিতে হবে না আশা করি।

স্বাহা বসে না। ঘবটাকে ভাল করে লক্ষ্য করে। দেওয়ালের চাপড়া খুলে পড়েছে এখানে ওখানে। বারান্দার ওপাশে খাড়া প্রাচীরের সারা গায়ে নোনাধরা লালচে ইটের দগদগে ঘা। পুরানো দেওয়ালের পেরেক প্রায়ই খুলে আসে হলহল করে। সাবা দেওয়ালে মশারি টাঙাবার জন্য পেরেক পোঁতার গর্ত। সে-আমলের লোহার টি-আয়রণের পেটাটালির ছাদ, জং ধরে ফাটিয়েছে ছাদকে। গত বর্ষায় সেই ফাটল দিয়ে নেমেছে বর্ষার বসুধারাচিহ্ন।

ভারী খুশী হয়েছে কৃশানু মনে মনে। রীতিমত জব্দ হয়েছে স্বাহা। বেশ চাল চেলেছে সে।

কেন, বলে দিতে হবে না কেন ? প্রশ্ন করে স্বাহা।

ইচ্ছা করেই আর এক ধাপ এগিয়ে যায় কৃশানু। বলে, ওর টেবিলের উপর ফোটোর স্ট্যাণ্ডটা দেখেই আপনার বোঝা উচিত ছিল ওটাই ওর সীট।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় সাহা। আঁচলের তলা থেকে এতক্ষণে হাতটা বার করে। এতক্ষণে নজরে পড়ে আঁচলের তলায় ওর হাতে ধরা ছিল একগোছা রজনীগন্ধা। টেবিলে সেটাকে নামিয়ে রেখে ফ্রেমে বাঁধান সুব্রতর ফটোটা তুলে নেয়। কেমন যেন ক্লান্ত বিষণ্ণ লাগছে ওকে। যেন একটা বুকচাপা দীর্ঘশ্বাসকে সে কোনমতে আটকে রেখেছে। সুব্রতর ফটোখানা ধরা আছে ওর হাতে—কিন্তু সেদিকে ওর দৃষ্টি নেই। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে একদৃষ্টে নোনাধরা দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালের বুকে

ওখানে একটা ক্ষতচিহ্ন। এক শিশু মহীরুহের বীজ পড়েছিল ওখানে। আলোবাতাসে শিশু-কৌতূহলে চারা গাছটা মাথা তুলে দেখতে চেয়েছিল রূপরসে ভরা এই দুনিয়াকে অবাক বিস্ময়ে! বাড়িওয়ালা মিস্ত্রি ডেকে গাছটা উপড়ে ফেলেছে। এ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়েছে শিকড়ের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত। সেই কালো গহ্বরটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে স্বাহা!

সানাইয়ের প্রোগ্রামটা এখনও শেষ হয়নি। ক্লান্ত বিষন্ন সানাইএর করুণ সুর এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে সন্ধ্যাবাতাসে। আঁচলের তলা থেকে মুক্তি পাওয়া রজনীগন্ধাও যুক্ত করেছে তার সৌরভ হঠাৎ-ওঠা একটা দমকা হাওয়ায়। কৃশানু একদৃষ্টে দেখছিল আনমনা মেয়েটিকে। এতক্ষণে অবকাশ পেল ভালো করে লক্ষ্য করতে ওর সাজপোষাক। উৎসববাড়ির সুসজ্জিত আয়োজন, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ পেল না। ওর কেন যেন মনে হল এই শ্রান্ত সায়াহ্নে ঐ রুদ্ধশ্বাস মেয়েটি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে নিজ দেহভার। ও যেন বাস্তবে ওখানে নেই—ও যেন একটা স্বপ্ন। এখনই মিলিয়ে যাবে। কৃশানুর পায়ের পাতা থেকে একটা সিরসিরানি উঠে আসে শিরদাঁড়া বেয়ে। এ অনুভূতিটাকে ও চেনে। যা ভেবেছে তাই। ধূপের ধোঁয়া যেমন আবছা নীল রঙে সুরু হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় বাতাসে, ঠিক তেমনি করে একে একে মিলিয়ে যেতে থাকে ওর বহিরাবরণ! গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে গরম পীচগলা রাস্তায় যেমন মিলিয়ে যায় ছল্‌কে-পড়া জল কোন চিহ্ন না রেখে, ঠিক তেমনি করেই। একটা আর্তনাদ ওর গলা চিরে বেরিয়ে আসছিল। দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে নিজের চৌকিতে। সে শব্দে হঠাৎ চমকে তাকায় মেয়েটি, বলে, কি হল?

অনেক কষ্টে কৃশানু আত্মসংবরণ করে। সানাইয়ের আওয়াজটাও থেমে গেছে। হঠাৎ বসতে গিয়ে বাঁ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা মচকে গেল; আর তৎক্ষণাৎ শারীরিক প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে সম্বিত ফিরে পায়। না, হারিয়ে যাওয়া কাপড়-জামা আবার ফিরে এসেছে। প্রত্যক্ষকে পার-করা দৃষ্টিটা মিলিয়ে গেছে। সামলে নিয়ে কৃশানু বলে, মাথাটা কেমন ঘুরে উঠেছিল।

অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে স্বাহা।

ভীষণ রাগ হয়ে যায় কৃশানুর। একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারত রাগটা ওর হয়েছিল রোগের পুনরাক্রমণে। আর সেজন্যে মেয়েটির কোন

দোষ নেই। কৃশানু মনে মনে আশা করেছিল এবার মেয়েটি নীরবে বিদায় নেবে। তবু তাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু রূঢ়স্বরেই বলে, আমি অসুস্থ। একটু বিশ্রাম করব। আর কিছু বলবেন?

মেয়েটি রীতিমত বিহ্বল হয়ে পড়ে; বলে, এখানে তো দ্বিতীয় কাউকে দেখছি না—এভাবে অসুস্থ আপনাকে ফেলে রেখে—

কৃশানুর হাতখানা টেনে নিয়ে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে।

হাতখানা ছাড়িয়ে নেয় কৃশানু। বলে, মাপ করবেন, আমি একটু একলা থাকতে চাই।

স্বাহা একটা মুহূর্ত ইতস্তত করে। যেন কিছু বলবে সে। কিছু বলে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত। একটা বোবা-কান্না সত্যিই বুক ঠেলে উঠে আসছিল কৃশানুর। সে শুয়েই পড়ে।

ওর বালিসটা মাথার নীচে ঠিক করে দিয়ে মেয়েটি নীরবেই চলে গেল। বাইরে দাঁড়ানো ট্যাক্সিটা বিদঘুটে একটা হাসির আওয়াজ তুলে যবনিকা টানল এ অধ্যায়ের।

অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে পড়ে থাকার পর বেশ সুস্থ বোধ করে। পায়ের আঙুলে বেশ ব্যথা আছে এখনও। চোখ তুলে তাকায়, উঠে বসে। যেন একটা স্বপ্ন দেখে উঠল এইমাত্র! উৎসবমুখরিত বাসর-রজনীর যে মৃদু সৌরভ নিয়ে এসেছিল ওর স্বপনচারিণী—বাতাসে যেন তার স্পর্শ তখনও লেগে আছে। সত্যই স্বপ্ন দেখছিল নাকি এতক্ষণ? থার্ডক্লাস কামরায় কাল সরারাত দুটি চোখের পাতা এক করতে পারেনি। তাই কি নিজের ঘরে এসে খাটে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল? স্বাহা তাহলে আসেনি? সবটাই স্বপ্ন?

কিন্তু না। এ সৌরভ তো স্বপনচারিণীর পদ্মগন্ধ নয়, ঐ তো টেবিলের উপর মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা!

নাটকের মত জীবনটাও যেন অঙ্কে আর গর্ভাঙ্কে ভাগ করা। কৃশানুর মনে হয় এবারকার পূজার ছুটিটা প্রথম অঙ্কের দীর্ঘ বিরতি। জং ধরা টি-আয়রণ-গুলোর দিকে তাকিয়ে চুপ করে পড়ে থাকে একা মেসে। মাঝে মাঝে জোর করে বই খুলে বসে। মনকে বোঝায় নতুন জন্ম হয়েছে তার, না কি পুনর্মূষিক হয়েছে এতদিনে আবার? সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে ইলাকে পড়াবার দায় নেই—

সে গেছে মাসীমার বাড়ি পূজার ছুটিতে। ইভা চলে গেছে শ্রীরামপুরে। খবরটা পেয়েছিল ও বাড়িতে গিয়ে। ইভার শ্বশুর মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তিনি নাকি তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন পুত্রবধূকে, পুত্রকে নয়। যদিও শেষ সময়ে কোথা থেকে কি করে খবর পেয়ে এসেছিল সুকান্ত। শ্রাদ্ধশান্তি মিটিয়ে চলে গেছে নিশ্চিন্ত হয়ে, সব বাঁধন কাটিয়ে। ভবতারণ আগের মতই মেয়েকে নিজের কাছে এনে রাখতে চেয়েছিলেন, ইভাই রাজি হয়নি। শ্বশুরের সম্পত্তি এতদিন দেখাশোনার অভাবে নষ্ট হয়েছে, আর নাকি নষ্ট হতে দেওয়া চলে না। তাই ইভা শ্রীরামপুরেই থাকে আজকাল। কৃশানু শুনে অবাক হয়ে ভাবে—কার জন্যে এ যক্ষের ধন আগলে রাখছে ইভা? সে কি আশা করে পুডিঙের লোভে না হোক, অন্তত সম্পত্তির লোভেও একদিন ফিরে আসবে সুকান্ত?

ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বারে বারে মনে পড়ে। ইভার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনগুলো। সকাল দশটায় ছুটত য়ুনিভার্সিটিতে। চারটে বাজলে বেরিয়ে আসত। কখনও বসত গোলদীঘিতে, কখনও হাঁটতে হাঁটতে চলে যেত এসপ্ল্যানেডে। সেখান থেকে ধরত দক্ষিণমুখো ট্রাম। গিয়ে উঠত ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। যুগযুগান্তরের অযুত মনীষীদের নানা চিন্তাধারার শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার। রিজার্ভে রাখা বই ইস্যু করিয়ে পড়ত ঘণ্টা দেড় দুই। ছটা বাজলেই ভারি মিষ্টি একটা ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়। বই বন্ধ করে উঠে পড়ত। পীচ ঢালা পথটুকু পার হয়ে হাজরা রোডে হেঁটেই চলে আসত। শেড দেওয়া আলোকোজ্জ্বল টেবিলের একটা কোণা যেন ওকে টেনে নিয়ে আসত। সেখানে বসে ও ট্রানশ্লেসান সংশোধন করে দিত ওর ছাত্রীর আর সামনে বসে অঙ্ক কষত ইলু। কৃশানুর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে থাকত কখন নড়ে ওঠে জোড়া হাতী আঁকা শান্তিনিকেতনী পর্দাটা। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত তা যেন টেরই পাওয়া যায়না। ফিরে আসত আবার তিন নম্বর বাসে। আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গী পার হয়ে হু হু করে ছুটে এসে পৌছাত মেসে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢোকার আগে একনজর দেখে নিত কাঠের ছোট ডাকবাক্সটা। কোন কোনদিন ওর ভিতর থেকে উদ্ধার করত চিঠি। অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন ঘুম আসত না। চিঠি পড়া, জবাব লেখা অথবা আপন মনেই না দেখে লিপিবন্ধুর মানস চিত্রে যোজনা করত নূতন রঙ।

এখন এর কোনটাই নেই। না সেই য়ুনিভার্সিটিতে কলমুখরিত গুঞ্জন, না সান্ধ্য ট্যুইশানির মায়াজাল, না চিঠির কাগজে বিনিসুতোর মালা গাঁথা। চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে গেছে। মনে হয় সে পরিচ্ছেদও শেষ হয়েছে একেবারে। খান দুই চিঠি লিখে জবাব না পেয়ে শেষ পর্যন্ত রেজিষ্ট্রি চিঠি দিয়েছিল কৃশানু; প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছে সেটা। এই লিপিবন্ধুত্বের সুরু হয়েছিল যেমন আকস্মিকতায়, শেষও হল তেমনি ভাবে। স্বাহার শেষ চিঠিখানা পড়েছিল কৃশানু পরে। আর সেই জন্যেই বারে বারে লিখেছিল স্বাহাকে—কিন্তু সম্ভবত নতুন যোগসূত্র স্থাপন করতে স্বাহা রাজী নয়। শেষ চিঠিখানা কৃশানু প্রায়ই পড়ে, স্বাহা লিখেছিল—

স্টেশনে তোমাকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম। শুধু মর্মাহতই নয়, অপমানিতও। তখনও আসল কারণটা জানা ছিল না আমার। বাড়িতে এসেও মনটা শান্ত হল না। কেমন যেন একটা জ্বালা বোধ হচ্ছিল। সত্যিই তাহলে হেরে গেলাম সেই একটা অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বিনীর কাছে? বিয়েবাড়িতে অসংখ্য কাজ, চারিদিক থেকে সবাই আমাকে ঘিরে রইল সারাটা দিন। তবু মনটা লুকিয়ে লুকিয়ে গুমরে মরে। দাদা থাকলে এতটা দায়িত্ব ছিল না আমার। আমি আবার কলকাতার পথঘাট ভাল চিনিও না। সত্যি কথা বলতে কি, এখন বুঝছি মনে মনে তোমার উপর নির্ভর করেছিলাম অনেকটা। ভেবেছিলাম স্টেশন থেকেই ধরে নিয়ে যাব তোমাকে বিয়েবাড়িতে। সবার সাথে আলাপ করিয়ে দেব। লজ্জা ভেঙে গেলে আর কোন অসুবিধা তোমার হবে না। তোমার ছুটি হয়ে গেছে সুতরাং তোমাকে পুরোপুরি না পাওয়ার কোন কারণ নেই। দুজনে একসঙ্গেই সারতে পারব বিয়ের বাজার। তাই স্থির করলাম তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে। মাসতুত এক ভাইকে সঙ্গে করে গেলাম তোমাদের মেসে। শুনলাম কি একটা প্রয়োজনে তুমি দার্জিলিঙ চলে গেছ। কবে ফিরবে তা ওঁরা বলতে পারলেন না। আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি। তুমি আগে একটা চিঠিতে লিখেছিলে একজন বড় পুলিস-আফসারের মেয়েকে তুমি পড়াও। নামটাও মনে ছিল, ভবতারণ ঘোষাল। ভাবলাম ঘোষাল সাহেব নিশ্চয় বলতে পারবেন কতদিনের জন্য তুমি দার্জিলিঙ গেছ, তাঁর মেয়ের প্রাইভেট ট্যুটার কতদিন অনুপস্থিত থাকবেন। টেলিফোন গাইড খুঁজে হদিস পেতে দেরী হল না। টেলিফোন করলাম। ধরলেন ঘোষাল-তনয়া

ইভা দেবী। তোমার খোঁজ করছি শুনে জানতে চাইলেন আমি কে। বললাম, আমি তাঁর বান্ধবী। ইভা দেবী কি জানি কেন আলাপ করতে চাইলেন আমার সঙ্গে, নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়িতে। তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতে নয়, গেলাম নিজের গরজেই। তোমাকে জানবার কোন সূত্র তুমি আমাকে দাওনি, দেখাই যাক না এ ভদ্রমহিলার কাছ থেকে তোমার নতুন কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা।

গেলাম। হ্যাঁ, অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করা গেল বটে। জানলাম তুমি দার্জিলিঙে পৌঁছে দিতে গেছ ইভার ছোট বোনকে। ছোট বোন শুনে ভেবেছিলাম মেয়েটি এতই ছোট যে পৌঁছে না দিলে সতাই সে যেতে পারেনা। সে ভুল ভাঙল দেওয়ালে টাঙান ওদের তিন বোনের একটা ফটো দেখে। বুঝলাম, কেন তুমি স্টেশনে আসনি! কথাবার্তায় মনে হল শুধু আইভি আর ইভা দেবীই নয়, স্বয়ং ঘোষালসাহেবও তোমাকে খুব স্নেহ করেন। তিনি তোমাকে চান অতি নিকট আত্মীয়রূপে।

তাই এই চিঠি লিখছি। আমাকে মাপ কর তুমি। এত কথা আমি জানতাম না। তোমাকে একজন ব্রিলিয়াণ্ট কেরিয়ারের নিঃসম্বল ছাত্র বলেই জানতাম এতদিন—তাই জানতে দিয়েছিলে তুমি। আসলে তুমি যে স্বনামধন্য অপুত্রক ভবতারণ ঘোষালের জামাতা হবার স্বপ্ন দেখছ তা তো আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানাওনি এতদিন। জানালে ছেলেমানুষের মত এ প্রগল্ভতা কখনও করতাম না নিশ্চয়।

একটা কথা। আমি কৃশানু রায়কে মনে মনে যে রঙে এঁকেছিলাম, আজব শহর কলকাতায় এসে দেখছি কৃশানু রায় বাস্তবে সে রকম নয় মোটেই। আমি যে কৃশানু রায়কে চিনতাম সে কেমন জান? সে তুমি মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পার না, সে তুমি অনাত্মীয় কোন তরুণী মেয়ের সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণেব প্রস্তাবে মূর্ছা যাও, সে তুমি তোমার লিপিবন্ধুর কাছ থেকে কখনই গোপন করতে পার না তোমার আসন্ন বিবাহের সংবাদ!

আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে তোমাকে দেখতে। কেমন মানুষ তুমি? আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তুমি একবার এসে দেখা কর আমি পাটনা ফিরে যাবার আগে। যদি না আস তবে আমিই আবার একবার যাব তোমাদের মেসে। ভয় নেই—নতুন করে জড়াব না তোমাকে। আমার মনে আর কোন দুঃখ নেই; যে বেদনাটা পেয়েছিলাম তুমি স্টেশনে না আসায়

সেটা আর নেই। কোনও অপার্থিব মানসীর কাছে আমি হারিনি—হেরে গেছি রক্তমাংসে গড়া অপুত্রক পিতার একটি আধুনিকা কন্যার কাছে —এ তো খুবই স্বাভাবিক। তাই কোন খেদ নেই আমার। শুধু একবার অভিনন্দন জানাতে চাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। শুধু দেখব একটু তাকিয়ে তোমাকে। জেনে যাব যে অদেখা মানুষটাকে দূর থেকে ভালবেসে আমার জীবনের প্রথম স্বপ্ন গড়েছিলাম সে মানুষটা কেমন। তাতে নিশ্চয় আইভি দেবী রাগ করবেন না, কারণ সেই সাক্ষাৎই হবে আমাদেব প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। এরপর চিঠিপত্র লেখাতেও হবে ইতি।

দুখানা চিঠি লিখেও জবাব না আসায় শেষ পযন্ত রেজিষ্ট্রি চিঠি দিয়েছিল কৃশানু। সেখানা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছে। চিঠি গ্রহণ করেনি স্বাহা। হয়তো আগের চিঠি দুখানাও না পড়েই ছিঁড়ে ফেলেছে। এক একবার ভাবে যাবে নাকি চলে পাটনায়? আবার ভাবে কী দরকার? জীবনের এতগুলো বছর যদি এভাবে কেটে গিয়ে থাকে তবে বাকি কটা বছরও যাবে কেটে। মনকে বোঝায়—স্বাহাকে তো সে কোনদিনই ভালোবাসেনি—সুতরাং ক্ষতিও হয়নি কিছু তার।

অবশেষে চিঠি এল। খামটা খুলে আশাহত হল কৃশানু। না, পাটনার চিঠি নয়, এ চিঠিখানি এসেছে শ্রীরামপুর থেকে :

শ্রীচরণকমলেষু, আমার চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যাবেন নিশ্চয়। কিন্তু সত্যিই অবাক হওযার কিছু আছে কি? আপনি তো আমাকে একদিন বান্ধবী বলে স্বীকার করেছিলেন—বান্ধবীর চিঠি নিশ্চয় একেবারে অপ্রত্যাশিত বস্তু নয়।

আপনাকে কয়েকটা কথা না লিখে পারছি না। আগামী সপ্তাহেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। যাচ্ছি অনেক দূরে—মধ্যভারতে। আবার কবে বাংলা দেশে ফিরব জানি না। এলেও আপনি তখন কোথায় থাকবেন জানব কি করে? তাই যাওয়ার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই। রাখবেন আমার অনুরোধ?

জানেন নিশ্চয়, আমার শ্বশুর মারা গেছেন। তিনি তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দিয়ে গেছেন। শেষ সময়ে সংবাদ পেয়ে উনি এসেছিলেন। পিতাপুত্রে মিলন হয়েছিল, এইটুকুই সান্ত্বনা। কিন্তু মিল হয়নি বোধ হয়। কি জানি কী ভাবলেন আমার শ্বশুর, সব কিছুই আমাকে

দিয়ে গেলেন। বোধ হয় ভেবেছিলেন আর কিছুর জন্তে না হলেও—অন্তত আর্থিক কারণেও তিনি আমাকে স্বীকার করে নেবেন। অথবা হয়তো ভেবেছিলেন তাঁর সঞ্চিত অর্থ পুত্রের অধোগমনের পথ পিচ্ছিল করে তুলবে শুধু। সে যাই হোক তিনি আমার স্কন্ধে দিয়ে গেলেন দুর্বহ ভার।

উনি মধ্যপ্রদেশেই থাকেন, রায়পুর। সেখানেই চাকরি করেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন। আপনাকে জানাচ্ছি, কারণ জেনে নিশ্চয়ই খুশী হবেন আপনি—অশৌচাবস্থায় তিনি মদ স্পর্শ করেননি। আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম ওর দৃঢ়তা দেখে। তাহলে ইচ্ছা করলে তো ও সব পারে। আমার সঙ্গে কিন্তু তিনি বাক্যালাপও করেননি। অশৌচাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী নাকি একাসনে বসা নিষিদ্ধ—কিন্তু বাক্যালাপ করার বিধানও দিয়ে যাননি কি মনু-পরাশর? ঠিক জানি না। শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে তিনি কর্মস্থলে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমি কোন প্রকার সঙ্কোচ করিনি, সোজা গিয়ে প্রশ্ন করলাম—আমাকে তুমি কি করতে বল?

উনি আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, তোমার বিবেক যা বলে।

আমি বলেছিলাম—আমার বিবেক বলে, তোমার সঙ্গে যেতে।

আর তোমার এ সম্পত্তি?

তুমি যদি না নাও তাহলে দান করে যাব।

উনি অনেকক্ষণ কোন জবাব দেননি, তারপর আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, অপেক্ষা কর কিছুদিন। আমি ভেবে তোমাকে জানাব।

এতকথা আপনাকে কেন লিখছি জানি না। মনে হচ্ছে আপনাকে সব কথা লিখলে মনটা হাল্‌কা হবে। একদিন আপনি সসঙ্কোচে প্রশ্ন করেছিলেন আমার স্বামীর সম্বন্ধে, তিনি একজন অমানুষ এই ধারণাই নিয়ে গেছেন আপনি। সেটা আপনার ভুল ধারণা, বোধ হয় এটা না জানিয়ে চলে যেতে পারছি না—তাই হয়তো এতকথা লিখে ফেললাম।

আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হল উনি গেছেন, ঠিক তিন সপ্তাহ নয়, আজ নিয়ে উনিশ দিন। কাল তাঁর চিঠি পেলাম। লিখেছেন আমাকে তৈরি হয়ে থাকতে। আগামী সোমবার তিনি আমাকে নিতে আসছেন। আরও লিখেছেন—না, থাক সে সব কথা।

মাস্টার মশাই, কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি। মনটা ভীষণ চঞ্চল

হয়ে রয়েছে। যাওয়াই স্থির করেছি। আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। আগামী রবিবার সকালে আপনি শ্রীরামপুরে আসুন। আমি অবশ্য আজই কলকাতা যাচ্ছি, বাবাকে প্রণাম করে আসতে। কিন্তু আমি চাই না সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। কালই আমি শ্রীরামপুরে ফিরে আসব। আপনি যদি রবিবারে আসেন তা হলে এখানেই দেখা হবে। যাবার আগে আবার একটা দিন আপনাকে নিজে সামনে বসিয়ে খাওয়াতে ইচ্ছা করছে। এখানে সেদিনকার মত দুপুরে বিশ্রাম করে সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে যাবেন।

আশা করি, আমার এ ভিক্ষা মঞ্জুর হবে। প্রণাম নেবেন। ইতি।

চিঠিখানা পড়ে কৃশানু মনে মনে হাসে। ইভা নাকি তার বান্ধবী! বন্ধুকে কেউ শ্রীচরণকমলেষু পাঠ লেখে, না প্রণাম জানিয়ে শেষ করে চিঠি? এ কেমনতর বান্ধবী তার?

ইভার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সন্ধ্যাবেলা গেল সে হাজরা রোডের বাড়িতে। দীর্ঘ—দীর্ঘদিন ইভা ওর সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখেনি। সেই শ্রীরামপুর থেকে ফেরার পর থেকেই সে দূরে সরে গিয়েছিল। তারপর অবশ্য দার্জিলিঙ যাওয়ার দিন দেখা হয়েছিল, কিন্তু সে দেখা যেন না হলেই ভাল ছিল। সেদিন দেখা গিয়েছিল অভিমানী ইভাকে। তারপর এই চিঠি!

হাজরা রোডের বাড়িতে কিন্তু ইভার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। সে এসেছিল এবং চলেও গেছে। দেখা হল ভবতারণের সঙ্গে। বাক্যালাপও হল কিছুটা। কথা বলতে গিয়ে খেয়াল হয় কৃশানুব দার্জিলিঙ থেকে ফিরে এসে সে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎই করেনি। এটা অন্যায় হয়েছিল নিশ্চয়। আইভি অবশ্য নিজেই নিশ্চয় নিরাপদ পৌছান সংবাদ দিয়েছে—কিন্তু তারও উচিত ছিল ফিরে এসে সে কথা বলা। তাছাড়া যে উদ্দেশ্যে তাকে পাঠিয়েছিলেন ভবতারণ সে উদ্দেশ্যের যে যবনিকাপাত ঘটেছে এটাও আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য। সে কথার সুরুতেই তাকে বাধা দিয়ে ঘোষাল সাহেব বলেন, আই নো, আই নো; ইভা আমাকে বলেছে সব কথা। দোষ আমারই। আমারই উচিত ছিল তোমাকে সাবধান করে দেওয়া। আমার খেয়াল হয়নি তুমি এভাবে আমার ট্রাম্প-কার্ডটা এক্সপোস করে দিতে পার।

যথারীতি অবোধ্য মনে হয়েছিল কথাগুলো। কৃশানু জানে অপেক্ষা করলে পরবর্তী কথার সূত্র থেকে বোঝা যাবে পূর্ববর্তী বক্তব্যে কি বলতে চেয়েছেন ঘোষাল সাহেব। এতদিনের পরিচয়ে এটুকু সে বুঝতে শিখেছে যে একবারে বোঝা যায় না ভবতারণের কথা। এবার কিন্তু পরবর্তী যোজনাটা আরও দুর্বোধ্য মনে হল ওর। ওয়াইন গ্লাসটা পূর্ণ করতে করতে ঘোষাল সাহেব বললেন, আই সুড হ্যাড এ্যাডভাইস্‌ড যু টু ইলোপ উইথ হার বিহাইণ্ড মাই ব্যাক।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় কৃশানু দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে।

কি, বুঝতে পারলে না আমার কথা? দেন রীড দিস্‌ লেটার—

টানা ড্রয়ার খুলে একটা খাম বার করে সেটা গুঁজে দেন কৃশানুর হাতে। কৃশানু খামটা খুলে পড়তে থাকে, আর আড়চোখে লক্ষ্য করে পানরত ঘোষাল সাহেবকে। চোখ দুটো তাঁর ইতিমধ্যেই জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে।

চিঠিখানা লিখছেন কানপুরের সেই বিখ্যাত ব্যবসায়ী চৌধুরী মশাই—লিখেছিলেন ঘোষাল সাহেবকেই। দ্রুত চোখ বুলিয়ে যায়। মেয়ে দেখে ফিরে গিয়ে কানপুর থেকে ভদ্রলোক চিঠিখানা লিখেছিলেন, তা বোঝা যায়। আশ্চর্য, চৌধুরী সাহেব জানাচ্ছেন, আইভিকে তাঁর পছন্দ হয়েছে। লিখছেন, তিনি বিলাতী কেতার মানুষ, তাঁর সংসারে প্রাচীন অন্ধ সংস্কারকে তিনি কোথাও ঢুকতে দেননি। কৌতুক করে লিখেছেন সেইজন্যেই মেয়ে দেখতে যাবার দিন চল্লিশ বছর পরে তিনি প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবী পরেছিলেন। তিনি সত্যিকারের আলোকপ্রাপ্তা একটি আধুনিকা মেয়ের সন্ধান করছিলেন। তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক নাকি সারা ভারতে বিস্তৃত। নিজে বিবাহ করেছেন একটি মারাঠি পরিবারে—তাঁর ছোট ভাই একজন পাঞ্জাবিনীকে। সবকয়টি পরিবারই প্রগতিপন্থী। মেয়ে দেখার জন্য যে অভিনয় তাঁকে করতে হয়েছিল তা শুধু মেয়ে সত্যিকারের আধুনিকা কিনা তাই যাচাই করতে। না হলে বিবাহ ব্যাপারে তিনি পণপ্রথা এবং মেয়ে দেখানোর বিরোধী। শেষ দিকে ভদ্রলোক লিখছেন, আপনি বলিতে পারেন, এতই যদি আপনি প্রাচীনতা-বিরোধী তাহা হইলে নির্বাচনভার পুত্রের উপর অর্পণ করেন নাই কেন? আমি বলিব তাহাই করিয়াছি। গত বৎসর আমার পুত্র দার্জিলিঙে বেড়াইতে যায়—সেখানে আইভির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। তবে

সে যে আমারই পুত্র এ কথা আপনার কন্যা জানিত না। সম্ভবত এখনও জানে না। যাহাই হউক, আমি সর্বান্তঃকরণে আপনার কন্যাকে অনুমোদন করিতেছি। আমার পুত্রের নিকট জানিয়াছি আপনার কন্যাও তাহাকে পছন্দ করিয়াছে। এখন আপনার কন্যা এই প্রাচীনপন্থী শ্বশুরটিকে বরদাস্ত করিতে রাজী হইলেই শুভস্য শীঘ্রম্।

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, পুত্রের বিবাহে কোনও সর্ত আরোপ করিব না। কোন দাবী থাকিবেনা আমার তরফে। আপনাব কন্যাকে দেখিতে গিয়া বুঝিয়াছি আমার সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। আমার সেই সর্তটি হইতেছে নিম্নোক্তরূপ—আমি যেদিন আপনার কন্যাকে আশীর্বাদ করিতে যাইব সেই দিন তাহাকে কলিকাতার উপকণ্ঠে আমার একটি বাড়ির দানপত্র এবং পঁচিশ হাজার টাকার একখানি কোম্পানীর কাগজ তাহাকে দিয়া আশীর্বাদ করিব। সর্ত এই যে আপনার কন্যাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমাকে কথা দিতে হইবে যে ব্যবসায়ে আমি যদি সত্যই কোনদিন দৈবদুর্বিপাকে দেউলিয়া হইয়া পড়ি তবে ঐ মাবাত্মক প্রশ্নটি সে আর আমাকে কখনও করিয়া বসিবে না।

দেখলে? প্রশ্ন করেন ঘোষাল সাহেব।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ভয়ে ভয়ে বলে কৃশানু।

বলতে পার এর পর কি হল? ঘোলাটে-লাল চোখ দুটো মেলে প্রশ্ন করেন ভবতারণ। তাবপর কৃশানুর জবাবের অপেক্ষা না করেই বলেন, আইভি রাজি হয়নি এ সর্ত মেনে নিতে।

রাজি হয়নি! কেন?

একই ভুল! ট্রাম্প-কার্ডটা দেখে ফেলেছে আইভি! আর হার মানবে কেন। আর ভুল কি একা আইভি করছে? সবাই আমরা ভুল করে যাচ্ছি শুধু আজীবন। ভুল করছি আর ভুলে যাচ্ছি; কিন্তু আমাদের সে ভুল সে কথা ভুলছে না—চক্রবৃদ্ধিহারে মাশুল আদায় করে নিচ্ছে সে। শী ইজ এ স্টার্ন মিষ্ট্রেস্!

নিঃসন্দেহে মাতলামী শুরু করেছেন এবার ভবতারণ। বড় মেয়ে চলে গেছে শ্রীরামপুরে; মেজ মেয়ে ছুটিতেও বাড়ি আসেনি, ছোট মেয়ে গেছে তার মাসীর বাড়ি। ভবতারণ শালীনতার মাত্রা ছাড়াতে বোধ হয় আর কোন দ্বিধা বোধ করছেন না। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করছেন নিজের ঘরে

বসে। আর্দালীটা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। বরফ, সোডা, হুইস্কি, স্ন্যাকস্ যোগান দিয়ে যাচ্ছে—দিয়ে যাবেও যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে তাঁর। তারপর উনি যখন এলিয়ে পড়বেন ইজিচেয়ারটায়, তখন খুলে দেবে জুতো-মোজা-টাই-কলার। ধরাধরি করে শুইয়ে দেবে খাটে। প্রসাদের অবশিষ্টাংশটুকু গলাধঃকরণ করে রামপ্রসাদী ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ি ফিরে যাবে মধ্যরাত্রে।

চুপি চুপি পালিয়ে এসেছিল কৃশানু ঘর থেকে।

এবার আর ওকে দেখে হাত তুলে নমস্কার করল না ইভা, চটুল ভঙ্গিতে বলল না, স্বপ্ন, না মায়া, না গতজন্মের পুণ্যফল। কৃশানুর সামনে এসে গলায় আঁচল দিয়ে ওর পদপ্রান্তে নামিয়ে দিল একটি সলজ্জ প্রণাম। প্রথম শ্রেণীর পুলিস অফিসারের লরেটো-লালিত কন্যার এ আচরণ কিন্তু একটুও অসঙ্গত মনে হল না কৃশানুর। বসল এসে গদি আঁটা একটি সোফায়। ঘরটার পরিবর্তন লক্ষণীয়। ছোবড়া-ওঠা সোফা সেটগুলো সংস্কার করা হয়েছে। জানলায় উঠেছে হাল্কা নীল রঙের কাজ করা পর্দা। টিপয়ের উপর সেদিনকার সেই ঊর্ণনাভ অধ্যুষিত রূপার কাপগুলি ঝকঝক্ করছে। সারিবদ্ধভাবে সেগুলি সাজান, ছোট থেকে বড়—বড় থেকে ছোট। সমস্ত পরিবেশটাই ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। সে কথাই বলল কৃশানু প্রথমে, আপনি তো ঘরখানাকে একেবারে ঢেলে সেজেছেন।

ওর কাঁধ থেকে শান্তিনিকেতনী হাতব্যাগটা খুলে নিয়ে আলনায় টাঙিয়ে রাখতে রাখতে ইভা বলে, মানুষজন থাকলেই ঘরের শ্রী ফেরে।

মানুষজন নয়, গৃহলক্ষ্মী থাকলেই লক্ষ্মীশ্রী ফেরে। আমাদের মেসের ঘরে আমরা চারজন মানুষ থাকি কিন্তু কই শ্রী তো ফেরে না।

হেসে ইভা বলে, চার বন্ধু তাহলে চারটি লক্ষ্মীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ুন।

আবার সেই চটুল লাস্যময়ী ইভা।

কৃশানুও আজকাল কথার পিঠে কথা বলতে শিখেছে, বলে, লক্ষ্মীলাভ করা কি অতই সহজ ইভা দেবী। লক্ষ্মীর পিছন পিছন হিমালয় পর্যন্ত তো ধাওয়া করলাম, লক্ষ্মীছাড়া কপালে কিছু জুটলো কি?

তার জন্য আপনি নিজেই দায়ী। অবশ্য শুধু আপনার নয়, ভুল আমাদেরও

হয়েছে। অন্তত আমার উচিত ছিল সব কথা বলে আপনাকে সাবধান করে দেওয়া।

কৌতূহলী হয়ে কৃশানু বলে, ব্যাপারটা কি বলুন তো? আপনার বাবাও সেদিন এই ধরনের কি একটা কথা বললেন, বুঝতে পারিনি।

এখন অবশ্য পোস্টমর্টামের কোন মানে হয় না। যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে, সংশোধনের আর পথ নেই কোন। তবু যাবার আগে আপনার একটা ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে দিয়ে যাব আমি। না হলে আমার বোনটির প্রতি আপনি অহেতুক অবিচার করবেন মনে মনে। আচ্ছা, জয়ন্ত শীল অথবা অর্ধেন্দু চৌধুরীকে সে বিয়ে করতে কেন রাজি হয়নি জানেন?

জয়ন্ত শীলের নাম শুনেছি, কিন্তু অর্ধেন্দু চৌধুরী কে?

কানপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী চৌধুরী মশায়ের একমাত্র ছেলে। কেম্ব্রিজের গ্র্যাজুয়েট, সুন্দর চেহারা, ভাল এ্যাথলেট, আর আইভির অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বুঝলাম, এঁর বাবাই একটি বাড়ি আর কোম্পানীর কাগজ দিয়ে আশীর্বাদ করতে চেয়েছিলেন আইভিকে। কিন্তু আইভি রাজি হয়নি কেন?

তা যদি বুঝতেন তাহলে একথাও বুঝতেন কেন সেদিন হঠাৎ হোটেল থেকে চলে গিয়েছিল আইভি।

মাথা নীচু করে কৃশানু বলে, আপনাকে তাহলে সত্যিই সে সব কথা লিখেছে?

সব। আপনি বিশ্বাস করুন মাস্টারমশাই, একটা কথাও সে মিথ্যা বলেনি আপনাকে। ওর অসংখ্য বয-ফ্রেণ্ড আছে, কিন্তু আজও সে অনাঘ্রাতা। আপনার মত সেও একটা মানসিক অসুখে ভুগছে। আপনার মনোবিকলনের কারণ অবশ্য আমি জানি না। হয়তো মনোবিদেরা তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, কিন্তু রোগমুক্তির যে মহৌষধ আইভি প্রেসক্রাইব করেছিল, আমার মনে হয় সেটাই একমাত্র অব্যর্থ। আপনি মাথা তুলুন মাস্টারমশাই, এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, অসুখ অসুখই। আর যে অসুখের যে ওষুধ।

তবু মাথাটা তুলতে পারে না কৃশানু। স্বাহাকে সে সব কথা জানিয়েছিল, কোন সঙ্কোচ বোধ করেনি, বোধ হয় কাগজ-কলমের মাধ্যমে সেটা ঘটেছিল বলে। বলেছিল আইভিকেও—তখনও লজ্জা বোধ করেনি, কারণ তার পূর্বেই প্রগল্‌ভ আইভি খুলে দিয়েছিল নিজের মনের কপাট, তার লজ্জাকর

গোপন কথা অকপটে জানিয়েছিল কৃশাহ্নকে। কিন্তু ইভার সঙ্গে ওর সে সম্পর্ক নয়। ইভাও প্রগলভ, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রেখে চলে সে। ক্ষণিক বিহ্বলতার একটি মুহূর্ত ছাড়া ওরা 'আপনি'র দূরত্ব মেনে চলে আজও মৌখিক বন্ধুত্ব স্বীকার করলেও। তাই ইভা ওর গোপন কথা জেনে ফেলেছে শুনে কৃশান্ম বেশ একটু আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা নজর এড়ায় না ইভারও। তাই সে নানা বাজে কথায় স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। ইভা বলতে থাকে—আমার দাদামশায়ের কথা আপনাকে আগেও একদিন বলেছি বোধ হয়। এখনও তিনি বেঁচে আছেন। বিরাশী বছরের পঙ্গু বৃদ্ধ। আজীবন আচার নিষ্ঠাকেই আঁকড়ে আছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত। এখনও স্বপাক আহার করেন। মাঝে তিনি ভীষণ অসুখে পড়েন। রান্না করার ক্ষমতা ছিল না। অথচ আমাদের ছোঁয়া তিনি খেতেন না। ডাক্তারে বলছে তাঁকে পুষ্টিকব খাবাব খেতে, কিন্তু উঠে বসে বাঁধবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। মামীমা বলতেন, আমার রান্না খেলে কি সত্যিই আপনাব জাত যাবে বাবা? আপনাকে রেঁধেবেড়ে খাওয়াতে কি আমাদের সাধ যায় না? আমার দাদামশাই হেসে বলতেন, জাত যাবে কেন মা। খাব, তোমার হাতে খাব, তবে তোমার কোলে আবাব এসে যখন জন্মাব তখন খাব।

অসুখ যখন বেড়ে গেল তখন ডাক্তারবাবু বললেন, এঁকে চিকেন ব্রথ খাওযাতে হবে। না হলে বাঁচবেন না উনি। আমরা বুঝলাম, তাহলে মারাই যাবেন উনি এবাব। ও বাহুল্য অনুবোধটা কেউ কবল না তাঁকে, করতে সাহসও পেল না। দাদামশাই বললেন, ডাক্তার এমন কোন ওষুধ দিতে পার, যাতে উঠে বসে দুটো ফুটিযে নিতে পাবি? আমি ভাত খাই না, তাই এ বেটাবেটিদের মুখে অন্ন রোচে না।

ডাক্তারবাবু বললেন—পারি, কিন্তু আপনাকে চিকেন ব্রথ খেতে হবে।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ডাক্তারবাবুর দুঃসাহস দেখে। দাদামশাই একটু চুপ কবে থেকে বললেন, ডাক্তার, তাহলে এমন কোন ওষুধ দিতে পার, যাতে শিগগির শিগগির যেতে পারি?

এবারও ডাক্তারবাবু সেই দুঃসাহসিক হাসি হেসে বললেন, পারি—কিন্তু সেটা দেওয়া আমাদের শাস্ত্রে মানা। আপনি যেমন আপনার শাস্ত্র মেনে চলেন, আমাকে তেমনি আমার শাস্ত্রও তো মেনে চলতে হবে। উপায় নেই, এমনি ভাবেই দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে হবে আপনাকে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে দাদামশাই বললেন, নিয়ে এস চিকেন ব্রথ। আমি খাব। যদি মরতেই না পারি, তবে এদের না খাইয়ে মারি কেন? আতুরে নিয়ম নাস্তি।

আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, দাদামশাই মুরগীর জুস খেলেন—আবার যেদিন গিয়ে বসতে শুরু করলেন উনুনের পাড়ে, সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেল শুধু মুরগীর জুসই নয়, যাবতীয় ঔষধ।

দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে ইভা বলে, তাই বলছিলাম মাস্টারমশাই, অসুখ অসুখই। আর যে অসুখের যে ওষুধ।

গল্প শুনতে শুনতে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছিল কৃশানুর। কাহিনী শেষে সেই পুরানো কথাতেই যখন ফিরে যেতে চাইল ইভা তখন বাধা দিয়ে কৃশানু বলে, আপনি আইভির কথাই বলুন। কেন সে কাউকে পছন্দ করতে পারল না, জয়ন্তকে নয়, অর্ধেন্দুকে নয়, আমাকেও নয়।

সেই কথাই তো বলছি। আপনার রোগের উৎপত্তিস্থল কোথায় তা আমি জানি না—কিন্তু আইভির কথা জানি। আপনি জানেন, আমার মা তিল তিল করে আত্মহত্যা করেছিলেন। হ্যাঁ, আত্মহত্যাই। গলায় দড়ি না দিয়ে, গঙ্গায় ঝাঁপ না দিয়েও মেয়েরা আত্মহত্যা করে, আর তার প্রমাণ আমার মা। সে দুর্ঘটনা প্রচণ্ড আঘাত করেছিল কিশোরী আইভির মনে। সে প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হল। বাবার যে উচ্ছৃঙ্খলতা মায়ের বুকে মৃত্যুশেল হেনেছিল, সেই শেলই আইভি চাইল দ্বিগুণ জোরে হানতে বাপের বুকে। মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে নিজের অগোচরেই শুরু করল উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে। কথায়-বার্তায়, চলনে-বলনে ও হয়ে উঠল একবিংশশতাব্দীর মেয়ে। সতীত্ব ওর কাছে একটা, কি যেন কথাটা—হ্যাঁ, 'টাবু'। নরনারীর সম্পর্ক একটা সাময়িক বিলাস। তার তর্ক শুনে, তার থিয়োরী শুনে মানুষে তাকে ঘৃণা করতে বাধ্য হয়, ও সেটা রেলিশ করে। আরও খুশী হয় কেউ যদি সে কথা গিয়ে বলে দেয় বাপিকে। বাপিকে আঘাত করবার জন্যেই যে সে ঝুঁকে পড়েছে এদিকে। অথচ কী বিচিত্র এ দুনিয়া মাস্টারমশাই, মুখে ক্ষণিকবাদিনী হলেও মনে মনে ও ভীষণ পিউরিটান! তার জীবনের আদর্শ হচ্ছেন আমার মা। সেকথা সেও জানে না, জানি আমি। সেকথা যদি আমি ওকে বলি ও হেসে গড়িয়ে পড়ে বলবে, মিলি আইডিয়া। কিন্তু আর কেউ না চিনলেও আমি তাকে

ওতপ্রোতভাবে চিনেছিলাম। সে যদি মনে প্রাণে মায়ের মত পিউরিটান না হত তাহলে কখনই ওর অবচেতন মনে মায়ের মৃত্যুটা এতবড় আঘাত করত না, কিছুতেই প্রতিহিংসাপরায়ণতার উদগ্র নেশায় মাতাল হয়ে বিকৃত করে তুলত না নিজের জীবন। সে রাত্রে ছবি আঁকার জন্যে সিটিং দেওয়ার আগে আপনি যে দুটি সর্ত আরোপ করেছিলেন, আমি জানি সে দুটিই ছিল বাহুল্য—

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে কৃশানু বলে, কিন্তু কেন সে আমাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করল বারে বারে তা তো বললেন না—

তাইতো বললাম এতক্ষণ। আইভি এমন একজন পুরুষকে বিয়ে করতে চায় যাকে জামাতা বলে গ্রহণ করতে পারবে না বাপি। যাকে বিয়ে করায় রাগে-দুঃখে-অপমানে আমার বাবা ঘাড় ধরে বার করে দেবে আইভিকে রাস্তায়। শুনতে অদ্ভুত লাগছে, নয়? কিন্তু এ কথা সত্য, অভ্রান্ত সত্য! আমার ভয় হয় মাস্টারমশাই, এই বিকৃত মন নিযে সে না শেষ পর্যন্ত কোন গলিত-কুষ্ঠরোগীকে বিয়ে করে বসে।

শিউরে ওঠে কৃশানু।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ইভার।

কৃশানু এবারও প্রসঙ্গটা পালটে নেয়। অন্য কথা পাড়ে। কেমন করে ইভার শ্বশুরের মৃত্যু হল—শ্রাদ্ধশান্তির কথা, ইলুর একা পড়ে যাওয়ার কথা। অনেক আজেবাজে কথার পর ইভাব মনটা বোধ হয় হালকা হয়ে আসে। স্বাভাবিক চটুল কণ্ঠে সে বলে, আপনি বিয়ে করছেন কবে, বলুন। তখন আবার আসব বাংলাদেশে।

বিয়ে! পাত্রী কোথায়?

পাত্রীর অভাব কি? ভঙ্গ হলেও এটা রঙ্গভরা বঙ্গদেশ।

বঙ্গদেশ হলেই বা কি? আমি যাই বঙ্গে, তো কপাল যায় সঙ্গে। চালচুলোহীন এমন একটা বেকার ভবঘুরেকে বিয়ে করবে কে?

হেসে ইভা বলে, নিজের নিন্দা শুনতে এতই ভাল লাগে?

তার মানে?

তার মানে, এর জবাবে তো আমাকে বলতে হবে—আপনি য়ুনিভার্সিটির একজন অতি খারাপ ছেলে, সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করতে না পেরে আপনি নাইন্থ হন, এম এ তে কিছুতেই আপনার সেকেণ্ডক্লাস জুটবে না, তারপরে

কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় কিছুতেই ফেল করতে পারবেন না—বলতে হবে না-সাজলেও আপনাকে খারাপ দেখায় না, আপনার—

থামিয়ে দিয়ে কৃশানু বলে, আপনি স্নেহ করেন, তাই এ চোখে দেখেন—

আর যিনি স্নেহের বদলে অন্য কিছু করেন, তিনি ?

কে ?

পাটনা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী স্বাহা মিত্র ?

কৃশানু গম্ভীর হয়ে বলে, তাঁর সঙ্গেও সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে। দুখানা চিঠি লিখেও জবাব পাইনি, শেষে রেজিষ্ট্রি চিঠি দিই, রিফিউস্‌ড হয়ে ফিরে এসেছে।

ইভা মুখ টিপে হাসে, ওমা, সে কি! ষাট, ষাট, আমাকে তাঁর ঠিকানাটা বলুন, আমিই না হয় সুপারিশ করে একখানা চিঠি দিই।

বেদনাহত কৃশানু বলে, আপনি কি এভাবে অপমান করবেন বলেই আমাকে ডেকে এনেছেন ?

এবার সত্যিই লজ্জা পায় ইভা। বলে, ছি ছি! আপনি এতটা মর্মাহত হবেন বুঝতে পারিনি। আমারই ভুল, ওটা আপনার একটা বেদনার স্থান। আচ্ছা ও কথা আর বলব না। চা খাবেন তো এককাপ স্নানের আগে ?

কৃশানুও মনটা হালকা করে বলে, খেতে পারি যদি আইভির মত বিনা চিনির চা সার্ভ না করেন।

ইভা উঠছিল, বসে পড়ে বলে, তাহলে তো আমি নাচার। চায়ে চিনি মিশিয়ে সার্ভ করা আধুনিক এটিকেট-বিরুদ্ধ।

কৃশানু বলে, কিন্তু আপনি তো সে এটিকেট মানেন না—সে তো আপনার বোনের এটিকেট। আপনি তো চিনি মিশিয়েই চা সার্ভ করেছেন এতকাল।

গালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে চোখ বড় বড় করে ইভা বলে, ওমা, কি মিথ্যুক আপনি! এমন এটিকেট-বিরুদ্ধ কাজ করতে পারি কখনও আমি। এমন করে আমার বদনাম করবেন না। সোসাইটিতে এ খবর রটে গেলে আমার মাথা কাটা যাবে না! আপনার চায়ে চিনি মেশাতে দেখেছেন কখনও ?

কৃশানু বলে, তাহলে কবন্ধ হয়েই আপনাকে থাকতে হয়। চিনি মেশাতে না দেখলে কি হবে, খেয়েই বুঝেছি চিনি মেশান হয়েছে।

যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে ইভার, তাই বলুন। বাঁচালেন এতক্ষণে। ওটা আপনার ভুল ধারণা; চিনি আমিও মেশাই না। আপনার মিষ্টি লাগে আমার হাতের গুণে।

বলেই উঠে পড়ে তড়িৎগতিতে। চটুল ভঙ্গি করে চলে যাওয়ার উপক্রম করে। কৃশানুর হঠাৎ কি যেন হয়—খপ করে ওর দোলায়িত আঁচলটা ধরে ফেলে বলে, একি, পালাচ্ছেন কোথায়?

ইভা থেমে পড়ে। তৎক্ষণাৎ কাপড়টা ছেড়ে দেয় কৃশানু। ছি ছি! কী কেলেঙ্কারি! যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে আঁচলটা কাঁধের উপর ফেলে ইভা হেসেই বলে, বারে! চা করে আনি।

নতনেত্রেই কৃশানু বলে, দাঁড়ান, আপনার জন্যে দার্জিলিঙ থেকে একটা জিনিস এনেছি, দিই।

ইভা আবার বসে পড়ে, বলে, কী সৌভাগ্য! এতক্ষণ বলেননি—দিন দিন।

শান্তিনিকেতনী কাঁধব্যাগ হাতড়ে কৃশানু বার করে একছড়া দার্জিলিঙ পাথরের মালা। দাঁড়ায় এসে ইভার সামনে। ইভা হাত পাতে না। গম্ভীর হয়ে বলে, স্যুটকেশ নিতে হয় মাটিতে নামিয়ে, পান নিতে হয় হাতে-হাতে —কিন্তু মালা যে কি ভাবে নিতে হয় তা তো ছাত্রীকে শেখাননি মাস্টার মশাই।

সামনে হাত গুটিয়ে বসা ইভার দিকে তাকিয়ে দেখে কৃশানু। ওর জোড়া ভ্রূর দু পাশে দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের কোণা দুটি নীচের দিকে একটু বেঁকে গেছে—মুখ টিপে হাসছে আর কি। কাছাকাছি বসায় ওর গা থেকে কেমন একটা প্রসাধনের মৃদু সৌরভ উঠছে। কৃশানুর স্নায়ুতন্ত্রীর উপর সে গন্ধ যেন আবেশ-বিহ্বল একটা স্পর্শ বুলিয়ে গেল। পায়ের পাতা থেকে একটা সিরসিরানি উঠতে সুরু করেছে মেরুদণ্ড বেয়ে। এ অনুভূতি ওর চেনা। এখনই একটা কিছু করতে হবে। তাড়াতাড়ি পায়ের বুড়ো আঙুলটা বাঁকিয়ে সমস্ত শরীরের চাপ দিল সে ঐ একটা আঙুলে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে সম্বিত ফিরে পায়। না, দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি তার। বেঁচে গেছে; আসন্ন আক্রমণের হাত থেকে অক্ষত ফিরে আসতে পেরেছে। বেদননীল পায়ের আঙুলটা কিছুই না। তীব্র একটা মর্মভেদী আর্তনাদ কোনক্রমে গলাধঃকরণ করে বসে পড়ে সোফার উপর।

ইভা কি বুঝল কে জানে। শব্দ না হলেও যন্ত্রণার একটা আভাস

নিশ্চয় পড়েছিল ওর মুখের কুঞ্চিত মাংসপেশীতে। কিছু একটা আন্দাজ নিশ্চয় করেছে ইভা। তাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, চা করে আনি, বসুন।

ইভা চলে যায়। মালাটা ধরাই থাকে কৃশানুর হাতে।

আঙুলটা নীল হয়ে উঠেছে। রক্ত জমে যাচ্ছে বোধ হয়। আস্তে আস্তে বুড়ো আঙুলটায় হাত বুলাতে থাকে। তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা সত্বেও কৃশানু খুশী হয়ে উঠেছে ভিতরে ভিতরে। রোগের অবশ্য নিরাময় হয়নি, কিন্তু একটা টেম্পরারি রিলিফের সন্ধান সে পেয়েছে দৈবাৎ। দৃষ্টিবিভ্রমকে সাময়িকভাবে ঠেকিয়ে রাখবার মত একটা কৌশল সে আয়ত্ত করেছে এতদিনে।

প্রায় দশ মিনিট পরে ঘরে এল—না ইভা নয়, বাড়ির একজন ঝি। ওর সামনে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে একগ্লাস ঘোলের সরবৎ। বরফ দেওয়া। চায়ের বদলে সরবৎ কেন এল তা বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি ভাসমান বরফের একটা বড় টুকরো নিয়ে ঘষতে থাকে পায়ের বুড়ো আঙুলটায়। অনেকক্ষণ পরে ইভা যখন ফিরে এল তখন পায়ের ব্যথাটা অনেকটা সেরে গেছে। কৃশানু ভেবে রেখেছিল ইভা এলেই ও বলবে—চা-টা বেশ ভালোই তৈরী করেছিলেন, কিংবা এই জাতীয় কিছু।

কিন্তু মাঝের গা-তালা লাগান দরজাটা খুলে ইভা যখন এসে দাঁড়াল তখন সে কথা বলতে ভুলে গেল কৃশানু। অত্যন্ত কঠিন একটা কথা এল ওর মুখে—কিন্তু সে কথাটাকেও গলাধঃকরণ করতে হল। ইভার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে—সে সম্পূর্ণ সচেতন নিজের অপরাধের গুরুত্ব বিষয়ে। তাই কোন কথা বলার আগেই কৃশানুর নীরব তিরস্কারে মাথা নত করে দাঁড়ায় দরজার পাশেই। দৃষ্টি নত হয়ে পড়ে, মাথাটা আর তুলতে পারে না।

ইতিমধ্যে ইভা স্নান সেরে এসেছে। ভিজে চুল বাঁধেনি। আইভির মত ছোট করে ছাঁটা নয় ওর চুল—ঘন-কালো গোছ গোছ চুল লুটিয়ে পড়েছে পিঠের উপর। সে জন্যে নয়—কৃশানু মর্মাহত হয়েছিল অন্য একটা কারণে। স্নানান্তে ইভা বেশ পরিবর্তন করেছে। ও পরেছে হাল্‌কা চাঁপা রঙের সেই শাড়িখানাই, ডীপকাট সেই লালরঙের জ্যাকেট আর সেই লকেট হার। ভুলে নিশ্চয়ই যায়নি সে—এত সহজে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে এ আচরণের অর্থ কি? ইভা তো আইভি নয়! প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল কৃশানু মনে মনে। অনেক উঁচু একটা সম্মানের মঞ্চ থেকে মনে মনে

ইভাকে নামিয়ে আনল। সম্মানের শ্রদ্ধার যে নৈবেদ্য সজ্জিত ছিল কৃশানুর অন্তরে এই মহিমময়ী নারীর উদ্দেশ্যে, মুহূর্তে যেন খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ল সেই নৈবেদ্যর থালাখানা। এত ছোট ইভা? এমন করে সে প্রলুব্ধ করতে চায় কৃশানুকে! সমস্ত কথা জানার পর! আজ বাদে কাল যে স্বামীর ঘর করতে যাবে তার পক্ষে এ আচরণ শুধু প্রগল্‌ভ নয়, আরও কদর্য কোন শব্দে তার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

মনে মনে শক্ত হয় কৃশানু। না, কোন ভ্রান্ত পদক্ষেপ করবেনা সে। ইভার কোন চটুলতায় আর সাড়া দেবে না। ওর পোশাক নিয়েও কোন কথা সে বলবে না। যেন সে লক্ষ্যই করেনি এ ইঙ্গিত।

হঠাৎ খেয়াল হল কৃশানুর প্রায় দু তিন মিনিট কেটে গেছে ইভা ঘরে আসার পর। ওরা দুজনেই নীরব রয়েছে। ইভা যেন প্রত্যাশা করে আছে কৃশানু কিছু বলবে। যা বলার কথা, তা না বলে কৃশানু স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললে, এবার তাহলে আমিও স্নানটা সেরে নিই।

এত জোরে স্বস্তির নিঃশ্বাসটা পড়ল ইভার যে এতদূর থেকেও তা স্পষ্ট শুনতে পেল কৃশানু বললে, হ্যা, আসুন, রান্না হয়ে গেছে।

আবার আগের মতই একটা ফুলকাটা আসনে তাকে খেতে দেওয়া হল। একসার বাটি-ঘেরা থালায় দেওয়া হল অন্ন। পাচকই পরিবেশন করল, সামনে বসে খাওয়াল ইভা।

আহারান্তে কৃশানু বললে, এবার আপনি বরং খেয়ে আসুন।

ইভা বলে, না, ভাত খাবনা আজ আমি।

ভাত খাবেন না? কেন, শরীর খারাপ?

না, শরীর ভালই আছে। আজ আমার উপোস। একটা ব্রত আছে।

কৃশানু বলে, বলেন কি! আপনি এসব ব্রত উপোস মানেন?

কেন, আমি কি খৃষ্টান?

না, তা নয়। তবে আপনাদের সমাজেও এসব আছে?

ইভা হেসে বলে, আমাদের সমাজ বলতে আপনি কি বোঝেন জানি না। আমার দাদামশায়ের হেঁসেলে মাছ মাংস তো দূরের কথা ডিম পেঁয়াজ পযন্ত আসে না। আমার মা মাসের মধ্যে তিন চারটে উপোস করতেন।

বাধা দিয়ে কৃশানু বলে, আশ্চর্য তো! আমি তো ভাবতেই পারিনি আপনাদের দেখে।

ইভা বলে, সব সংসারেই এমনি। একদল উগ্র আধুনিক, অন্য একদল উগ্র কনজারভেটিভ।

- আজ আপনার উপোস আছে জানলে আমি আসতামই না। গত কাল আসতাম।

হয়তো এসে দেখতেন গতকালই আমার উপোসের তারিখ পড়েছে।

হেঁয়ালিটা বোঝা যায় না। বলে, যাক, এখন তা হলে ওঘরে একটু বিছানাটা পেতে দিন—একটু গড়িয়ে নিই সেদিনকার মত। এমন পরিপূর্ণ আহারের পর একটা মৌরসী ঘুম না দিলে—

থামিয়ে দিয়ে ইভা বলে, কিন্তু আজ আর সেটি হচ্ছে না। আমাকে কাল যেতে হবে—আমি এখন গোছগাছ করব ও ঘরে। আজ একটু সকাল করেই যেতে হবে আপনাকে—কি, কিছু মনে করলেন না তো?

না না, সে কি! সত্যিই ও কথাটা আমার খেয়াল ছিল না। এত দূরের দেশে যাবেন, ন্যাচারালি আপনাকে গুছিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা আমি তা হলে উঠি এবার।

তা বলে এখনই যেতে হবে না। একটু বসুন, আমি দেখে আসি ঝি চাকরেরা সব খেতে বসেছে। আপনি ততক্ষণ এই ছবির বইগুলো দেখুন বরং।

ইভা চলে যায়। ছবির বইতে কিন্তু মন বসে না কৃশানুর। সে বসে বসে ভাবতে থাকে ইভার কথাই। অদ্ভুত মেয়ে তো। কাল সে চলে যাবে। জীবনে হয়তো আর দেখাই হবে না। ঘটনাচক্রে ইভার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল সে, কিন্তু আজ বুঝতে পারে তাকে চিনতে পারেনি একতিলও। আইভি যখন সব কথা লিখেছে তখন ইভা নিশ্চয় জানে তাকে ভালোবাসে কৃশানু। তবু ভেঙে পড়েনি ইভা। চৌধুরীবাড়ির বধূটি নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই আতিথ্যধর্ম পালন করেছে। সে ওর মায়ের মত—দাদামশায়ের মত। লরেটো-লালিত মেয়েটি প্রণাম করে নত হয়ে, ব্রত উপবাস করে, দাসী-চাকরদের খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকে। অথচ এটাই ইভার একমাত্র পরিচয় নয়—এর পেছনে আরও কিছু আছে। তা না থাকলে কোন লজ্জায় সে পরে আসে ঐ শাড়ি-ব্লাউস-মালা? কেমন করে ইঙ্গিত করে মালাটা গলায় পরিয়ে দিতে! কোন ইভা সত্য? কী চায় সে সত্যি সত্যি কৃশানুর কাছে?

একে একে অনেক দিনের কথা মনে পড়ে। বারে বারে ওকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে ইভা। একটি বেদনাদায়ক সন্ধ্যার ইতিহাসকে ভুলে যেতে

বলেছিল সে, একটি সুন্দর প্রভাতের গায়ে মুহূর্তের কালিমাচিহ্ন মুছে নিতে চেয়েছিল আঁচল দিয়ে। সে যখন বলেছিল পাঞ্জাবির নীচেও একটা দাগ লেগেছে তখন কোথায় ছিল আজকের এই গলায় লকেট-দোলান প্রগল্ভ ইভা? লজ্জায় সরমে সে কেন মরমে মরে গিয়েছিল সেদিন? মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই একটিমাত্র ক্ষণিক বিহ্বলতায় নিঃশেষিত হয়ে গেল ওদের নাম ধরে ডাকার ইতিহাস। ওরা দুজনেই দুজনকে ভালোবাসে। শুধু তাই নয়, ওরা দুজনেই জানে অপরের ভালোবাসা তারা পেয়েছে; অথচ কেউ কারও কাছে সে কথা স্বীকার করল না। ইভা কি চায় কৃশানু মুখ ফুটে কিছু বলুক? তাই কি স্নানের পরে এ সাজে সেজেছে সে? কিন্তু কৃশানুর প্রেমে তো জৈবিক প্রবৃত্তির কোন খাদ নেই। ইভার মধ্যে সে দেখেছে নারীর মহিমময়ী মূর্তি—ওর প্রাণপদ্মের উপর সেই-ই এনেছে সূর্যের প্রথম আলোর ছোঁয়া—ওর প্রেমের শতদল পাপড়ি মেলেছে সে স্পর্শে। ইভাকে সে নিঃসন্দেহে ভালোবাসে কিন্তু সে ভালোবাসা, যাকে বলে, প্লেটনিক; সে প্রেম একেবারে নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? নরনারীর ভালোবাসা কখনও ইন্দ্রিয়াতীত হতে পারে? তাই যদি হবে তাহলে বানের মুখে তরঙ্গশীর্ষে উঠে যখন সে ইভাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করেছিল তখন ওদের সারা দেহ থরথর করে কেঁপে উঠেছিল কেন? সে কি শুধুই মৃত্যুভয়ে? একটি ভীত আর্ত নারীর দেহ মন প্রাণের ক্ষণিক আত্মসমর্পণ কেন ওর প্রতি রোমকূপে তুলেছিল পরম আনন্দের শিহরণ? দেহাতীত প্রেম কি সম্ভব?

বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত প্রায়। প্রায় একঘণ্টা পরে ইভা ফিরে এল। মধ্যাহ্নের স্তব্ধতায় শুধু শোনা যায় পায়রার ক্লান্ত কূজন। ইভা ফিরে এল; ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে কেন এত দেরী হল তার ফিরে আসতে। চোখ দুটো লাল, মুখটা থমথম করছে। কপালের উপর কয়েকগুচ্ছ চুলে জলের সূক্ষ্ম শীকর। স্নানের পরে যে টিপটা পরেছিল সেটা নেই। কেঁদেছে। এতক্ষণ নির্জনে কোথাও কেঁদে মনটা হালকা করেছে। কান্নাটাকেই ধুয়ে আসতে চেয়েছিল। সেই সঙ্গে ধুয়ে গেছে টিপটাও। সাজটা পালটায়নি কিন্তু।

অনেক দেরী করলেও নিজেকে যথেষ্ট সামলাতে পারেনি এখনও। চেহারায় রোদনের চিহ্নটা যে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে যায়নি এটা সে জানে; আর

জানে বলেই বোধ হয় চোখে চোখে তাকাতে পারছে না। হয়তো অশ্রুর উৎস একেবারে নিঃশেষিত হয়নি তার।

প্লেটনিক-লভের ধ্বজাধারী কৃশানুর মনে জাগল একটা দুরন্ত বাসনা। যাবার আগে সেই সেদিনের মত দৃঢ় আলিঙ্গনে আর একটি মুহূর্তের জন্য বেঁধে ফেলতে চাইল তাকে—ওর রোদন-খিন্ন স্ফুরিতাধরে এঁকে দিতে ইচ্ছে হল একটি বিদায়-চিহ্ন। কিন্তু সে সব কিছুই করল না। বলল, এবার আমি চলি, কেমন ?

নতনেত্রেই ইভা বলে, আর একটু বসে যান, রোদটা পড়ুক।

কিন্তু আপনার তো বিশ্রামের প্রয়োজন। ওবেলা বাঁধাছাঁদা আছে।

হ্যাঁ, আমি এবার ও ঘরে শুতে যাব। একটু উঠে দাঁড়ান, প্রণাম করব।

কৃশানু বলে, এই যে বললেন একটু বসে যেতে, তাহলে প্রণামটা এখনই সেরে রাখছেন কেন ?

আমি ওঘরে বিশ্রাম করতে যাব। আর আসব না এঘরে। খানিকটা বিশ্রাম করে আপনি চলে যাবেন। তাই প্রণামটা এখনই সেরে রাখছি।

কৃশানু উঠে দাঁড়ায়। ওর পদপ্রান্তে ইভা নামিয়ে রাখে আবার একটি বিলম্বিত প্রণাম। আর তাকায় না ওর দিকে। কৃশানু হাতটা পকেটে ঢুকিয়েছিল, মালাটা বার করতে। বুঝতে পেরেছে এই ওদের শেষ সাক্ষাৎ। মালাটা ওর হাতে দিত, না গলায় পরিয়ে দিত তা ঠিক জানে না—কিন্তু সে সুযোগ এবারও পেল না কৃশানু। ইভা তার আগেই টেবিলের উপর রাখে একটা বন্ধ খাম , বলে, যাবার আগে এই চিঠিখানা পড়ে যাবেন।

উত্তর দেবার সময় দেয় না। দ্রুতপদে একরকম ছুটেই চলে যায় পাশের ঘরে। কৃশানু গিয়ে করাঘাত করে মাঝের গা-তালা লাগানো রুদ্ধ দরজায়। বলে, তোমার মালাটা নিয়ে যাও ইভা।

ততক্ষণে ওদিক থেকে চাবি পড়ে গেছে দ্বারে। ইভা সাড়া দেয় না। একটা চাপা কান্নার আবছা গুমরানি ভেসে আসে শুধু। কৃশানু ধীরে ধীরে ফিরে এসে বসে নিজের আসনে। অনেকটা সময় লাগে স্থির হতে। তাকিয়ে দেখে যেখানে প্রণাম করেছিল ইভা, সেখানে তখনও পড়ে আছে একবিন্দু জল। শান্তিনিকেতনী কাঁধব্যাগটা নেয় আলনা থেকে। চিঠিখানাও তুলে নেয়। কৃশানু জানে ওতে কি লেখা আছে। ওতে ইভা বলেছে সেই কথাটি, যেটি মুখে বলতে তার সরমে বেধেছে। ইভা যাবার আগে স্বীকৃতি

দিয়ে গেছে তার প্রেমকে ; কিন্তু দিয়েছে একেবারে শেষ মুহূর্তে—যখন আর কোন প্রতিদান দেবার সুযোগ কৃশানু পাবে না। কিন্তু ইভা বলেছিল যাবার আগে চিঠিখানা পড়ে যেতে। তাই তখনই খামটা খুলে পড়তে থাকে। কোন সম্বোধন নেই পত্রে—দীর্ঘ পত্রে!

'অবশেষে মনস্থির করলাম।

আমি জানতাম যে তুমি জানতে, যেমন তুমিও জানো যে আমি জানি। এই ভাল হল। জানাজানি হলে হয়তো এমন সুন্দরভাবে বিদায় নিতে পারতাম না। বিদায় দিতে পারতে না তুমি। নতুন করে ঘর বাঁধবার আগে মন বাঁধতে হবে আমাকে। মনের সে বনিয়াদে বিরাট একটা ফাটল থেকে যেত আজ যদি ধরা দিতাম তোমার কাছে। তোমার তরফেও সেই একই কথা। তোমার জন্যে উৎকণ্ঠ হয়ে যে প্রতীক্ষা করছে পাটনায় সেই তোমাকে ধন্য করবে নিঃসন্দেহে। আমার এ ভবিষ্যৎবাণী সূর্যোদয়ের মত সত্য।

পাঞ্জাবির নীচেকার রাঙা দাগটার জন্যে ভয় পেও না, ও দাগটাও ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে যাবে।

তোমাকে কেন নিমন্ত্রণ করেছিলাম জান? জানতে যে রোগটা তোমার একেবারে সেরে গেছে কিনা। আইভি চিঠিতে অনেক কথাই লিখেছিল, কিন্তু একবারও লেখেনি যে তুমি তার দিকে বিহ্বলবিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে কখনও। ভাবলাম, তবে কি গঙ্গার জোয়ারে ভেসে গেছে তোমার ব্যাধিটা! নিঃসংশয়ে সেটা জেনে যাবার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমার সেই অমোঘ অস্ত্র, সেই শাড়ি-ব্লাউস আর লকেট হারটা গুছিয়ে রেখেছিলাম হাতের কাছেই। সেগুলো পরবার অবশ্য প্রয়োজন হল না। দেখলাম তোমার রোগের আক্রমণ, দেখলাম পায়ের বুড়ো আঙুলটা মুমড়ে কেমন করে আত্মসংবরণ করলে তুমি। লজ্জায় বরফ তো দূরের কথা, একগ্লাস ঠাণ্ডা জলও চাইতে পারলে না।

জানি, তুমি কি ভাবছ। তুমি ভাবছ, তাহলে সব জেনেও কেন এ নির্লজ্জের বেশ পরলাম স্নানের পরে। তাই না? বলব সে কথা। বিশ্বাস কর, যতটা নির্লজ্জ ভেবেছ তুমি আমাকে, ভাববে এ চিঠি শেষ করে সত্যিই অতটা নির্লজ্জ আমি নই। দাদামশায়ের গল্পটা তোমাকে শুনিয়েছি। আজীবন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ মুরগীর জুস খেয়েছিলেন অম্লানবদনে। তাঁর

উপদেশ এখনও বাজছে আমার কানে—আতুরের নিয়ম নেই, যে রোগের যে চিকিৎসা।

জানি না কেন মতবিরোধ হয়েছে স্বাহার সঙ্গে তোমার। তবে আমি নিশ্চিত জানি এ লঘুক্রিয়া মাত্র। আমি স্বাহাকে দেখেছি, কথা বলেছি তার সঙ্গে। আমার মনে হয়েছে, সে তোমাকে জয় করে নেবেই। তার চরিত্রের মধ্যে অদ্ভুত একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করেছি অল্প সময়ের আলাপে। সামান্য কারণে মান অভিমান করবার মত মেয়ে তো সে নয়। আমার কি জানি কেন তাকে দেখে মনে হয়েছিল, সে হচ্ছে জোয়ান-অফ-আর্ক, বিজিয়াদের স্বগোত্র। সে বোধ হয় তোমার এ অদ্ভুত রোগের কথা জানে না, নয়? আমার মনে হয় তোমার কোন অসংবৃত মুহূর্তের বিহ্বল চাহনি দেখে সে একটা ভুল ধারণা নিয়ে দূরে সরে গেছে। ঠিক বলছি, তাই নয়? অথচ এই মনোবিকার নিয়ে তুমি সাহস পাচ্ছ না আবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। তোমার এতবড় অপমান আমি সইতে পারছি না, পারব না। আমাদের অন্নে রুচি নেই দেখে যেমন চিকেন ব্রথ খেতে রাজি হয়েছিলেন দাদামশাই, আমিও তেমনি মনস্থির করেছি।

তাই সেজেছিলাম নিলজ্জার মত। যাবার আগে তোমাকে দিয়ে যাব একমাত্র ওষুধ—তোমাব নিশ্চিত আরোগ্যের বিশল্যকরণী। হায়ার পোটেন্সির ঔষধ প্রয়োগ করার আগে সুচিকিৎসক অনেক সময় একমাত্রা নাক্সভমিকার বিধান দেন। আমার স্নানান্তের পোশাক সেই একমাত্রা নাক্সভমিকাই।

আইভি ঠিকই বলেছিল। অবচেতন মন তোমার যে দৃশ্য দেখতে চায় চর্মচক্ষুকে সেই চিত্রখানি নিবেদন না করলে তোমার মুক্তি নেই!

শোন। ড্রেসিং-টেবিলটার বাঁ দিকের টানা ড্রয়ারে একটা চন্দন কাঠের ছোট বাক্স আছে। তার ভিতর আছে মাঝের দরজার গা-তালার ডুপ্লিকেট চাবি। দরজাটা দুদিক থেকেই খোলা যায়। এ দীর্ঘ চিঠি তোমার পড়া শেষ হওয়ার আগেই আমি এ ঘরে ঘুমিয়ে পড়ব। ঘুমব নিশ্চিত—কারণ ঘুমের কড়া ওষুধ খেয়েছি এইমাত্র; গাঢ় ঘুমের মধ্যে আমি জানতেও পারব না তুমি কখন এলে আর কখন গেলে। বাহুল্য হলেও লিখছি, আগামী কাল আমার স্বামী আমাকে নিতে আসছেন—আমি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে এতদিনে তাঁর কাছে যাবার ডাক শুনেছি; আত্মবিস্মৃত

হয়ে আমার সে পথ বন্ধ করে দিও না যেন! ঘুমিয়ে পড়ব নিশ্চিত—তবু তোমার পদশব্দে যেন আমার ঘুম না ভেঙে যায়! কোন কথা বল না, ঘুমের মধ্যেও তোমার কণ্ঠস্বর সহ্য করতে পারব না আমি। তবু তুমি যে এসেছিলে তার একটা প্রমাণ রেখে যেও। মালাটা বরং রেখে যেও। না, গলায় পরাবার চেষ্টা কর না—তোমার স্পর্শ আমি সইতে পারব না। মালাটা রেখে যেও আমার পায়ের কাছে।

যাবার সময় যেখান থেকে নিলে চাবিটাকে সেখানেই রেখে যেও।

তোমার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না। আর চোখ তুলে তাকাতে পারব না কোনদিন তোমার দিকে। আমাকে তুমি চিঠিও লিখ না কখনও লক্ষীটি। তোমার রোগমুক্তির কথাও লিখে জানাবার দরকার নেই। সেটা অবশ্যম্ভাবী, তোমার আরোগ্যের স্মৃতিচিহ্ন থাকবে আমার বুকে—ওই রঙিন পাথরের মালায়। এ চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেল, আর ভুলে যেও কেমন করে তুমি সুস্থ মানুষ হয়ে উঠেছিলে আবার।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র পড়েছ তুমি? তাতে কিছুটা সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি—যার বঙ্গানুবাদ দিতে পারেন নি সঙ্কোচে। কিন্তু ব্যাখ্যায় বলেছেন বৃন্দাবনের গোপনারীরা শ্রীকৃষ্ণকে দান করেছিল নারীজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ—তাদের লাজবস্ত্র! তুমি কি সেই গোপবালাদের নির্লজ্জা বলবে কৃশানু?

আমার কথা যদি কখনও মনে পড়ে, আর যাই কেন না ভাব—নির্লজ্জা ভেব না আমায়, এই আমার অন্তিম অনুরোধ।'

* * * *

পড়ন্ত বেলায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ইভা খাটের উপর। তাড়াতাড়ি পায়ের কাছে জড়োসড়ো হয়ে থাকা চাদরটা টেনে ঢাকে সারা গা। জানলাগুলো সব বন্ধ। জ্বলছে নীল বাতিটা তখনও। দিনের বেলাতেই এ নির্জন ঘরে নেমে এসেছে রাত্রির মোহময় মদিরতা।

আশ্চর্য! এইভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? অবাক হয়ে ভাবে ইভা। বালিশটা ভিজে গেছে। ঘুমের মধ্যে কাঁদছিল নাকি? অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে এতক্ষণ—স্বপ্ন, না আধো-তন্দ্রাচ্ছন্নের বাস্তব অভিজ্ঞতার আবছা কুয়াশা? যেন কে এসে দাঁড়িয়েছিল ওর পদপ্রান্তে; হঠাৎ যেন সে দর্শক আবিষ্কার করেছিল ইভাকে। ইভা স্বরূপ কি কুরূপ তা বিচার করেনি, সে

দেখেছিল ইভার নারীস্বরূপ—তার সত্যস্বরূপ। ঈশ্বরী পাটনি যে দৃষ্টিতে দেখেছিল সোনার সেঁউতির উপরে দাঁড়ান ঈশ্বরীকে—তেমনি বিহ্বল ছিল সে দর্শকের দৃষ্টি। ঘুমের মধ্যেই সর্বাবয়বে অনুভব করেছিল সে দৃষ্টির স্পর্শ। এখনও মনে হলে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

উঠে বসে ইভা। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। তৈরি হয়ে নিতে সময় লাগে অল্প। তারপর জানলাটা খুলে দেয়। যেন এ ঘরের রুদ্ধ রহস্যকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিল জানলার ধারে বিদায়ী সূর্যের শেষ কৌতূহল, খুলে দিতেই হুড়মুড় করে ঢুকল এক ঝলক পড়ন্ত রোদ। হতাশ হয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

হঠাৎ পায়ের কাছে নজর পড়ে ইভার। কই, মালাটা তো নেই। ত্বরিৎপদে চলে আসে এ ঘরে। সেখানে কেউ নেই। একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে। কেন রেখে গেল না কৃশানু তার উপহার ওর পদপ্রান্তে? ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে খোলে। চন্দন কাঠের বাক্সটার মধ্যে রয়েছে ডুপ্লিকেট চাবিটা। আর মালাছড়া, আর এক টুকরা কাগজ। তাতে লেখা, 'পারলাম না। মাপ কর আমাকে। অমৃত দিতে চাইলে তুমি, কিন্তু অঞ্জলি পাততে পারলাম না নিজের দুর্বলতায়। তাই আরোগ্যকে পেলাম না কিন্তু নিয়ে গেলাম তোমার মহৎ প্রাণের উদাত্ত পরিচয়। তুমি মহীয়সী।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ইভা। অশ্রুর উৎস তাহলে এখনও নিঃশেষ হয়নি তার।

কৃশানুর জীবনের প্রথম পঁচিশটা বছর আমরা এক নিঃশ্বাসে বাদ দিয়ে এসেছিলাম। কারণ কাহিনীর পক্ষে তা ছিল নিষ্প্রয়োজন। তেমনি এক নিঃশ্বাসে আমরা বাদ দিয়ে যাব পরের তিনটে বছরও।

এ তিনটি বছরে তার জীবনে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ছাত্রজীবন শেষ করে ইতিমধ্যেই সে নেমে পড়েছিল কর্মজীবনে—মাত্র তিনটি বছরেই চাকরিস্থলে পদোন্নতি হয়েছিল তার—সুনাম হয়েছিল কর্মক্ষেত্রে, আর তৃতীয় বছর শেষ হবার পূর্বেই কর্মজীবন ত্যাগ করে প্রবেশ করেছে অখণ্ড অবকাশের অবসরপ্রাপ্ত নৈষ্কর্মে। সে সব বিবরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিকথা প্রয়োজন হতে পারে কৃশানুর জীবনীকারের, আমাদের তাতে প্রয়োজন নেই, কারণ

ওর জীবনের প্রথম অংশের মত এ তিনটি বছরও ছিল স্ত্রীভূমিকাবর্জিত। সিনেমার সেলুলয়েডে যেমন অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়—আমরাও তেমনি তিনটি বছরকে বাদ দিয়ে ফিরে আসতে পারি আবার আমাদের কাহিনীতে। তিনটে বছর যে কেটে গেছে এটা মনে রাখবার জন্য আমরা কল্পনা করতে পারি—একরাশ ক্যালেণ্ডারের পাতা উড়ে গেল, অথবা একটা বকুলচারায় সুপার ইম্পোস হল একটা পরিণত গাছ, অথবা ওয়ার্নার ব্রাদার্সের গ্লোবটা পাক খেল বার তিনেক।

মোট কথা এবম্বিধ একটা 'মণ্টাজ-এফেক্ট' পাড়ি দিয়ে আমাদের কাহিনীর ক্যামেরা সোজা এসে ধরতে পারে হাজরা রোড দিয়ে ছুটে-চলা একটা ট্যাক্সি-শিশুকে—লংসটে। ধাবমান ট্যাক্সি, পীচঢালা রাস্তা, দু-পাশে সারি সারি বাড়ি। আসুন মিডসটে,—ট্যাক্সিতে একটিমাত্র যাত্রী, আ-টুপি-হিল নিখুঁত সাহেবী পোশাক। কাট করে আসুন সেমি-ক্লোজআপে, ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভাডা মিটিয়ে দিয়ে সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক নেমে এলেন একটা চামড়ার ফোলিও ব্যাগ হাতে—এই বইয়ের আগেকাব পাতা-উল্টে আসা আপনি তবু ওঁকে চিনতে পারছেন না। দোষ আপনার নয়, চরিত্রটিকে এসট্যাবলিস করলেও—তাঁকে চাক্ষুস দেখানো হয়নি। ক্যামেরা প্যান করে নিয়ে এসে পৌছে দিল ভদ্রলোককে ভবতারণ ঘোষালের বাড়িতে। ইনিই ডাক্তার অপরেশ মিত্র, মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার।

শুধু আগন্তুক নয়, গৃহস্থকে দেখলেও চেনা যায় না। অবসরপ্রাপ্ত ভবতারণ ঘোষাল মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন। জপতপ নিয়েই পড়ে আছেন তিনি। বড় মেয়ে দীর্ঘদিন প্রবাসী, মেজ মেয়েও বাপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে গেছে। সে নাকি আজকাল বোম্বেতে থাকে, অনেকগুলি ছবির কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে একসঙ্গে। আইভি চলে যাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন বদলে যেতে থাকেন ভবতারণ। এক্সটেনসান পেয়েছিলেন—নেননি। অর্ধেক পেনসেন কম্যুট করিয়ে তিন মেয়ের নামে ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছেন। ছোট মেয়েটিকে নিয়ে গেছে তার মাসীমা। সুতরাং একা মানুষের সংসারে আধা পেনসনই যথেষ্ট। দুনিয়ার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন না। নিজের ঘরেই সাধন ভজন নিয়ে পড়ে আছেন। মাঝে মাঝে গুরুভাই ছাড়া এ বাড়ির ফটকে কলিংবেল বাজায় না কেউ।

অপরেশবাবু নিজ পরিচয় দিয়ে বলেন, আপনার কাছে এসেছিলাম একটা বিশেষ প্রয়োজনে। আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

বৈষ্ণবসুলভ বিনয় প্রকাশ করে ভবতারণ বলেন, কিভাবে আপনার সাহায্য করতে পারি বলুন।

আমি আপনার কাছে এসেছি একটা সংবাদ সংগ্রহ করতে। কৃশাম্বু রায় বলে এক ভদ্রলোক আপনার মেয়েকে পড়াতেন, পরে তিনি আপনার অধীনে চাকরিও করেন। তাঁর বর্তমান ঠিকানাটা জানেন?

মাসতিনেক পূর্বে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনায়—

বাধা দিয়ে ডাক্তার মিত্র বলেন, জানি, সে দুর্ঘটনায় রাঘবন আর ইন্দ্রজিত নামে ওঁর দুজন সহকর্মী মারা যান। উনিই অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন এবং প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছেন। তাঁর চাকরি গেছে—

না, চাকরি যায়নি। তাঁকে এক বছরের বিনা মাইনেতে ছুটি দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা করে যদি তিনি আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন তাহলে আবার চাকরিতে জয়েন করতে পারেন তিনি।

তাঁর আর্থিক কোন ক্ষতি হয়েছে কি?

না, বেচারির নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়েছে মাত্র। কোন রকম উত্তেজনা সহ্য করতে পারে না। বাড়ি থেকে বের হয় না—কোন কাজে সক্রিয় অংশ নিতে পারে না।

তাঁর বর্তমান ঠিকানাটা জানেন?

অন্তত মাসখানেক আগে তিনি যে ঠিকানায় ছিলেন তা বলতে পারি। ইতিমধ্যে ঠিকানা বদলেছেন কিনা জানি না। মাসখানেক আগে তাঁর একটি চিঠি এসেছিল।

বেশ, সেই ঠিকানাটাই দিন।

ভবতারণবাবু বাক্স থেকে একটি চিঠি বার করে ঠিকানাটা দেখান।

ডাক্তার মিত্র যখন ঠিকানাটা টুকে নিচ্ছেন নোট বইতে তখন ঘোষাল সাহেব প্রশ্ন করে বসেন, আপনি কৃশাম্বুর খোঁজ করছেন কেন?—ডাক্তার মিত্র জবাব দেবার আগেই আবার তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, মাপ করবেন। হঠাৎ করে ফেলেছি প্রশ্নটা অভ্যাসের দোষে। জবাব দিতে হবে না আপনাকে।

অপরেশবাবু বলেন, না না, তাতে কি হয়েছে? এমন কিছু অসৌজন্য প্রকাশ পায়নি আপনার এ প্রশ্নে। বলছি—

কিন্তু ভবতারণ আবার বাধা দিয়ে বলেন, না থাক! সংসারাশ্রম মনে মনে ছেড়ে এসেছি আমি। এসব অবান্তর আলোচনায় মন বড় বিক্ষিপ্ত হয়—সাধনায় ব্যাঘাত হয়।

পুলিস অফিসার ভবতারণ ঘোষালের সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলেন অপরেশবাবু—তাই তাঁর এ কথায় ভদ্রলোক যেন বেশ একটু অবাক হলেন। একটু আহতও হলেন যেন তাঁব নির্লিপ্ততায়; বললেন, আপনার কন্যা আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, সেটা উত্থাপন করাটাকে কি আপনি অবান্তর আলোচনা মনে করবেন?

হেসে ভবতারণবাবু বলেন, আপনি আমার উপর রাগ করেছেন।

আজ্ঞে না, রাগ কবিনি; আমাকে জেনে যেতে বলা হয়েছে আপনি কেমন আছেন।

অমায়িক উত্তর হল, শারীরিক সুস্থই আছি।

নমস্কার করে ডাঃ মিত্র উঠে পড়েন। তিনি অবাক হয়ে গেছেন রীতিমত। ভদ্রলোক কি সত্যই একেবারে নিস্পৃহ নিরাসক্ত হয়ে উঠেছেন! কোন কন্যা কোন সূত্রে তাঁকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পাঠাল তা পর্যন্ত জানবার কৌতূহল নেই?

ফেরার পথে কত কি ভাবছিলেন ডাক্তার মিত্র। ভবতারণ ঘোষাল স্বনামধন্য ব্যক্তি। যেসব দুর্ধর্ষ ক্রিমিনাল একদিন ধরা পড়েছিল ভবতারণের বিশ্লেষণ-জালে—তারা নিশ্চয়ই কঠিনতম অভিশাপ বর্ষণ করেছিল তাঁকে। তারা কি কখনও কল্পনা করতে পেরেছিল তাঁর এই পরিণতি? তাঁর বাড়ি, গাড়ি, মেয়ে-জামাই বিষয় সম্পত্তি কিছুই নষ্ট হয়নি—তবু কিছুই ভোগে এল না তাঁর। স্বেচ্ছানির্বাসনে ঘরের মধ্যেই বানপ্রস্থ নিয়ে দিন গুনছেন ভবতারণ ঘোষাল।

সময় যেন কাটতে চায় না। ঘড়িব কাঁটা দুটোর অবস্থা ওরই মত। অলস ছন্দে চলেছে টিকিয়ে টিকিয়ে নিতান্ত নিরুপায়ের মত। সেই কোন ভোরবেলায় এসে বসেছে ইজিচেয়ারটায়—ঘণ্টাকতক বসেই আছে। ঘড়ির কাঁটা দুটো এখনও ন'টার ঘর পার হতে পারল না। অথচ এমন একদিন ছিল যখন পাল্লা দিয়েও কাঁটা দুটোর নাগাল পাওয়া যেত না।

লাইব্রেরী থেকে যে গল্পের বইটা এনেছিল কাল রাত্রেই শেষ হয়েছে সেটা।

খবরের কাগজ নেওয়া বন্ধ করেছে এ মাস থেকে। যতটা সম্ভব খরচপত্র কমিয়ে আনছে। সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে জানলার ধারে। কোথাও আর কোন বন্ধন নেই কৃশানুর। বই পড়ে, কী সব ছাইপাঁশ লেখে খাতায়, আর জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে থাকে। এখনও মাঝে মাঝে আসে বন্ধুরা, সহকর্মীরা, সান্ত্বনা দেয়। কৃশানু জানে এ সান্ত্বনার মধ্যে আর যাই থাক, সত্য নেই। সক্রিয় জীবনে আর সে ফিরে যেতে পারবে না। শরীরের কোনও অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যায় নি কিন্তু মনটা দুমড়ে মুচড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। চিকিৎসা তো যথেষ্ট হল, আর কেন? সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ অকর্মণ্য জীবন, ব্যাঙ্কের খাতায় নির্দিষ্ট পুঁজি। এই তিন বছরের উপার্জনের উদ্‌বৃত্ত। জমা আর পড়ছে না, পড়বে না—অথচ খরচের অঙ্ক পডছে খাতায়। যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করেছে দৈনিক ব্যয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে তা ও জানে না। এর চেয়ে হাসপাতাল থেকে না ফিরে এলেই বোধ হয় ভাল ছিল।

সেই কালরাত্রির বিভীষিকা ওকে মুক্তি দেয়নি। রাতের অন্ধকারে দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার করে ওঠে আজও। ঘুম ভেঙে যায়, পায়চারি করে ঘরের মধ্যেই। আর ঘুমতে সাহস হয না। ডাক্তার বলেছে ও ঘটনাটা ভুলে যেতে। কিন্তু ইচ্ছা করলে যেমন ভোলা জিনিস মনে করা যায় না তেমনি মনে যেটা অহরহ জেগে আছে তাকে ভোলাও যায না।

একা একা বসে অনেক সময় পুরনো দিনের কথা ভাবে। সুব্রত দাশ, সমর—এরা কে কোথায় আছে কে জানে। শুনেছিল আইভি বাপের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে নাকি চলে গেছে। সে বুঝি আজকাল বম্বেতে থাকে। একসঙ্গে অনেকগুলি ছবিতে কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে। ইভার খবর আর পায়নি। অনুমান করা যায়, সে স্বামীর ঘব করছে ভালো ভাবেই। স্বাহার সঙ্গেও আর নূতন করে যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি। নিঃসন্দেহে ওকে মুক্তি দিয়ে গেছে স্বাহা। কৃশানু এতদিনে নিজের ভুলটা বুঝতে শিখেছে। ঠিকই বলেছিল ইভা—পারলে স্বাহাই তাকে ধন্য করতে পারত। তাকে আরও খান তিনেক চিঠি লিখেছিল। জবাব পায়নি। সশরীরে পাটনায় যেতে পারত কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের দিনে মিথ্যে পরিচয় দেওয়ার কি কৈফিয়ৎ দেবে ভেবে উঠতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত স্থির করেছিল তা সত্ত্বেও যাবে একবার পাটনায়। সব দোষ স্বীকার করে বলবে, শাস্তি যা দাও মাথা পেতে নেব; কিন্তু শাস্তিও দাও

আমাকে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় সে সম্ভাবনাও আজ আর নেই। এখন কোন লজ্জায় সে গিয়ে দাঁড়াবে স্বাহার সামনে? যাবেই বা কি করে?

স্যার!

কে? মুখ তুলে দেখে জনাই এসেছে। ওর কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড। এটাকে এখনও ছাড়াতে পারেনি। জনাইয়ের পিছন পিছন এসেছে আধবয়সী সবুজ লুঙ্গি পরা একজন মুসলমান। জনাই বলে, আপনি একজন কাগজওলাকে ডাকতে বলেছিলেন।

ও, এস তুমি।

তাক থেকে পুরানো খবরের কাগজগুলো নামিয়ে দিতে থাকে। একরাশ মাসিক আর সপ্তাহিক পত্রিকা। রিডার্স ডাইজেস্ট, ইলাসট্রেটেড উইকলি। পঞ্চানন ঘোষালের একসেট অপরাধ বিজ্ঞান, আর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বুলেটিং। কাগজওলা অবশ্য বইগুলো নিল না। ফেরত দিল চিঠির বাণ্ডিলটাও। এত ছোট কাগজে ঠোঙা বানানো চলবে না। কৃশানুর দুঃখ হয়। এত ছোট লেটার প্যাডে কেন চিঠি লিখত স্বাহা। ফুলস্ক্যাপ কাগজে লিখলে আরও সের দেড়েক ওজন হত নিশ্চয়। অর্থাৎ আরো পাঁচসিকে পয়সা বাড়ত কৃশানুর। উপায় নেই।

পয়সা মিটিয়ে দিয়ে লোকটা চলে যায়।

এখন কি করবে কৃশানু? হাজার বার পড়া চিঠির বাণ্ডিলটাই খুলে বসে আবার। গার্ড-ফাইলে স্বাহার চিঠি আর তার উত্তর তারিখ মিলিয়ে পরপর সাজানো। কতবার এগুলো পড়েছে তার ঠিকানা নেই। আজ আবার সবগুলো পড়তে থাকে গোড়া থেকে। এক্সিবিট নম্বর ওয়ান। মুংলির বাচ্চা হওয়ার সংবাদ, রামাওতারের পাঠশালায় ভর্তি করবার জন্য অনুমতি ভিক্ষা। এর জবাবটা নেই ওর সঙ্কলনে। তখন নকল রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই এক্সিবিট নম্বর দুইও ফুলেশ্বরীর চিঠি···কলকাতা শহরকে ভয় পাই বলাতে অত ঠাট্টা কিসের?···নাগরি হরফের চিঠি পড়াতে কলকাতায় তোমার অসুবিধা হতে পারে মনে করেই বাংলা-জানা একজনের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর সম্বন্ধে অত কৌতুহল কেন? এই চিঠিখানার পর থেকেই বেড়ে গিয়েছিল কৌতুহল দু পক্ষেরই। এখানাতেই স্বাহা লিখেছিল···কলকাতার মেসের মুখপোড়া বাবুদের কি ঘর দোর বলে কিছু নেই?

পাতা উলটে যায় কৃশানু। তেতাল্লিশ নম্বর চিঠি। 'স্বাহা লিখছে···একটু রোমান্টিক হয়ে গেল নয়? অনেকটা সেই 'গোড়ায় গলদে'র বিনোদবিহারী-বাবুর মত।

আচ্ছা, 'গোড়ায় গলদ' লিখেছিল কেন? 'শেষ রক্ষা'ও তো লিখতে পারত! এটা কি স্বাহার মনের একটা প্রিমনিশান?

জনাই আবার এসে ওর হাতে তুলে দেয় একখানা আইভরি কাগজের ছোট্ট ভিজিটিং কার্ড। অবাক হয়ে যায় কৃশানু—স্বাহার দাদা।

একটু পরেই ঘরে আসেন ভদ্রলোক। নিখুঁত সাহেবী পোশাক। দীর্ঘকায়, সবল বলিষ্ঠ মানুষ। স্বাহার মতই দৃঢ়চেতা মনে হয় তাঁকে প্রথম দর্শনেই।

আপনি আমাকে চিনতে পারবেন এটা আমি অনুমান কবেছিলাম কিন্তু কি প্রয়োজনে আজ আপনার কাছে এসেছি তা আপনার স্বপ্নেরও অগোচর।

সমস্ত কথা খুলে বলেন ডাক্তার অপরেশ মিত্র। কৃশানু আর একবার মনে মনে বলে—বিচিত্র এ ত্বনিয়া।

আজ এক বৎসরের উপব ডাক্তার মিত্র দেশে ফিরে এসেছেন মনস্তত্ত্বের উপর বিশেষ ডিপ্লোমা নিয়ে। স্বাহাও পাশ করে বেরিয়েছে সেই বছর। কথা ছিল পাটনার সাবেক বাড়িতেই প্র্যাকটিসে বসবেন ত্বজন। যথারীতি সেই আয়োজনই হতে থাকে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অপরেশবাবু বুঝতে পারেন, যে বোনটিকে ছেড়ে বছর পাঁচেক আগে তিনি বিদেশে চলে যান এ মেয়েটি সেই স্বাহা মিত্র নয়। ওর ভিতরে ইতিমধ্যে একটা ভূমিকম্পে সব ওলট-পালট হযে গেছে। কোন কিছুতেই ওর মন নেই। সব সময়েই অন্যমনস্ক ভাব। কেমন একটা অদ্ভুত মেলাঙ্কোলিয়া যেন জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে ওর মনের উপর। ক্রমশঃ তিনি বুঝতে পারেন যে মানসিক রোগের চিকিৎসাই যদি করতে হয় তাকে—তাহলে সর্বপ্রথম সেটা স্থুরু করতে হবে বোনকে দিয়েই। স্বাহা একেবারে নীরব হয়ে গেছে। অপরেশবাবুর মনে হয়েছিল কারও কাছে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে স্বাহা। মনটা তার একটা নতুন অবলম্বন না পেলে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে না কোনদিন। তিনি খুলেই প্রশ্ন করলেন একদিন—তুই কি কাউকে ভালবাসিস?

স্বাহা হেসে বলেছিল—তাহলে সেটা কি তোমার কাছেও গোপন রাখতাম দাদা?

বোনের বিয়ে দিতে চাইলেন অপরেশবাবু। পাত্রের অভাব ছিল না। ভয় ছিল হয়তো স্বাহাই রাজি হবে না। সে কিন্তু কোন বাধা দিল না। বারবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন ডাক্তার মিত্র—এখনও ভেবে দেখ, তোর আপত্তি থাকলে এখনও ভেঙে দিতে পারি এ সম্বন্ধ।

এবারও হেসে স্বাহা জবাব দিয়েছিল—ভেঙে দেবার হলে আমিই দিতাম।

ওর অনুমতি নিয়েই বিয়েটা হয়ে গেল। বললেন অপরেশবাবু।

স্থাণুর মত বসে শুনল কৃশানু। কত সহজে একটি মাত্র বাক্যে সংবাদটা পরিবেশন করলেন ডাক্তারবাবু। ও যেন একটা গল্প শুনছে—যে গল্পের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই!

কিন্তু বিয়ের পর থেকে ওর মেলাঙ্কোলিয়া ভাবটা যেন বেড়েই গেল। এ বিয়ে যে সুখের হয়নি তা বুঝলাম দু দিন পরেই। আমার ভগ্নিপতির প্রথমটা দোষ ছিল না—কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সে বিরক্ত হয়ে উঠল। স্বাহা ফিরে এল আমার কাছে।

বাধা দিয়ে কৃশানু বলে, কিন্তু এসব কথা আমাকে কেন শোনাতে এসেছেন, তা তো বুঝতে পারছি না।

একটু গাঢ়স্বরে ডাক্তার মিত্র বলেন, মিস্টার রায়, যে সব পারিবারিক গুপ্ত কথা সাধারণত লোকে গোপন করে—তাই শোনাচ্ছি আমি উপযাচক হয়ে। আমি পাগলের ডাক্তার, পাগল নই। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে কিছু।

কৃশানু শান্ত হয়ে বলে, বেশ, বলুন।

অপরেশবাবু বলেন, আপনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন? জাতিস্মরে?

প্রশ্নটা অবান্তর হলেও কৃশানু এক কথায় জবাব দেয় না।

আমিও করতাম না। কিন্তু এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে আমাদের পরিবারে। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই চৌধুরি, মানে আমার ভগ্নীপতি স্বাহাকে পৌঁছে দিয়ে গেল। বললে, স্বাহার নাকি মাথা খারাপ। সে মনে করে সে নাকি স্বাহা চৌধুরী নয়, সে চৌধুরীর স্ত্রীই নয়, এমন কি সে নাকি বিংশ শতাব্দীর মেয়েই নয়। তার ধারণা সে বুঝি কোন উজ্জয়িনী না অবন্তীর জনপদবধূ। সব সময় নয়, কখনও কখনও ওর মনে এই ভাবটা জাগে। তারপর যখন সম্বিৎ ফিরে পায় তখন একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যায়। এ জাতীয় মনের অসুখের কথা জানা ছিল। নিজেই চিকিৎসা

সুরু করলাম। স্বাভাবিক অবস্থায় রোগিণীর মনেই থাকে না অসুখের আক্রমণের মধ্যে তার আচরণের কথা। তাই সে বিশ্বাসই করতে চাইত না যে সে অপ্রকৃতিস্থা। চৌধুরীর সঙ্গে ওর বনিবনাও হয়নি একেবারে, তাই ওর ধারণা চৌধুরী ওর নামে মিথ্যা অভিযোগ করে।

কৃশানু বলে, তারপর ?

অপরেশবাবু কাহিনীর জাল বুনে যান। বোনকে তিনি জানাতে চান না যে সে অপ্রকৃতিস্থা। এ কথা রোগিণীর না জানাই মঙ্গল। কিন্তু বাড়ির দাসী-চাকর, পরিচিত লোকজন ওর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করে অবাক হয়ে যায়। সকলের মুখ চাপা দেওয়াও মুশকিল। একদিন স্বাহা এসে বললে, দাদা, তুমি লছমনিয়ার চিকিৎসা করো এবার। ও হতভাগী বলে মাঝ রাত্রে আমি নাকি সেতার বাজাই। ও নিজে কানে শুনেছে!

অপরেশবাবু প্রত্যহ মধ্যরাত্রে শোনেন সেতারেব আওয়াজ, কিন্তু সেকথা বলেননি স্বাহাকে। এতদিনে উনি বুঝতে পারেন পরিচিত পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে না নিলে ওব চিকিৎসা করা যাবে না। দার্জিলিঙে একটা বাড়ি ভাড়া নিলেন উনি। সেখানেই আছেন আজ প্রায মাসখানেক। ওকে স্টাডি করছেন নানাভাবে—এখনও রোগের উৎপত্তিস্থলটা ধরতে পারেননি। এই সময় একদিন স্বাহার অলক্ষিতে তিনি ওর বাক্স সন্ধান করেন। কৃশানুর চিঠির বাণ্ডিলটা উদ্ধার করেন। সেগুলি পড়ে ডাক্তার মিত্র বুঝতে পেরেছেন যে কৃশানুব সাহচর্য ছাড়া স্বাহার রোগমুক্তি সম্ভব নয়।

সমস্ত কাহিনীটা শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কৃশানু। তারপর বলে, ডক্টর মিত্র, এমন একদিন ছিল যখন আমি নিজের গরজেই আপনার সন্ধান করতাম।· ·

বাধা দিয়ে অপরেশবাবু বলেন, জানি, মিস্টার রায়। আমি আপনার সবগুলি চিঠি পড়েছি। বাই দ্য ওয়ে—আপনার সেই অসুখটা সেরে গেছে ?

একটু হেসে কৃশানু বলে, সে অসুখ তো সারেইনি, বরং অন্য আর একটা মানসিক অসুখে ভুগছি আমি। কিছু দিন আগে একটা ভীষণ এ্যাকসিডেণ্ট—

শুনেছি। রাদার কাগজে পড়েছি।

সেই দুর্ঘটনার পরে আমার একেবারে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। প্রায়

প্রতি রাত্রেই দুঃস্বপ্ন দেখি। পায়চারি করে রাত কাটাই। ঘুমে চোখ ভরে আসে—অথচ নাইট-মেয়ারের ভয়ে ঘুমতে পারি না। দিনের বেলাতেও যখন পায়চারি করি—মনে হয় আমার পিছন পিছন কে যেন পায়চারি করছে। যেন মৃত্যু আমাকে অনুসরণ করে চলেছে প্রতিটি মুহূর্ত। মাঝে মাঝে সত্যিই পিছন ফিরে দেখি। মনে হয় কে যেন রয়েছে আমার পিছনে। যখনই বসি, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসি, টুলে বসতে পারি না। নিজের পিছনকে আমার ভয়! কোন রকম উত্তেজনা সহ্য হয় না আমার। কোন যানবাহনে উঠতে পারি না, সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে পারি না। এ অবস্থায় আমি আপনার কী সাহায্য করতে পারি?

শেষ কথাটায় কান না দিয়ে অপরেশবাবু ওর রোগের সিমটম্‌গুলোই আরও বিস্তারিত শুনতে চান। কৃশানু একে একে জবাব দিতে থাকে। শেষে উনি বলেন, মিস্টার রায়, আপনার অসুখ সারবার নয়, এ কথাই বা ভাবছেন কেন? আপনি আমার সঙ্গে চলুন। স্বাহাকে আমি বলব যে আপনি আমার একজন পুরানো বন্ধু। চিকিৎসা করাতেই এসেছেন আপনি আমার কাছে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যাও হবে না। আচ্ছা, স্বাহা আপনাকে তো চাক্ষুষ দেখেনি কখনও, নয়?

না, আমাকে দেখলে সে চিনতে পারবে না।

তাহলে আপনাকে একটা নতুন নাম নিতে হবে। নতুন করে আপনাকে তার সঙ্গে আলাপ করতে হবে, বন্ধুত্ব করতে হবে,ঘনিষ্ঠ হতে হবে। পরে সময় মত আপনাকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে।

কৃশানু বলে, নতুন নাম নিতে হবে না, আমাকে দেখলে সে সুব্রত দাস বলে চিনবে।

অপরেশবাবু বলেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো?

কৃশানু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়। ওদের প্রথম সাক্ষাতের কথা বলে।

অপরেশবাবু খুসী হয়ে বলেন, এ তো সোনায় সোহাগা হল। পরিচয়ের প্রথম বাধাটা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কৃশানু রায়ের উপর ওর চেতন-মন একেবারে বিমুখ হয়ে আছে; অথচ অবচেতন মনে সে তাকেই চাইছে। সুতরাং কৃশানুর বন্ধু সেজে আপনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে পারবেন। দেখা যাক তার কি প্রতিক্রিয়া হয়।

কৃশানু অতটা খুশী হয়ে উঠতে পারে না কিন্তু; একটু চুপ করে থেকে

বলে, বেশ, ধরা যাক আমাকে সে সুব্রত দাস বলে গ্রহণ করল ; নতুন করে আলাপ হল, ঘনিষ্ঠতা হল—তারপর হয়তো সুযোগ মত আমি আমার সত্য পরিচয় দিলাম—তবু তার রোগমুক্তি আমাকে দিয়ে হবে কি করে ? সে বিবাহিত, আমার পক্ষে তো—

অপরেশবাবু বলেন, সে কথা ঠিক। কিন্তু কি জানেন, এসব ক্ষেত্রে রোগিণীকে মনটা হালকা করার সুযোগ দিতে হয়। টেনিসনের সেই 'হোম দে ব্রট হার ওয়ারিয়ার ডেড' কবিতাটা মনে আছে তো ? এটা কবি-কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক সত্য। স্বাহারও সেই অবস্থা। শী মাস্ট স্যুন অর আটার ক্রাই। কিন্তু স্বাহা আমার কাছে মন খুলতে পারছে না, কারণ এখানে রোগী-ডাক্তারের সম্পর্কের মধ্যে এসে যাচ্ছে ভাইবোনের সম্পর্ক। আমার মনে হয়, হয়তো আপনার কাছে সে মনটা হালকা করতে পারবে। আপনিই পারবেন তাব নিরুদ্ধ কান্নার বাঁধটা ভাঙতে। জানি, আপনাকে অত্যন্ত বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলছি। কিন্তু আপনার প্রিয়বান্ধবীর জন্য এটুকু আপনি করবেন না ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃশানু বলে, তাহলে প্রথম কথা, আপনি ওকে কলকাতায নিয়ে আসুন। আমাব পক্ষে তো আর দার্জিলিঙ যাওয়া সম্ভব নয়।

কেন নয় ? প্রশ্ন করেন ডাক্তারবাবু।

হেসে কৃশানু বলে, আপনি আমার অবস্থাটা ভুলে গেছেন। ট্রেণে ওঠা আমার পক্ষে অসম্ভব।

ট্রেণে উঠবেন না আপনি। প্লেনে যাবেন।

কৃশানু হো-হো করে হেসে ওঠে। অনেক—অনেকদিন পরে এমন প্রাণ-খোলা হাসি হাসল সে। বললে, শুনছেন, ট্রেণে মোটরেই চাপতে পারি না আমি, সিড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হলে মাথা ঘোরে আমার—আমি যাব প্লেনে ?

অপরেশবাবু বলেন, সে দায়িত্ব আমার। আপনি মালপত্র গুছিয়ে রাখুন। আমি সীট বুক করে সময়মত আসব। আপনার মালপত্র বুঝে নিযে আপনাকে এই ঘবেই ঘুম পাড়িয়ে দেব। ঘুম ভাঙলে দেখবেন আপনি দার্জিলিঙে পৌছে গেছেন।

কৃশানু বলে, যাদুমন্ত্রে নাকি ?

হ্যাঁ, বিজ্ঞান এ যাদুমন্ত্র শিখিয়েছে ডাক্তারদের।

দিন তিনেক হল কৃশানু এসেছে এখানে। ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট বাংলো-প্যাটার্ন-বাড়ি। ছবির মত দেখতে। পাথর-বাঁধানো একলা চলার সরু একটা পথ বাড়িটাকে ঘুরে উঠে গেছে টিলার চূড়ায়। পথের বাঁয়ে সবুজ কাঠের গেট দিয়ে না ঢুকলে আপনি পাকদণ্ডী বেয়ে উঠে যেতে পারেন আরও উপরে, একেবারে পাহাড়ের মাথায়। কৃশানু অবশ্য টিলার উপরে কোনদিন যায়নি, জানে না সেখানে কি আছে। বাড়ি থেকে ফুট-চল্লিশ নীচু দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে পীচমোড়া কাট রোড। ঢালু রাস্তা দিয়ে উপরে ওঠা বা নিচে নামার ক্ষমতা তার নেই। ফলে ত্রিশঙ্কুর মত কটা দিন সে বন্দীজীবন যাপন করছে বাড়ির লাগাও মরশুমী ফুলেভরা বাগানের চৌহদ্দিতে। বাগানে ঘুরে ঘুরে কৃশানু অনুভব করেছে এ বাড়িটার অদ্ভুত গঠনপদ্ধতি। পাহাড়ের ঢালে এমনভাবে বাড়িটা তৈরী করা যে নিচের দিক থেকে দেখলে মনে হয় বাড়িটা দ্বিতল অথচ পাহাড়ের উপর থেকে মনে হয় একতলা। চারখানি ঘর। ঢুকেই বড় একখানা হলঘর ড্রইং কাম ডাইনিং। তারই ডানহাতি ছোট একটা গেস্টরুমে থাকে কৃশানু। হলকামরার পিছনে দ্বিতলে যাবার কাঠের সিঁড়ি। দোতলায় পাশাপাশি দুটি ঘর। ভায়ের ও বোনের। সিঁড়ি ছাড়াও মাটি থেকে সোজা দ্বিতলের ঘরে যাওয়া যায়—এটাই বাড়িটির বৈশিষ্ট্য। দোতলার মেঝে উত্তর প্রান্তে পাহাড়ের ঢালে গিয়ে লেগেছে। সুতরাং উপর দিক থেকে সোজা দোতলায় যাওয়া যায়।

বাড়িতে তিনটি তো প্রাণী। পরিচয় হতে দেরী হয়নি, কিন্তু আলাপ হয়নি। সবাই আত্মকেন্দ্রিক আর সচেতন। স্বাহার স্বামীকে দেখেছে, পরিচয়ও হয়েছে ; কিন্তু পরিচয়ের সূচনাতেই তিনি এড়িয়ে গিয়ে বললেন, পরে আলাপ হবে, আছেন তো কিছুদিন? তারপর তাকে উত্তর দেবার মত সৌজন্যটুকুও না দেখিয়ে ডাঃ মিত্রকে প্রশ্ন করেন স্বাহা আছে, না, বেরিয়েছে?

আছে বোধ হয়—ওপরে যাও না!

তখন সকাল সাড়ে সাতটা। বাইরের দিক থেকেই এসেছিলেন চৌধুরী সাহেব। হয়তো প্রাতর্ভ্রমণ সেরে। ফিসিয়গনামি বিজ্ঞানটা যদি একেবারে গাঁজাখুরি না হয়, আর গোয়েন্দা কৃশানু রায় যদি সে বিজ্ঞানটা কিছুমাত্র আয়ত্ত করে থাকে, তবে সে বলতে বাধ্য ভদ্রলোকের অতীত ইতিহাসটা একেবারে নিষ্কলুষ নয়। ডাক্তার মিত্র ইতিপূর্বেই বলেছিলেন স্ত্রী অপ্রকৃতিস্থ' প্রমাণিত হবার পর নাকি ভদ্রলোক মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান সুরু করেছেন

কিন্তু ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র কয়েক মাস। কৃশানুর মনে হল ওঁর চোখের নিচে কালো হরফে খোদাই করা শিলালিপি বলতে চাইছে মদ্যপানের ইতিহাসটা আরও অনেক পুরানো।

ড্রইংরুমেই বসেছিল ওরা। কৃশানু বলে, মিস্টার চৌধুরী আমার পরিচয় কতটা জানেন?

যতটা স্বাহা জানে। আপনি সুব্রত দাস। আমার বন্ধু। মানসিক রোগে ভুগছেন। আমি বন্ধুকৃত্য করতে আপনাকে এনেছি এ বাসায়।

আপনি এঁকে কতদিন ধরে চেনেন?

বিয়ের কিছুদিন আগে থেকে কেন, বলুন তো?

কৃশানু একটু চুপ করে থেকে বলে অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে এককালে ডুবেছিলাম। এখানে যখন আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি তখন সব সম্ভাবনাই আমাকে ভেবে দেখতে হবে, রহস্যের কিনারা করতে।

ডাঃ মিত্র বলেন, কিন্তু আপনি তো কোন ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়ক নন। অপরাধ বিজ্ঞান এখানে না ঘাঁটলেও চলবে। স্বাহা একটা মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে মাত্র।

কৃশানুও হেসে বলে, আপনি মানসিক রোগের চিকিৎসক, তাই আপনি সেই চোখেই দেখছেন কেসটাকে। আমি গোয়েন্দা ছিলাম এককালে, তাই আমাকে গোয়েন্দার চোখে দেখতে হবে অনেক কিছুই।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ এমনও তো হতে পারে যে স্বাহা দেবী যে কথা বলছেন, তাই ঠিক। তিনি অপ্রকৃতিস্থা নন মোটেই। ওঁর স্বামী ওঁকে অপ্রকৃতিস্থা করে তুলছেন, পাগল প্রতিপন্ন করতে চাইছেন।

ভ্রূ কুঁচকে ওঠে ডাক্তার মিত্রের, বলেন, এতে তার লাভ? নিজের স্ত্রীকে পাগল প্রতিপন্ন করে কী সুবিধা হবে তার?

কৃশানু প্রতিপ্রশ্ন করে, ইনগ্রিড বার্গম্যান আর ওয়াল্টার পীজনের গ্যাসলাইট বলে সিনেমাটা দেখেছেন আপনি?

না, কেন?

দেখলে কেসটা বুঝিয়ে দিতে পারতাম।

অপরেশবাবু একটু চুপ করে থেকে বলেন, স্বাহার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না; কিন্তু এখনি হবে। ঐ শুনুন, ওরা দুজনে নেমে আসছে।

কাঠের সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। অপরেশবাবু বলেন, ওরা দুজনে নেমে আসছে তা কি করে বুঝলেন ?

হেসে কৃশানু বলে, এসব আমাদের বুঝতে হয় ডাক্তার মিত্র। মানুষ যখন চতুষ্পদ হয় না, তখন ওরা দুজনেই আসছে।

জবাব দেওয়ার সময় হয় না। স্বাহাকে সঙ্গে করে নেবে আসেন মিস্টার চৌধুরী। প্রায় তিন বছর পরে স্বাহাকে আবার দেখল কৃশানু। অনেক বদলে গেছে স্বাহা। রোগা হয়ে গেছে সে। চোখ দুটো যেন আরও গভীর বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। কারও দিকে সে তাকায় না। খোলা দরজার দিকে সমুখে তাকিয়ে সে চলে আসে। অপরেশবাবু হঠাৎ বলেন, বেরুচ্ছিস নাকি ?

স্বাহা জবাব দেয় না। ওর স্বামী বলেন, হ্যাঁ, ঘুরে আসি একটু।

স্বাহার বাহুমূলে আকর্ষণ করেন তিনি। অপরেশবাবু কিন্তু ওদের অনায়াসে যেতে দেন না। চৌধুরীকে তিনি আগের প্রশ্নটা করেননি, তার জবাবটাও তাই কানে তোলেন না। স্বাহাকেই বলেন, তোর সঙ্গে আমার বন্ধুর আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি। আমার বোন স্বাহা চৌধুরী—আমার বন্ধু সুব্রত দাস।

নির্বিকারভাবে হাত দুটি তুলে নমস্কার করে স্বাহা। ভালো করে তাকায়না কৃশানুর দিকে। কৃশানুও উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেছিল, বলে, আপনাকে এর আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

এইবার পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে দেখে স্বাহা। একটু যেন চমকে ওঠে ; পরমুহূর্তেই আগের মত নির্বিকার হয়ে যায়। কৃশানুই আবার বলে, আপনারও তাই মনে হচ্ছে না ? আগেও আমাকে কোথাও দেখেছেন বলে ?

ভ্রূ কুঁচকে স্বাহা স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলে, কই, না তো।

ডাক্তার মিত্র বলেন, তোমারই ভুল হচ্ছে সুব্রত। তুমি তোমার সেই হ্যারিসন রোডের মেস ছেড়ে কোনদিন বের হওনি, আর স্বাহাও পাটনার বাইরে বড় একটা যায়নি কখনও। তোমাদের দেখা হবে কি করে ?

যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল কৃশানুর। ও বলে ওঠে, মনে পড়েছে, আমাদের মেসেই এসেছিলেন আপনি একদিন। আমার এক বন্ধুর খোঁজে ; মনে পড়ছে ?

স্বাহা কিন্তু আর ওর দিকে তাকায় না, নতনেত্রেই বলে, আপনার ভুল হয়েছে ; আচ্ছা আসি, নমস্কার।

এবার সেই-ই আকর্ষণ করে চৌধুরীকে। যাবার জন্য তাগিদ দেয়। এবার কিন্তু চৌধুরীরই যাবার গরজ নেই, বলে, বন্ধুর খোঁজ করতে? হ্যারিসন রোডের মেসে? কে বন্ধু বলুন তো?

নামটা উচ্চারণ করবার আগেই স্বাহা ধমকে ওঠে, তুমি যাবে, না আবোল-তাবোল বকবক করবে এখানে?

চৌধুরী একটু সামলে নিয়ে বলে, না না, চল না।

দুজনে বেরিয়ে যায় ওরা।

ডাক্তার মিত্র বলেন, স্বাহা আপনাকে ঠিকই চিনতে পেরেছে।

কৃশানু বলে. ঠিক নয়, বেঠিক চিনতে পেরেছে বলুন। সুব্রত দাস বলেই চিনতে পেবেছে আমাকে।

দুদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে কৃশানু। এ বাড়ির সকলেই গম্ভীর, সিরিয়াস, রহস্যময়। ডাক্তার মিত্র সর্বদাই চিন্তিত। চৌধুরী ওকে বোধ হয় সন্দেহের চোখে দেখছে। রীতিমত এড়িয়ে চলছে সে। স্বাহা তো একেবারে শম্বুক-বৃত্তি অবলম্বন করেছে। চিনেও চিনতে পারছে না তাকে। আর আছে এক নেপালী দম্পতি—আউট হাউসে। স্বামী-স্ত্রী মিলে ঘরের কাজ করে তারা। তাদের ঠোঁটগুলোও যেন সেলাই করা।

কৃশানু বাড়ির বাইরেও যেতে পাবে না। বড়জোর বাগানে গিয়ে বসে। তার চেয়ে দূরে যেতে হলে হয় পাকদণ্ডী বেয়ে পাহাড়ে উঠতে হয়, নাহলে নামতে হয় ক্যালকাটা রোডে। দুটোই সমান অসম্ভব। চেষ্টা করলে হয়তো উপরে ওঠা যায়—কিন্তু নামবে কি করে? ঘরে বসে বসেই তাই লক্ষ্য করে সব কিছু। হিচ্‌ককের রিয়াব উইণ্ডোর কথা মনে পড়ে যায়।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা। অপরেশবাবু বৈকালিক ভ্রমণে বেবিয়ে গেলেন। ক্যালকাটা রোডের লাগাও গ্যারেজ। গাড়ি বের করে কোথায় বেরিয়ে গেলেন একাই। চৌধুরী বেরিয়েছেন অনেক আগে। বাড়িতে স্বাহা একা আছে। একটু পরে সেও বেরিয়ে এল। কৃশানু বসেছিল বাইবেব ঘরেই। স্বাহা উপর থেকে নেমে আসতেই কৃশানু দাঁড়িয়ে উঠে কি একটা কথা বলতে গেল। কি বলত জানে না, কিছু একটা কথা বলে আলাপটা সুরু করতে চেয়েছিল আর কি; কিন্তু ওকে সে সুযোগ না দিয়েই বেরিয়ে গেল স্বাহা। বাগানে একটু দাঁড়ায়, ফুলগাছের চারাগুলোকে একটু দেখে তারপর ধীরপদে পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। একবার কৃশানুর দিকে দেখেও

নিল মোড় ফেরার সময়। টিলার মাথায় গেল না। মাঝামাঝি পথে একটা চওড়া পাথরের উপর বসল, এদিকে পাশ ফিরে।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে কৃশানুও বেরিয়ে আসে। স্বাহা নিশ্চয় তাকে চিনতে পেরেছে, কিন্তু স্বীকার করছে না কেন? তার ঐ পাশ ফিরে বসার ভঙ্গিটায়, ঐ আনমনে দাঁত দিয়ে ঘাসের ডগা ছেঁড়ার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণ ছিল। স্বাহা তো অনায়াসে ওর দৃষ্টিপথের বাইরে গিয়েও বসতে পারত, তা সে গেল না কেন?

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে কৃশানু। পাকদণ্ডীর কাছে এসে ইতস্তত করে একটু। উঠবে নাকি? উপরে তাকাতেই নজরে পড়ে স্বাহা ওকে লক্ষ্য করছে। চোখোচোখী হতেই একেবারে পিছন ফিরে বসে।

অন্যমনস্কের মতই ধীরে ধীরে উঠে এল কৃশানু—অমোঘ আকর্ষণে। পদশব্দে স্বাহা এ পাশে ফিরে তাকায়। একটু চমকে ওঠে, অথবা চমকে ওঠার ভান করে।

আপনাকে এমন চুপটি করে বসে থাকতে দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। একা একা সারাটা দিন কথা বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠি।

স্বাহা জবাব দেয় না। একটা ঘাসের ফুল তুলতে হঠাৎ সে ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু গরজ বড় বালাই ; কৃশানু আবার বলে, সকালবেলা আমাকে চিনতে চাইলেন না কেন বলুন তো?

হঠাৎ মুখ তুলে স্বাহা বলে, মানে? আপনি কি বলতে চান আপনাকে চিনতে পেরেও অস্বীকার করেছি আমি?

ঠিক তাই।

অর্থাৎ আমি মিথ্যাবাদী? কেন এভাবে আমাকে অপমান করছেন?

মিথ্যাবাদী আমি আপনাকে বলিনি স্বাহা দেবী, কিন্তু সকালবেলা আপনি যে সত্য গোপন করেছিলেন তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। কিন্তু কেন?

কি কেন?

কেন চিনতে চাইলেন না আমাকে? আপনি আমাদের মেসে একদিন এসেছিলেন আমার এক বন্ধুর খোঁজে। আমাকে আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন, কিন্তু সেটা স্বীকার করছেন না কেন?

অনেকক্ষণ স্বাহা কোন জবাব দিল না।

কি হল? জবাব দিলেন না যে?

কি জবাব দেব ? আমি আপনাদের মেসে যাইনি কখনও।

কৃশানু বলে, রামনন্দনকে চেনেন আপনি ? রামনন্দন কাহার ?

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে স্বাহা। কি একটা কথা বলতে চায়, বলে না। ঠোঁট দুটো বুঝি একটু কেঁপে ওঠে। গাঢ়তর হয় নিঃশ্বাস।

আপনি এখনও বলবেন আমাকে চিনতে পারেননি ? আমার বন্ধুর ফটোখানি নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেননি সেদিন ?

মুখ নীচু করে প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে স্বাহা, কে আপনার বন্ধু ? আমি চিনি না তাকে।

কৃশানু বুঝতে পারে এ ধমকটা নিজেকেই দিয়েছে স্বাহা। তার সংবেদনশীল স্পর্শকাতর মনকেই ধমক দিয়েছে। প্রত্যেকটি শব্দ পরিষ্কার উচ্চারণ করে কৃশানু বলে, আমার বন্ধুর নাম কৃশানু রায়।

বিদ্যুতবেগে উঠে দাঁড়ায় স্বাহা। কী যেন বলতে চায়—তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বসে পড়ে আবার। ওপাশ ফিরে বসে। নিচুস্বরে বলে, মাপ করবেন, আমাকে একটু একলা থাকতে দেবেন।

দেব, কিন্তু আপনি বলুন আমার বন্ধুকেও কি চিনতে পারলেন না আপনি ?

স্বাহা ধীরে ধীরে এ পাশে ফেরে। কেমন যেন বেদনার্ত পাণ্ডুর দেখাচ্ছে তাকে। বলে, একদিন আমার কৌতুহল আপনি জোর করে থামিয়ে দিয়েছিলেন সুব্রতবাবু। সেদিন আপনি অসুস্থ ছিলেন ; একা থাকতে চেয়েছিলেন। বিশ্বাস করুন, আমিও আজ তেমনি অসুস্থ। আমাকে মাপ করবেন।

এর পরে আর কথা চলে না। কৃশানু ফিরে যাবে বলে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু নামবে কি করে ? উঠবার সময় নিচের দিকে তাকাতে হয়নি। কিন্তু এখন ? মিনিট খানেক অপেক্ষা করে বেচারি বলতে বাধ্য হয়, আমি যে একা নামতে পারব না স্বাহা দেবী।

স্বাহা কোন কথা বলে না। নীরবে কৃশানুর হাতটা ধরে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। নীরবেই উঠে যায় দ্বিতলে নিজের ঘরে।

রাত সাড়ে আটটায় সবাই একসঙ্গে ডিনার খায়। মিস্টার চৌধুরী অবশ্য প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন। পরিপূর্ণ নৈশ আহারের পর কৃশানু এসে শোয় তার ঘরের ইজিচেয়ারে। নীলরঙের শেড দেওয়া বাতিটা জ্বলে। ডাক্তার

মিত্র তখন রুদ্ধদ্বার কক্ষে এসে বসেন মনঃসমীক্ষণে। রাত নয়টাই দার্জিলিঙে মধ্যরাত্রি। চরাচর স্তব্ধ হয়ে যায়। ধূপদানীর নীলাভ ধূপের রেখা বিচিত্র আলপনা আঁকে বদ্ধঘরে। চিকিৎসা সুরু হয় তখন। বড় অদ্ভুত সে চিকিৎসাপদ্ধতি। ডাক্তার মিত্র ওর চোখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে ওকে ঘুম পাড়ান। অর্ধ অচেতন হয়ে পড়ে কৃশানু। সম্মোহিত হয়ে পড়ে না কি? একের পর একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলে। কখনও কোন প্রশ্নই করেন না ডাক্তারবাবু। ওকে বলেন দেহটা সম্পূর্ণ শ্লথ করে দিতে। সব চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে নিতে। মনটাকে করতে বলেন নিদাগ শ্লেটের মতই সাদা। তারপর সেই মনের শ্লেটে আপনা থেকে যে সব কথা ফুটে উঠতে থাকে তা অকপটে বলে যেতে হয় কৃশানুকে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনে যান ডাক্তার মিত্র—নোট লিখে চলেন পাতার পরে পাতা।

দিনকতক এইভাবে সিটিং দেওয়ার পর আজ অপরেশবাবু একটা নতুন পদ্ধতিতে আলাপ সুরু করলেন। নীলবাতি জ্বলা ঘরে রোজকার মতই ধূপের ধোঁয়ার গন্ধ একটা মোহময় আবেষ্টনী সৃষ্টি করেছে। গুরুভোজনে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে কৃশানু কম্বলটা মুড়ি দিয়ে শুয়েছে আরাম-কেদারায়। অপরেশবাবু বলেন, আজকে একটু অন্য ধবনের পরীক্ষা হবে। প্রতিদিনের মতই মনটাকে ভেকেণ্ট করবার চেষ্টা করুন। তারপর আমি একটা কথা সাজেস্ট করব। সেই কথাটা শুনে আপনার মনে যে সব কথার উদয় হবে তা অকপটে আমাকে বলে যাবেন। বুঝলেন?

ঘাড নেড়ে কৃশানু জানায় সে বুঝেছে। চোখ বুজে সে চেষ্টা করতে থাকে মনটাকে ফাঁকা করতে। কোন একটি বিষয়ে মনকে একাগ্র করা যে কত কঠিন তা জানা ছিল কৃশানুর—কিন্তু বিষয়হীন নিছক শূন্যের উপর মনকে একাগ্র করা যে সে তুলনায় কতটা কঠিনতর তা এতদিনে বুঝতে শিখেছে। অনেকক্ষণ পরে অপরেশবাবু বলেন, আমি আপনাকে কথাটা বলছি—বলুন কি মনে পড়ছে আপনার।—গয়া।

চোখ বুজেই কৃশানু বলতে থাকে—গয়া স্টেশন, ফল্গুনদী, শ্রীপাদপদ্ম, শ্রীচৈতন্যদেব, মোটরের হর্ন, গয়া পাটনা ব্রাঞ্চলাইন, ফুলওয়ারি গ্রাম;—আর কিছু মনে পড়ছে না।

অপরেশবাবু বলেন, বেশ, চোখ খুলুন এবার।

কৃশানু এতক্ষণে তাকায়। অপরেশবাবু ওই কথাগুলির সূত্র ধরে অনেক-কিছু প্রশ্ন করেন। তারপর বলেন, আজকের মত এই থাক।

কৃশানু বলে, কোথাও কিছু নেই, আপনি একেবারে আমার পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করলেন কেন? 'গয়া' বললেন কেন?

অপরেশবাবু বলেন, আপনি মশাই রোজ কত কি আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছেন—আমি তো কোনদিন প্রতিবাদ করিনি। আজ না হয় আমিই একটা বেতালা কথা বললাম।

আচ্ছা, মোটরের হর্নের কথা কেন বললাম আমি? গয়ার সঙ্গে তো মোটরের কোন ভাব-সাযুজ্য নেই।

মোটরটা আপনার চিন্তারাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছে। ঠিক ওই সময় নিচেকার রাস্তায় হর্ন বাজিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছিল। সেটা আপনার কানে গেছে। তাতেই আপনার একাগ্রতা নষ্ট হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি গয়া ছেড়ে ব্রাঞ্চ লাইনে রওনা হয়েছেন। হয়তো সেইজন্যেই যা খুঁজছিলাম তা পেলাম না।

অপরেশবাবু চলে গেলেন, কিন্তু ঘুম এল না কৃশানুর। জেগে শুয়ে রইল সে। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ গযার কথা বললেন কেন ডাক্তারবাবু? গয়াতে সে কখনও নামেনি। গ্র্যাণ্ডকর্ড দিয়ে যাতায়াতে গয়া স্টেশনকে দেখেছে শুধু। ওর মনে হল—সবটাই বুজরুকি। মনঃসমীক্ষণ না হাতী! গয়ার সঙ্গে তার কোন দিক থেকে কোন সম্পর্ক নেই।

দার্জিলিঙে আসার পর ওর ঘুমটা গাঢ়তর হয়েছে। মাত্র দুদিন দুঃস্বপ্ন দেখেছে। বাকি কদিন ঘুমিয়েছে ভালই। আজ কিন্তু তার ঘুম এল না। এলোমেলো চিন্তায় মনটা ঘুমের কথা ভুলে গেল। একটু তন্দ্রামত এসেছে—হঠাৎ একটা শব্দে ঘোরটা কেটে যায়। শুক্লপক্ষের রাত। এদেশে চাঁদের কদর নেই। নিস্তব্ধ রাত্রে একা জেগে আছে বেচারী তারাভরা আকাশে। কাচের সাসি দিয়ে কৃশানু দেখতে পায় বাড়ি থেকে কে একজন বেরিয়ে যাচ্ছে গেট খুলে। চট করে ঘড়ির দিকে নজর পড়ে ওর। রাত এগারোটা। কে লোকটা? সর্বাঙ্গ একটা কালো ওভারকোটে ঢাকা। মাথায় শেখ আবদাল্লা মার্কা গরম টুপি। এত রাত্রে কে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে? ডাক্তার মিত্রের তুলনায় লোকটা বেঁটে, বাহাদুরের তুলনায় লম্বা। তবে কি চৌধুরী? এত রাত্রে তার বাইরে যাবার কি কারণ থাকতে পারে?

ক্যালকাটা রোডে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ হল। স্পষ্ট শুনতে পেল মোটরের হর্ন। ডাক্তার মিত্রের গাড়ির হর্ন। তারপর চরাচর আবার স্তব্ধ হয়ে আসে। কৃশানুর ঘুম ছুটে গেছে একেবারে। ঘরময় পায়চারি করতে থাকে। চকিতে কান পেতে কি শোনে। হ্যাঁ, সেতারের আওয়াজ। ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে। অলসভাবে কে যেন আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে সেতারের তারে। আশাবরী? না কানাড়া? উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে। মধ্যরাত্রে দরবারী কানাড়ায় আলাপ করছে কে? ত্রিসীমানায় অন্য কোন বাড়ি নেই। দোতলার ঘরে অবশ্য রেডিও থাকতে পারে—কিন্তু ভারতীয় স্টেশন এখন তো সব বন্ধ। তা ছাড়া—হ্যাঁ কান পেতে শুনল, সেতারের সঙ্গে তবলা বাজছে না। একাই কেউ বাজাচ্ছে সেতার। রেডিও নয়। দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। বাড়িটা ঘুমাচ্ছে। হলকামরার দেওয়াল-ঘড়িটা শুধু অতন্দ্র প্রহরা দিচ্ছে; সেতারের আওয়াজ আসছে দোতলা থেকে। কৌতূহল সম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে ক্রমে। সিঁড়ি দিয়ে চুপিসারে দ্বিতলে উঠে আসে। স্বাহার রুদ্ধঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে বাঁকা একটা আলোর রেখা। সেতার বাজছে স্বাহার ঘরেই। মধ্যরাত্রে একা ঘরে দরবারী কানাড়ায় আলাপ করছে স্বাহা। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে কৃশানু। হাড় কাঁপানো শীত; কিন্তু ওর মনে হল শীতে নয় মীড়-গমকের মূর্ছনায় সেতারের তারের সঙ্গে 'রেসনেন্সে' কাঁপছে ওর সারা দেহ! পাহাড়ের গায়ে জ্বলছে একসার স্থির জোনাকীর আলো। ওটা ঘুমের দেশের আলোকমালা। মাথার উপর জ্বলছে একমুঠো তারা। সবাই কাঁপছে শব্দ-তরঙ্গের কম্পনে!

সম্বিত ফিরে পেল সমের মাথায় হঠাৎ বাজনাটা থেমে যাওয়ায়। চকিতে আত্মস্থ হয় কৃশানু। স্বাহার ঘরে খুটখাট শব্দ উঠছে। বোধ হয় সেতারটা তুলে রাখছে স্বাহা। হয়তো এখনই একবার বাইরে আসবে সে। দেখতে আসবে চৌধুরী ফিরল কিনা। দ্রুত লঘুপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে কৃশানু।

এত রাতে গেলেন কোথায় চৌধুরী গাড়ি নিয়ে? কি প্রয়োজন হতে পারে? ঘরে ফিরে এসে অনেকক্ষণ নিবিড়ভাবে সে কথাই ভাবতে থাকে। রাত বাড়ছে। অথচ চৌধুরী ফিরে এল না। রাত দুটো পর্যন্ত দেখে ঘুমের চেষ্টা করতে থাকে। হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল। দোতলা থেকে নামল কখন? নামল কেমন করে? এতক্ষণ তো এদিকটা মনেই পড়েনি।

পরদিন সকালে সব কথা খুলে বলতে গেল অপরেশবাবুকে—আর তখনই বুঝতে পারল কৃশানু, কিছু একটা কথা তার কাছ থেকেও গোপন রাখছেন ডাক্তারবাবু। সমস্ত কাহিনীটা শুনে হেসে উঠছেন অপরেশবাবু;—বিশ্বাসই করতে চাইলেন না চৌধুরীর নৈশ অভিযানের কথা। মধ্যরাত্রে সেতারের শব্দটা অবশ্য এমন কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু ওঁর গাড়ি করে চৌধুরীর বেরিয়ে যাওয়ার কথায় বললেন, আপনি নিশ্চয় ভুল দেখেছেন মিস্টার রায়। আমার গাড়ির চাবি আর গ্যারেজের চাবি দুটোই আমার কাছে ছিল। দ্বিতীয়ত সকাল সাড়ে ছটার সময় আমি বাইরে এসে দেখেছি চৌধুরী টুথ-ব্রাশ করতে করতে পায়চারি করছে।

কৃশানু চুপ করে যায়। দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে না তার, সে স্পষ্ট দেখেছিল গেট খুলে একটি লোককে বেরিয়ে যেতে। ডাক্তার মিত্র আর বাহাদুর ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই—সুতরাং ভুল তার হতে পারে না। বললে, আপনার গ্যারেজের অথবা গাড়ির ডুপ্লিকেট চাবি কার কাছে থাকে?

ডুপ্লিকেট চাবি নেই।

গতকাল রাত্রে চাবিটা আপনি কোথায় রেখেছিলেন?

অপরেশবাবু হেসে বলেন, আপনি যা ভাবছেন তা হয়নি। চাবিটা আমি বালিশের নিচে নিয়ে শুই, আর আমার ঘর রাত্রে ভিতর থেকে বন্ধ থাকে।

কৃশানু আর কোন কথা বলে না।

কি হল? চুপ করে গেলেন যে? মনে হচ্ছে আমার কথাটা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না আপনি।

হেসে কৃশানু বলে, আপনিই আমাকে এ রহস্যের কিনারা করতে ডেকে এনেছেন, সুতরাং আপনার কথা অবিশ্বাস করব কি করে? তবে কি জানেন, গোয়েন্দা হিসাবে সব রকম সম্ভাবনাই আমাদের যাচাই করে দেখতে হয়, আর তাই সবাইকেই সন্দেহের চোখে দেখতে হয়।

অপরেশবাবু ইঙ্গিতটা বুঝতে পারেন নিশ্চয়—কিন্তু এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলেন না। আর তাতেই সন্দেহটা দৃঢ়তর হল কৃশানুর। বুঝলে ডাক্তার মিত্র জ্ঞাতসারে একটা সত্য গোপন করছেন। কিন্তু কী তাঁর স্বার্থ?

একটু পরে অপরেশবাবু বলেন, আপনি বোধ হয় স্বাহার মধ্যে পাগলামীর কোন লক্ষণ দেখেননি, নয় ?

মাঝরাতে উঠে সেতার বাজানো নিশ্চয় পাগলামীর পর্যায়ে পড়ে না।

বেশ, আজ সন্ধ্যায় আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব, পারবেন যেতে ?

কোথায় ?

সন্ধ্যার সময় স্বাহা রোজ বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত আটটা নাগাদ। লক্ষ্য করেছেন বোধ হয়। ও কোথায় যায়, আমি জানি। আপনি যদি কার্ট রোড পর্যন্ত নামতে পারেন তাহলে আপনাকে দেখিয়ে আনতাম।

কোথায় যায় সে ?

কোথায় যায় তা আগে থেকে বলব না। দৈবক্রমে আজ যদি সে ওখানে না যায়, তাহলে আপনি আবার আমার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভেবে বসতে পারেন। গোয়েন্দা হিসাবে সকলকেই সন্দেহের চোখে দেখেন কিনা আপনারা !

শেষের কথাটার মধ্যে যে শ্লেষ ছিল সেটা বুঝতে না পারার ভান করে কৃশানু সংক্ষেপে বলে, বেশ, যাব আমি।

নামতে পারবেন তো আমার হাত ধরে ?

পারতেই হবে আমাকে।

চৌধুরী যে দিনের বেশীর ভাগ সময়েই বাড়ির বাইরে থাকে এটা লক্ষ্য করেছে কৃশানু। রাত্রেও যে সে বাইরে থাকে এটা অবশ্য স্বীকার করেননি অপরেশবাবু; কিন্তু দিনের বেলাতেও বাইরে বাইরে কটায় এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। স্ত্রীর সঙ্গে তার বনিবনাও হয়নি, সুতরাং এর একটা যুক্তি আছে ;—কিন্তু কি জানি কেন কৃশানুর মনে হয় চৌধুরীর এই দীর্ঘ সময় বাইরে থাকার পিছনে আরও কিছু হেতু আছে। সেই হেতুটা ডাক্তার মিত্র হয়তো জানেন, কিন্তু গোপন করছেন।

সন্ধ্যার পর স্বাহা প্রতিদিনের মতই বের হয়ে গেল একা। একটু পরেই নেমে এলেন ডাক্তার মিত্র। কৃশানু তৈরি হয়েই ছিল। অল্প কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার মিত্রের হাত ধরে টর্চের আলোয় ধীরে ধীরে নেমে আসে পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে। মনের দুর্বলতাকে সে জোর করে চেপে রাখল ;—না মাথা ঘুরলে চলবে না। ওর প্রিয়বান্ধবী জড়িয়ে পড়েছে একটা রহস্যময় ষড়যন্ত্র জালের মধ্যে ! তাকে উদ্ধার করবে কৃশানু। এতদিনে

ওর বিশ্বাস হয়েছে স্বাহা প্রকৃতই অপ্রকৃতিস্থা নয়—তাকে এরা পাগল করে তুলছে! আর যদি সত্যিই তার মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিয়ে থাকে—তার জন্য দায়ী কে? কার জন্যে আজ মৌনস্তব্ধতা মুখর করে তোলে স্বাহা সেতারের করুণ কান্নায়? কার নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না সে?

ছোট্ট এ্যাম্বাসাডার গাড়িটা ড্রাইভ করে নিয়ে চলেন ডাক্তার মিত্র। ড্রাইভারের সীটের পাশেই দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকে কৃশানু। খাদের ধার ঘেষে যাওয়ার সময় এক একবার সিরসির করে উঠছে হাড়ের মধ্যে। একটা বাঁকের মুখে চাপা আর্তনাদ করে চোখ বন্ধ করে—ভয়ে। ডাক্তার মিত্র তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে প্রশ্ন করেন—ফিরে যেতে চায় কিনা। দাঁতে দাঁত চেপে কৃশানু বলে, না, চলুন।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তার ধারে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সীটে জুত করে বসেন অপরেশবাবু। বলেন, আমি যাব না, আপনি একাই যান। সামনের ওটা একটা বুদ্ধিস্ট মনাস্টরি।

কৃশানুও তাই চায়। টর্চটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যায়। শহরের একান্তে নির্জন নিস্তব্ধ বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম। সিংহদ্বার অতিক্রম করে চওড়া একটা চাতাল। লোকজন বিশেষ নেই। ওদিকে একটা ঘরে বাতি জ্বলছে। একজন বৌদ্ধ শ্রমণ কি একটা গ্রন্থ পড়ছেন। এ ধারে একসার গোল গোল ড্রাম। নেপালী ভাষায় তার গায়ে কি সব লেখা। পাথরের থাম—স্তব্ধ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। চাতালটা পার হয়ে জুতো খুলে মন্দিরের মণিকোটায় প্রবেশ করে। বেশ বড ঘর—ভিতরটা। সামনের পিতলের বিরাটকার বুদ্ধমূর্তি। ধূপদানীতে পুড়ছে সুগন্ধী ধূপ। দীপাধারে জ্বলছে একসার প্রদীপ। সম্মুখে একটা বড় ব্রোঞ্জের থালা। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে বসে আছেন। আর তাঁর থেকে কিছু দূরে নতজানু হয়ে বসে আছে স্বাহা। বুকের কাছে হাত দুটি জোড় করা। মুখের একটা পাশ প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা যেন! স্তব্ধ বিস্ময়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে কৃশানু।

আধো-অন্ধকারে এই বৌদ্ধ মন্দিরের নিভৃত কোণায় স্বাহার যেন একটা নতুন রূপ ফুটে উঠেছে। কৃশানুর মনে হল—ওর চোখের সামনে বসে থাকা ঐ মেয়েটি যেন স্বাহা মিত্র নয়—ও যেন স্থানকালপাত্রের অতীত কোন এক বিদেহী সত্বা—তার স্থূল দেহের একটা ছায়ামাত্র পড়ে আছে ওখানে।

ও যেন কোন হারিয়ে-যাওয়া অবন্তী-উজ্জয়িনীর বৌদ্ধ ভিক্ষুনী তথাগতের পদপ্রান্তে নামিয়ে দিতে এসেছে জাগতিক বেদনার ভার।

চোখ দুটো জলে ভরে এল সেণ্টিমেণ্টাল কৃশানুর। কেমন যেন অপরাধ প্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ক্রমশঃ।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে কি জানি কেন ঘণ্টা বেজে ওঠে। বোধ হয় রাত্রের মত মন্দিরদ্বার বন্ধ হওয়ার সঙ্কেত। বৌদ্ধ ভিক্ষু পুঁথি বন্ধ করে উঠে পড়েন। স্বাহাও প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়।

ফেরার পথে ডাক্তার মিত্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দেখলেন? উত্তরে কৃশানুও সংক্ষেপে বলেছিল, দেখলাম। কি দেখল, তা আর জানতে চাইলেন না ডাক্তারবাবু—কৃশানুও কিছু বলল না।

বাড়ি ফিরে এল ওরা রাত সাড়ে নটায়। তখনও স্বাহা ফেরেনি। চৌধুরী বসেছিলেন বাইরের ঘরে। ওদের আসতে দেখে উঠে গেলেন উপরের ঘরে। স্পষ্টই বোঝা যায় চৌধুরী এড়িয়ে চলতে চাইছেন।

আহারাদির পর ওঁর ঘরে আবার এসে বসলেন ডাক্তার মিত্র। তাঁর হাতে এক প্যাকেট ছবি। কৃশানুকে একের পর একটা ছবি দেখাতে থাকেন। কৃশানুকে বলে যেতে হবে কি দেখছে সে। এ যেন এক অদ্ভুত পাগলের খেলা। কৃশানুর মনে হল দিনের পর দিন এভাবে চিকিৎসা চলতে থাকলে ভালমানুষও পাগল হয়ে যায় বোধ হয়। তবু অপ্রতিবাদে বলে যায়—পাখী, আলপনার নক্সা, রাক্ষসের মুখ, একগুচ্ছ করবীফুল—

নোট নিতে থাকেন ডাক্তার মিত্র। ছবির বাণ্ডিলটা শেষ হলে বলেন, বেশ, আবার মনটা ফাঁকা করুন। আজ আবার একটা কথা সাজেস্ট করছি—আপনার যা মনে হচ্ছে বলে যান।

কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্তের পরে ডাক্তারবাবু বলেন, গোয়া!

নিমীলিত নেত্রে কৃশানু বলে যায়, সালাজার-পর্তুগাল স্পেন-মাদ্রিদ—সমুদ্রের ঢেউ—প্লাবন—শ্রীমতী—মাইলোমিটার।

তারপরেই থেমে যায়। তাকায় চোখ খুলে। হেসে বলে, কি কি বললাম বলুন তো?

খাতা দেখে মিত্র বলেন, গোয়া থেকে সালাজার, ন্যাচারালি পর্তুগাল। তা থেকে স্পেন, মাদ্রিদ। তারপর বলেছেন সমুদ্রের ঢেউ, প্লাবন, শ্রীমতী আর মাইলোমিটার।

কিন্তু এমন অদ্ভুত কথাগুলো কেন বলে গেলাম আমি? মাদ্রিদ পর্যন্ত চিন্তাধারার একটা সামঞ্জস্য আছে—কিন্তু তারপর?

গোয়া এবং পর্তুগালের প্রসঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ মনে আসা অস্বাভাবিক নয়। সমুদ্রের ঢেউ থেকে মনে পড়তে পারে প্লাবনের কথা।

কিন্তু শ্রীমতী?

ওটাও আন্দাজ করতে পারি। সমুদ্রের ঢেউটা মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়েছে ভাবসমুদ্রের প্লাবনে। বৌদ্ধধর্মের প্লাবন ব্রাহ্মণ্য সমাজের উপর। সন্ধ্যার অনুভূতিটা আপনার মন থেকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি। তাই নটীর পূজার শ্রীমতীর কথা মনে পড়েছে আপনার। কিন্তু আমি ভাবছি, হঠাৎ মাইলোমিটার মনে হল কোন্‌সূত্রে? স্পীডোমিটার হলেও না হয় একটা অর্থ পাওয়া যেত।

কৃশানু একটু চুপ করে থেকে বলে, একটা কথা। আপনি এ সব অদ্ভুত প্রশ্নই বা করছেন কেন, আর আমার এসব আবোলতাবোল উত্তরগুলোই বা লিখে রাখছেন কেন?

ডাক্তার মিত্র একটু ভেবে নিয়ে বলেন, ক্রিমিনলজি নিয়ে যখন আপনার কারবার, তখন সাইকোলজির মোদ্দা কথাগুলো নিশ্চয় আপনার জানা আছে। সুতরাং আপনার বুঝতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয় যে আপনার এই অসুখের উৎপত্তি নিজ্ঞান-মনের কোনও নিরুদ্ধ কামনার উৎস থেকে। বহুদিন আগে হয়তো একেবারে শৈশবে, কোন একটা ইচ্ছা আপনার মনে জেগেছিল। সেটা আপনি দমন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। হয়তো সামাজিক বাধা, নয়তো অশ্লীল মনে হওয়ায় জোর করে ইচ্ছাটাকে দমন করেছিলেন। এখন চেষ্টা করেও না সে ঘটনা, না সেই কামনার বস্তুটি কিছুই আপনি মনে করতে পারেন না। সম্মোহিত অবস্থায় যখন আপনার মনের প্রহরী ঘুমিয়ে পড়ে তখন সেই গুপ্ত কথার দু একটা আভাস ভেসে ওঠে। দু একটা অসংলগ্ন কথা আপনি বলেছেন যা থেকে আমার ধারণা হয়েছে, আচ্ছা, আপনি কোনদিন গয়া অথবা গোয়াতে গিয়েছেন?

না তো।

গয়া অথবা গোয়া বন্দরে আপনার পরিচিত কেউ কখন ছিল? এই দুটি স্থানের কোন ঘটনা কোনভাবে আপনার মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে?

অনেকক্ষণ ভেবে কৃশানু বলে, কই, মনে তো পড়ে না।

আজ তবে এখানেই থাক। চেষ্টা করে মনে আনতে পারবেন না, পারা যায় না। তবে খুঁজে একদিন আমি বার করবই।

অপরেশ বাবু চলে যান। কৃশানুর ঘুম আসে না। রাত বাড়ছে। জানলা দিয়ে জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে কৃশানু। স্বাহা কি সত্যিই পাগল হয়ে যেতে বসেছে? কিন্তু পাগলামীর কি লক্ষণ সে দেখেছে এ পর্যন্ত? স্বাহা ওকে চিনতে পারেনি। পারেনি নয়, চায়নি। খুব স্বভাবিক সেটা। কৃশানু রায়কে সে ভুলতে চায়, তাই সুব্রত দাসকেও সে অস্বীকার করতে চায়। স্বাহা মধ্যরাত্রে উঠে সেতার বাজায়, বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করে। সেগুলো অস্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু পাগলামী কি?

ঢং ঢং করে দেওয়াল-ঘড়িতে এগারোটা বাজল। ঘুম আসছে না। স্বল্প পরিসর রুদ্ধদ্বার কক্ষে পায়চারি করতে থাকে। হঠাৎ একটা শব্দে চোখ তুলে তাকায়। না, ভুল হয়নি তার, কালো ওভারকোট পরা একজন লোক গেট খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কৃশানুও ওভারকোটটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে আসে নিঃশব্দে। প্রচণ্ড কনকনে শীতের একটা ঠাণ্ডা চাবুক এসে পড়ে ওর মাফলার-জড়ানো মুখে। কিন্তু থামে না সে—পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে গেট খুলে। পাথর বাঁধানো পাকদণ্ডীর পথে টর্চের একটা গোল আলো যেন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নেমে যায় ক্যালকাটা রোডের দিকে। কৃশানুও ঢালু পথ বেয়ে খানিকটা নেমে আসে। নীরন্ধ্র অন্ধকারে আর এগিয়ে যেতে সাহস পায় না। প্রয়োজনও ছিল না। একটা মোটর গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। অপরেশবাবুর গাড়িটাই নাকি? অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে ফিরে এল কৃশানু।

তারাভরা আকাশের প্রচ্ছদপটে স্তব্ধ বাড়িটা যেন প্রহরা দিচ্ছে। আশ্চয, দোতলার কাচের জানলায় আলোর আভাস। স্বাহার ঘরে; কিন্তু বিজলি বাতি তো নয়। প্রচণ্ড শীতে যেন থরথর করে কাঁপছে আলোটা—নাকি উত্তেজনায় কাঁপছে ওটা? স্বাহা জেগে আছে, সেতারের আওয়াজ উঠছে আজও। ঘরে গেল না কৃশানু। পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে বাড়িটার পিছন দিকে এগিয়ে যায় যেখানে দ্বিতল জমির সমতল। ওর মনে পড়েছে, ঐখানে একটা বড় পাথর আছে; তার উপর দাঁড়ালে জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। পথ এটা ঠিক নয়। পাথর আর গাছের শিকড় আঁকড়ে হাতে পায়ে টেনে তুলতে হল নিজেকে। একেবারে তন্ময় না হয়ে পড়লে সে বুঝতে পারত তার

মত নার্ভাস নিউরটিক রুগীর পক্ষে এ পথটা প্রশস্ত নয়। এসব কথা খেয়ালই হল না তার। জানলার প্রায় সমতলে এসে কাচের সার্সি দিয়ে ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই স্তম্ভিত হয়ে যায় একেবারে।

চৌধুরী নেই। ঘরে জলছে একটা বড় প্রদীপ। কাঠের একটা তেপায়ার উপর পিতলের ছোট্ট একটা বুদ্ধমূর্তি। সামনে জলছে ধূপদানীতে একসার ধূপকাঠি। ধুমুচিতে পুড়ছে কী একটা সুগন্ধী। গলগলে ধোঁয়ায় প্রদীপজ্বলা আবছা অন্ধকারের বুকে লেগেছে কুয়াশার প্রলেপ। আর সেই মোহান্ধকার নির্জনকক্ষে ওই বুদ্ধমূর্তির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে স্বাহা সেতার বাজাচ্ছে।

তিল তিল করে সেজেছে স্বাহা। সে সাজ এ সহস্রাব্দির নয়! মাথার উপর দিয়ে সূক্ষ্ম চীনাংশুকের ওড়না। অজন্তা-ফ্রেসকোতে দেখা পিছনে ফাঁস দেওয়া ময়ুরকণ্ঠি রঙের একটা দৃঢ়বদ্ধ বক্ষবন্ধনী। সপিল বেণীতে রুপালী জরির ফিতের সাথে সাদা কি একটা ফুলের মালার জড়াজড়ি। সূর্মা আঁকা টানা চোখের পল্লব ভিজা ভিজা। মনিবন্ধে, গলায় ফুলের মালা।

গুটি কেটে যেমন হঠাৎ বেরিয়ে আসে বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতি, কালো মেঘের বুকে জেগে ওঠে সপ্তবর্ণা ইন্দ্রধনু—তেমনি জাগতিক স্থূলতার বন্ধন কেটে ওই অভিশপ্ত মেয়েটি যেন নূতন রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে এই মধ্যরাত্রির স্তব্ধ নির্জনতায়,—রূপে রসে সুরের মূর্ছনায় মেলে ধরেছে তার প্রাণের রঙ তারাভরা আকাশের নিঃসীমায়। কৃশানুর আজও মনে হল—ওর বোধশক্তি বুঝি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তার মূর্ছাহত চেতনার সামনে থেকে জগৎ যেন হারিয়ে যাচ্ছে অনুভূতির ওপারে—যেমন করে মিলিয়ে যায় বনের অন্ধকারে পলাতকা জোনাকির শেষ আলো!

ঘরে ফিরে এসেও ঘুম এল না কৃশানুর। এ কেমনতর পাগলামী? ডাক্তার মিত্র বলেছিলেন—মাঝে মাঝে ওর নাকি আত্মবিলুপ্তি ঘটে, তখন সে ভুলে যায় বর্তমানকে। অতীত ইতিহাসের কোন জনপদবধূর সঙ্গে তখন সে অনুভব করে একটা ক্ষণিক একাত্মবোধ। কিন্তু এ তো হঠাৎ-আসা রোগের আক্রমণ নয়! এর জন্য যে প্রস্তুতের প্রয়োজন। কে এনে দিয়েছে তাকে ফুলের মালা? কখন বেঁধেছে সে দীর্ঘ কবরী? নিঃসন্দেহে একবেলা ধরে নিজেকেই নিজে সাজিয়েছে স্বাহা। চৌধুরী কি জানতে পারেনি? কিন্তু দর্শকহীন এ সঙ্গীতসভার জন্য এত কেন সেজেছে স্বাহা?

পরদিন সকালে উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেল। প্রাতরাশের টেবিলে আগেই এসে বসেছেন সবাই। কৃশানু দেরী করে ফেলার জন্য একটু কুণ্ঠা প্রকাশ করল,—কেউ জবাব দিল না। চৌধুরী সকালের খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে রইলেন। স্বাহা চা তৈরী করতে ব্যস্ত। কাজলকালো চোখ দুটি ছাড়া গতরাত্রের ইতিহাস যেন মুছে ফেলেছে সে নিঃশেষে।

কৃশানু সরাসরি চৌধুরীকে প্রশ্ন করে বসে, কালরাত্রে কি আপনি বাইরে বেরিয়েছিলেন মিস্টার চৌধুরী ?

স্বাহার হাতটা একটু কেঁপে ওঠে ওর হঠাৎ প্রশ্নে। চায়ের লিকার উছলে পড়ে টেবিলক্লথে। উসখুস করে ওঠেন মিত্রসাহেব। কাগজ থেকে মুখ না তুলেই রুক্ষস্বরে প্রতিপ্রশ্ন করেন চৌধুরী, রাত্রে ? কত রাত্রে ?

প্রত্যেকটি শব্দ পরিষ্কার উচ্চারণ করে কৃশানু বলে, রাত এগারোটা পঁচিশে ?

এবার কাগজটা নামিয়ে রাখেন চৌধুরী। চকিত চাহনিতে কৃশানুকে একনজর দেখে নিয়ে আবার তুলে নেন কাগজটা। জবাব দেন না।

নৈঃশব্দ নাকি স্বর্ণময়। কিন্তু সেটা চায়ের টেবিলে নয় নিশ্চয়। তাই ডাক্তাব মিত্র তাড়াতাড়ি পরিবেশটা হালকা করতে বলে ওঠেন—একবার ঘুমালে আমার ভগ্নিপতিটি একেবারে কুম্ভকর্ণ ! রাত্রে উঠবে ও ?

কাগজ থেকে চোখ না তুলেই চৌধুরী বলেন, তোমার চিকিৎসায় তা হলে কিছুই হচ্ছে না দেখছি ?

হেসেই জবাব দেন মিত্র, কেন ? আমার চিকিৎসা আবার কি দোষ করল ?

ভদ্রলোক এখনও রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখছেন !

পরিবেশটা হালকা তো হলই না, বরং আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল ডাক্তার মিত্রের হো-হোকরা হাসিতে।

চা-পর্ব এরপর আর জমল না। ডাক্তার মিত্রের অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না—কিন্তু বাকি তিনজনেই এমন গোমড়া মুখ করে রইলেন যে চায়ের বাটিগুলো খালি হতে যেন সবাই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। স্বাহা উঠে গেল—চৌধুরীও তার পিছন পিছন।

কৃশানু বলে, আপনি কি এখন বের হবেন ডাক্তার মিত্র ?

হ্যাঁ, এয়ার অফিসে যাব একবার—একটা টিকিট বুক করতে। দিন কয়েকের জন্য কলকাতা যেতে হবে আমাকে একটা কাজে।

আমিও আপনার গাড়িতে এলে অসুবিধা হবে? চুপচাপ ভাল লাগে না।

না না, আসুন না আমার সঙ্গে, ঘুরে আসবেন বরং।

একটা কথা,—গতকাল রাত্রেও গাড়ির চাবি আপনার কাছে ছিল?

উত্তর দিতে একটু দেরী হল ডাক্তারবাবুর। তারপর শুধু বলেন, হ্যাঁ।

আর কোন কথা না বলে তৈরী হয়ে নেয় কৃশানু।

আজ আর হাত ধরতে হল না। নিজেই নেমে এল কার্ট রোড পর্যন্ত। নিজেব চিন্তাতেই সে বিভোর। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে দরজাটা খুলে ভিতরে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন অপরেশবাবু। কৃশানু কিন্তু গাড়িতে উঠল না, পাদানিতে একটা পা রেখে বলে, এয়ার অফিসেই যখন যাচ্ছেন, তখন একখানা নয় দুখানা টিকিটই কেটে আনবেন কাইণ্ডলি। আমিও ফিরে যাব কলকাতায়।

একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার মিত্র বলেন, হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত?

হঠাৎই একটা সত্য আবিষ্কার করলাম যে এইমাত্র।

কি সত্য?

একটু হেসে কৃশানু বলে, আমার প্রফেসনের একটা এটিকেট আছে ডাক্তার মিত্র,—সেটা হচ্ছে এই যে গোয়েন্দার কাছে কোন কথা গোপন করতে নেই। আপনি তা করছেন। সুতরাং আর তো আপনাকে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে কি যেন চিন্তা করলেন ডাক্তার মিত্র। তারপর তিনিও একটু হেসে বলেন—বুঝলাম। কিন্তু আমার প্রফেসানেরও একটা এটিকেট আছে মিস্টার রায়,—সেটা হচ্ছে এই যে ডাক্তারের কাছে কোন কথা গোপন করতে নেই। আপনিও তা করছেন।

আমি? কেমন করে?

কালরাত্রে কেন মাইলোমিটারের কথা আপনার মনে হল আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনি তার জবাব দেননি। কিন্তু সাইকোলজিস্ট হিসাবে আমি বলতে বাধ্য যে উত্তরটা জানতেন আপনি। কাল রাত্রে ফিরে এসে যখন গাড়ি গ্যারেজে তুলেছিলাম তখন আপনি গাড়ির মাইলোমিটারের রিডিং

দেখে রেখেছিলেন—শুধু আমার উপরে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যই। বলুন ঠিক কিনা?

হ্যাঁ ঠিক। কিন্তু আপনিই বিচার করে বলুন এক্ষেত্রে প্রফেসনাল এটিকেট কে আগে লঙ্ঘন করেছে। আপনি চৌধুরীকে গাড়ির চাবি দেন—অন্তত মাইলোমিটারের রিডিং যে বেড়ে যায় এটা আপনার অজানা থাকতে পারে না।

ডাক্তার মিত্র হেসে বলেন, ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট! কেন মিথ্যা কথা বলেছিলাম, আসুন যেতে যেতে বরং সে কথাই বলি।

বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে উঠে বসে কৃশানু।

ডাক্তার মিত্রের কথা আদ্যন্ত শুনে ওর আহত মনে আবার নতুন করে আঘাত লাগল। কী ভুলই করেছে সে সেন্টিমেণ্টালের মত মানসীর প্রেমে পাগল হয়ে মানবীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে! ঠিকই বলেছিল ইভা—পারলে স্বাহাই পারত তাকে আবার সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতে। সে চেষ্টা করেনি কৃশানু। জয়লক্ষ্মীকে লাভ করতে হলে যে চরমমূল্য দিতে হয়, তা কি দিয়েছে সে? কেন সে ছুটে যায়নি পাটনায়? কেন জোর করে ছিনিয়ে নেয়নি তাকে? তাই আজ সে জীবন্মৃত একটা নিউরটিক রোগী, আর স্বাহা তিল তিল করে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে একটা কুৎসিত ক্লেদাক্ত অক্টোপাসের করাল আলিঙ্গনে! চৌধুরী লোকটাকে প্রথমদিন থেকেই সে বিষ নজরে দেখেছে। ভেবেছিল, ঈর্ষার দৃষ্টিতে বুঝি মানুষটাকে বেশী কালো করে এঁকেছিল। এখন বুঝতে পারে দৃষ্টি তার ভুল করেনি।

বিবাহের কয়েকদিনের মধ্যেই···—ঘনিষ্ঠ আলাপ হওয়ারও আগে চৌধুরী আবিষ্কার করে স্বাহার বাক্স থেকে—চিঠির বাণ্ডিল। আর সেই থেকেই একটা কুৎসিত সন্দেহ জেগেছে ওর মনে। স্বাহা নাকি চৌধুরীকে বিবাহ করেছে তার প্রাক্‌বিবাহজীবনের কোন বন্ধুর এক অবাঞ্ছনীয় দান অঙ্গে ধারণ করে! লোকটা এতদূর নির্লজ্জ যে সে অভিযোগ সে স্পষ্ট উচ্চারণ করেছে ডাক্তার মিত্রের কাছে। তার অনুমান যে সত্য, এটা প্রমাণ করতেই সে স্বাহার সঙ্গে রাত্রিবাস করে না। আর সেইজন্যই এই ডাক্তার ভাইবোনের চোখের আড়ালেও সে যাবে না আরও কয়েকমাস!

একটা অসহ্য যন্ত্রণায় কৃশানুর হৃদপিণ্ডটা মুচড়ে ওঠে। একটা বিবমিষা ওর নাড়িতে পাক দিয়ে ওঠে। মোটর চালানো সে ভালই শিখেছিল চাকরিতে

ঢুকে। এখন অবশ্য ষ্টিয়ারিঙে বসার কথা কল্পনাও করতে পারে না; কিন্তু সে তো ভয়ে। এখন তো ভয় নয়—গাড়িতে যেতে যেতে ওর অন্ত্রে যে পাক দিয়ে উঠছে সেটা আতঙ্কে নয়—ঘৃণায়! কী বীভৎস একটা জন্তুর কবলে সে ঠেলে দিয়েছে তার প্রিয়-লিপিবান্ধবীকে!

আজও বিকালে বাইরে গেল না স্বাহা। চুপ করে গিয়ে বসল পাইন গাছের আবছায়ায়, পাথরের উপর। শেষ সূর্যের ম্লান আলো মূর্ছিত হয়ে পড়ল ওর গায়ে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় আবীরের প্রলেপ—এখনই মিলিয়ে যাবে তা। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে বসেছিল স্বাহা।

আজও কৃশানু নিজেকে আবিষ্কার করল ওর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে। স্বাহার এই আধো-আড়ে বসার ভঙ্গিটার কেমন যেন একটা গোপন আমন্ত্রণের সঙ্কেত। এ যেন সরাসরি ডেকে নেওয়া নয়, আভাসে পাঠানো নিমন্ত্রণ। সরাসরি সবুজ আলো নয়—তবু সবুজ আলোর নিশ্চিত সম্ভাবনাময় হলদে আলোর সিগন্যাল।

পায়ে পায়ে কৃশানু উঠে আসে ওর সমতলে। একবার চোখ তুলে তাকায় স্বাহা, তারপর নত করে দৃষ্টি। না আবাহন, না বিসর্জন। একটু দূরে চুপ করে বসে থাকে কৃশানু। কী বলবে ভেবে পায় না। সমবেদনায় ওর মনটা কানায় কানায় ভরা কলসীর মতই টলমল করে। স্বাহাও কিছু বলে না।

যে মেয়ের মন ছুঁতে পেরেছ তুমি তার পাশাপাশি এমনি নিশ্চুপ বসে থাকাও রোমান্টিক। না-বলা কথার মৌনতা দুজনের মনেই তোলে গুঞ্জরণ, সিনেমার পর্দায় যেমন বাজতে থাকে নেপথ্যে আবহসঙ্গীত। কথা সেখানে হারিয়ে যায়—মনে মনে কোন অজ্ঞাত ওয়েভ-লেংথে হয় ভাবের বিনিময়। একজনের চুলের সুবাস, মুখের প্রোফাইল, শাড়ির তরঙ্গ আর একজনের মনে তোলে আলোড়ন—আর জনের মনের কথাও সিগারেটের নীলচে ধোঁয়ার মত ঘিরে ঘিরে পাক খেতে থাকে একজনের মনের চারিদিকে। পাইন বনের ঝিরঝিরানিতে, অস্তমান সূর্যের শেষ আশীর্বাদ মাখা মহামৌন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সাক্ষী করে ওরা আজ সেই চুপ করে বসে থাকার দুর্লভ মুহূর্তটির সন্ধান পেয়েছে। তবু খুশী হয়ে উঠতে পারে না কৃশানু—কেমন যেন খিন্ন বিষণ্ণ বোধ হয় তার। ওর বারে বারে এই কথাটাই মনে পড়ে যে স্বাহার মন ছুঁয়ে এই দুর্লভ মুহূর্তটিতে যে আছে সে ও নয়, সে ওর বন্ধু কৃশানু রায়! দার্জিলিঙ

পাহাড়ের রঙ্গমঞ্চে সে নায়কের চরিত্র অভিনয় করছে না—একটি পার্শ্বচরিত্র অভিনয়ের অধিকার পেয়েছে সে। তাই এই অমূল্য নৈঃশব্দকে চূর্ণ করে হঠাৎ সে বলে ওঠে, সেদিন আপনি অসুস্থ ছিলেন, আজও কি শরীরটা ভালো নেই আপনার ?

নতনেত্রেই স্বাহা জবাব দেয়, না, ভালোই তো আছি।

বিরক্ত হননি তো ?

না না, বিরক্ত হব কেন ? একা একা আমারও ভাল লাগে না। সেদিন—

বাধা দিয়ে কৃশানু বলে, সেদিনের কথা থাক্। বুঝতে পেরেছি আমার বন্ধু আপনার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেনি। তার প্রসঙ্গে আলোচনা আপনার ভাল লাগছে না। তাই মনে করা যাক—দার্জিলিঙে এসেই প্রথম আলাপ হয়েছে আমাদের।

স্বাহা কোনও জবাব দেয় না।

কেমন লাগে আপনার দার্জিলিঙ ?

স্বাহা যেন নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করে। বলে, ও প্রশ্নটা তো আমারই জিজ্ঞাসা করার কথা। আপনিই নতুন এসেছেন। আপনার কেমন লাগছে বলুন ?

আমি তো কিছুই দেখিনি এ পর্যন্ত।

দেখলেই পাবেন ঘুরে ঘুরে। অনেক কিছু দেখবার আছে এখানে। মহাকালের মন্দির, রেস কোর্স, জলাপাহাড, বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি।

আপনি সব দেখেছেন ঘুরে ?

না, আমিও কিছুই দেখিনি, ভালোই লাগে না।

বৌদ্ধ মন্দিরটা কোন দিকে ?

আমি ঠিক জানি না—দাদাকে বলবেন, নিয়ে যাবেন উনি।

মুখ দেখে তো মনে হয় না ও মিথ্যা কথা বলছে !

আপনি কখনও যাননি ঐ মন্দিরে ?

না, আমার ভাল লাগে না কোথাও যেতে।

এর পর কি বলবে ভেবে পায় না কৃশানু। ক্রমশঃ উপলব্ধি করে যে অনর্গল কথা বলে যাওয়ার মধ্যে দিয়েই হয়তো স্বাহার মনের অর্গলমোচন হবে। অপরিচয়ের দূরত্বটাকে জয় করতে হলে অনায়াসে আলাপ চালাতে

হবে ওকে। কিন্তু কি নিয়ে আবার কথা সুরু করবে বুঝতে পারে না। স্বাহাই বলে, দাদা বলছিলেন, আপনি নাকি একটা মানসিক অসুখে ভুগছেন। কী অসুখ? আই মীন—আপত্তি যদি না থাকে—

কথার একটা সূত্র খুঁজে পেয়ে খুশী হয় কৃশানু। বলে, না, আপত্তি আর কিসের? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন এ যুগের মানুষ নই। আমি যেন বর্তমানে নেই। অতীতে আছি। কখনও মধ্য এশিয়ার কোন নাম-না-জানা মরুনগরীতে নিজেকে আবিষ্কার করি। পথের বাঁকে যেখানে উদ্যত হয়ে থাকে রাইফেলের কালো নল, আবছায়া বিসর্পিল পথে চলতে থাকে আকরোট পেস্তা-বাদামের ছালার সঙ্গে কোকেন নিয়ে উটের ক্যারাভান—রাতের আঁধারে পাঁচ আমীর হাত বদলায় সুন্দরী নারীর ভাগ্য! আবার কখনও নিজেকে খুঁজে পাই অন্ধকার গুহার মধ্যে—মশালের আলোয় আমি তখন এক বৌদ্ধ শ্রমণ, এঁকে চলেছি পাথরের দেওয়ালে তথাগত বুদ্ধের জীবনালেখ্য। পরিধানে আমার গৈরিক কাষায়, মুণ্ডিত মস্তক, হাতে আমার জহরত গোলা রঙের বাটি।

স্বাহা অবাক হয়ে বলে, আশ্চর্য তো!

কৃশানু উত্তেজিত হবার অভিনয় করে, লোকে বলে আমি নাকি পাগল হয়ে যেতে বসেছি। কিন্তু আমি তো তা বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় এ রকম অতীতের আমির মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। যে কোন মানুষের এমন হতে পারে। এ যেন খুবই স্বাভাবিক। সকলেরই হয়। তাই মনে হয় না আপনার?

স্বাহাও কি অভিনয় করছে? সে কি সত্যই অবাক হয়ে বলল, কিন্তু আমার তো শুনে অদ্ভুত লাগছে! এমন হতে পারে তা তো শুনিনি কখনও? আপনার তখন কি মনে হয়? বর্তমানটা নেই?

কৃশানু একটু ভেবে বলে, বর্তমান আপনি কাকে বলেন?

আর পাঁচজন যাকে বর্তমান বলে তাকেই—যা না-অতীত, না-ভবিষ্যৎ।

একটা অদ্ভুত থিওরি মুখে মুখে খাড়া করে তোলে কৃশানু। বলে, বর্তমান কথাটা একটা মিসনোমার, বর্তমান বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না! আমি আপনি নেই। বর্তমানে এই যে দুনিয়াটা দেখছি, এটা নেই।

স্বাহা বলে, নেই মানে? আপনি-আমি নেই? সামনের ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়টা নেই?

না নেই! কাঞ্চনজঙ্ঘা বর্তমানে নেই। অতীতে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।

শঙ্করের মায়াবাদ?

না, দর্শনের ছাত্র নই আমি, এটা আমি ম্যাথেমেটিক্যালি রিয়ালাইজ করেছি। তাই আমি অতীতকে স্বীকার করি, স্বীকার করি অপ্রতিবাদে ভবিষ্যৎকেও। আমি ছিলাম, আমি থাকব এ দুটি অনস্বীকার্য। কারণ গত আর অনাগতের মাপ আছে, ব্যাপ্তি আছে, তৌল করা যায় তাকে। গত কালটা আমার অতীত, সমস্ত দিনটাই আমার স্মৃতির সঞ্চয়, তাকে আমি উপলব্ধি করেছি নিবিড়ভাবে ভালোয় মন্দে, কাঁদায় হাসায়। তেমনি মেনে নিতে রাজি আছি ভবিষ্যতকেও—কারণ তার ব্যাপ্তি আছে, আছে বিস্তার, অস্তিত্ব।

কিন্তু বর্তমান?

বর্তমান নেই। আমি আছি, কিন্তু আছি কি সময়ের মাপে? তাকে তৌল করব কোন সময়ের য়ুনিটের মানদণ্ডে। এই ঘণ্টাটা আমার বর্তমান নয়—কারণ ঘণ্টার আদিতে অন্তটা ছিল অনাগত, আবার অন্তে পৌছে আদিকে দেখছি অতীতরূপে। এই মিনিট? মিনিটের সুরুতেও শেষটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ—শেষে পৌছে সুরুকে যেমন দেখছি অতীতরূপে। মিনিট ভেঙে এলাম সেকেণ্ডে—স্প্লিট-সেকেণ্ডে। সমাধান হয় না তাও। তবু সময়ের সেই অতি সূক্ষ্ম খণ্ডের থেকে যায় একটা আদি আর অন্ত। আমার বর্তমানটা যখন আদিতে অন্ত তখনও আসেনি, যেমন আদি হয় অতীত যখন অন্তটায় আমার বর্তমান।

একটা দুর্বোধ্য গদ্য-কবিতার মত কথার ফুলঝুরি কেটে সমে এসে থামল কৃশানু। একটু দম নিল। হয়তো মাথামুণ্ডু নেই তার যুক্তিতে, কিন্তু সে যা চাইছিল তা হচ্ছে, হতে চলেছে। স্থির হয়ে গেছে স্বাহার দৃষ্টি। পলকহীন দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে ম্লানায়মান কাঞ্চনজঙ্ঘার শেষ রক্তবিন্দুটির দিকে। সূর্য অস্ত গেছে—কোথাও নেই এককণা রৌদ্র; শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘার নীলিমায় এখনও মুছে যায়নি তার শেষ রক্তিম চুম্বন। একটা অতীন্দ্রিয় মিষ্টিক আচ্ছাদনে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে স্বাহা। হয়তো এবার সেই কথা বলে উঠবে। তা কিন্তু সে বলে না। তাই আবার সুরু করে কৃশানু, আমি ভাবি, তবে কি আমার বর্তমানের ব্যাপ্তিটা এতই সূক্ষ্ম যে তার আদি ও অন্ত হারিয়েছে তাদের পৃথক সত্বা? মিশে গেছে এক হয়ে? যেমন মিশে যায়

জ্যামিতিক বিন্দুর সুরু ও শেষ? জ্যামিতিক সরল-রেখায় যেমন প্রস্থের বিস্তার? সময়ের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খণ্ডাংশকে আমি বর্তমান বলছি,—যে অংশে আমি 'আছি'—তার অস্তিত্বের তবে কি নেই কোন ম্যাগনিচ্যুড? তার মানে বাস্তবে আমি নেই?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বাহা বলে, আশ্চর্য যুক্তি তো আপনার। অদ্ভুত।

একটা আর্ত-জিজ্ঞাসায় ভেঙে পড়ল কৃশানু, এ সব কথা আপনার কখনও মনে হয় না? কখনও মনে হয়নি—আপনার বর্তমানটা ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল—যেমন করে এই মাত্র মিলিয়ে গেল কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথা থেকে সূর্যের শেষ রক্তিম স্বাক্ষর? কখনও আবিষ্কার করেননি নিজেকে তক্ষশীলায়, তাম্রলিপ্তিতে, উজ্জয়িনী অথবা অজন্তায়?

যেন একটা সরীসৃপ নেমে গেল স্বাহার গা বেয়ে। হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে স্বাহা, বলে, চলুন, ঘরে গিয়ে বসি।

প্রত্যুত্তর করার সময় দেয় না এক মুহূর্ত। দ্রুতচ্ছন্দ পাহাড়ী হরিণের মত তরতরিয়ে নেমে যায় সে পাকদণ্ডী বেয়ে, একবারও ফিরে দেখে না কৃশানু এল, না বসে রইল তার অদ্ভুত থিয়োরীর মোহাবেশে স্তব্ধ হয়ে।

কৃশানু লক্ষ্য করে সকলেই সতর্ক হয়ে গেছে রীতিমত। এ রহস্যময় পুরীতে সকলেই সকলকে সন্দেহের চোখে দেখছে। ডাক্তার মিত্র কলকাতা যাওয়াটা পিছিয়ে দিলেন। চৌধুরীর গতায়াতটাও কমে গেছে। স্বাহাও অলক্ষিতে গুটিয়ে নিল নিজেকে। সকলেই ওকে সন্দেহ করছে নাকি? ডাক্তার মিত্রকে আরও প্রশ্ন করে কৃশানু জেনেছে যে স্বাহাদের বিবাহ হয়েছিল রেজিষ্ট্রি করে। চৌধুরী ব্রাহ্ম, তাই হিন্দুমতে সে বিবাহ করতে রাজি হয়নি। ওর কেমন যেন মনে হল ডাক্তার মিত্র এখনও ওকে সব কথা বলেননি, কি যেন গোপন করছেন তিনি। একটা নতুন সম্ভাবনার কথা মনে হল ওর। গোয়েন্দা হিসাবে সব সম্ভাবনাই ওকে যাচাই করে দেখতে হবে। তাই সকলের অলক্ষিতে একদিন সে বেরিয়ে পড়ল পথে। আজকাল একা একা পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে ওঠানামা করতে আর সে ভয় পায় না।

সৌভাগ্যক্রমে দার্জিলিঙ থানা থেকে এখনও বদলি হয়ে যান নি জগদীশ দে। চিনতে পারেন তিনি কৃশানুকে। শুধু আইভির সহযাত্রী হিসাবেই

নয়, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রাক্তন অফিসার হিসাবেও। মনিমালা পরিবেশিত চা আর অমলেট আপ্যায়ন করলেন পুরানো বন্ধুকে।

কতদিন এসেছেন দার্জিলিঙে? খোঁজ করেননি কেন এতদিন?

আপনিই যে আছেন এখানে তা জানব কেমন করে?

উঠেছেন কোথায়? হোটেলে? কেন গরীবখানা তো ছিলই।

না হোটেলে নয়, আমার এক বন্ধুর গেস্ট হয়ে আছি এখানে। হিলি-রোড থেকে ডাইনে বেরিয়ে গেলে টিলার মাথায় একটা বাড়ি আছে দেখেছেন? হিল-পয়েণ্টে? সেখানেই উঠেছি।

হ্যাঁ, ও বাড়িটায় একজন বাঙালী ভদ্রলোক ভাড়া নিয়ে আছেন মাসখানেক। ছোট একটা এ্যাম্বাসাডার গাড়িও আছে, নয়?

কিছুই আপনার দৃষ্টি এড়ায় না দেখছি। আলাপ হয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে?

না আলাপ হয়নি। তবে খবর কিছুটা রাখতে হয় বইকি।

সোজা কাজের কথায় নেমে আসে কৃশানু। বলে, আমি আপনার কাছে এসেছি একটা বিশেষ প্রয়োজনে। ছুটিতে আছি, জানেন বোধ হয়—

হ্যাঁ, শুনেছি, সেই এ্যাক্‌সিডেণ্টের পর— আচ্ছা কি হয়েছিল বলুন তো সে রাত্রে?

হেসে কৃশানু বলে, ডাক্তার বলেন সে রাত্রের দুর্ঘটনার কথা মনে না আনতে। অবশ্য আপনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বলি—

বাধা দিয়ে জগদীশবাবু বলেন, না না, তবে থাক ও কথা। তার চেয়ে কাজের কথা কি বলছিলেন তাই বলুন।

আমি আপনার কাছে এসেছি একটি নির্ভুল সংবাদ সংগ্রহ করতে। খবরটা অত্যন্ত গোপনীয়। আপনি পাটনার পুলিস হেড-কোয়ার্টার্সে চিঠি লিখে একটা খবর আনিয়ে দিন আমাকে। পাটনা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার অফিসে গত সতেরোই আগস্ট লেট পি মিত্র বার-এ্যাট-ল'র একমাত্র কন্যা ডাক্তার স্বাহা মিত্রের সঙ্গে কারও বিবাহ লিপিবদ্ধ করা আছে কিনা। থাকলে ব্রাইড গ্রুমের নাম কি, এবং তার প্রাক্‌বিবাহজীবন সম্বন্ধে মোটামুটি কি খবর পাওয়া যায়।

জগদীশবাবু সব নোট করে নিয়ে বলেন, রেডিওগ্রামই করে দিচ্ছি। দিন পাঁচ ছয় পরে খবর নেবেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?

কৃশান্থ হেসে বলে, রহস্যটা এখনই পরিষ্কার করি কেন? তবে যদিও এ্যামেচারিস্ট হিসাবে এ রহস্যের সন্ধানে নেমেছে তবু আপনার সাহায্য যে কোন মুহূর্তে প্রয়োজন হতে পারে। আশা করি তা পাব।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

নমস্কার করে চলে এসেছিল কৃশান্থ। একেবারে গোড়া বেঁধে কাজ করবে সে।

পরের চার পাঁচ দিন চৌধুরী এ বাড়িতে একেবারেই এল না। অপরেশবাবুর কাছে কৃশান্থ শুনেছিল চৌধুরী বুঝি কোন এক হোটেলে উঠেছে। হোটেলের নামটাও বলেছিলেন তিনি। কৃশান্থ জগদীশবাবুর সাহায্য ব্যতিরেকেই সন্ধান নিয়ে জেনেছে যে সে হোটেলে মিস্টার চৌধুরী নামে কোন বোর্ডার নেই। এ কথা অপরেশবাবুকে সে অবশ্য বলল না। জগদীশবাবুর কাছ থেকে জবাব পাওয়ার আগে সে অপবেশবাবুকেও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। ডাক্তার মিত্রের মত বুদ্ধিমান লোক যে এ খবরটা নেননি এটাই সে বিশ্বাস করতে পারেনি। ওব চিকিৎসাও বন্ধ আছে এ কয়দিন। কৃশান্থই আপত্তি করেছিল—কেন আপত্তি করছে জানতে চাননি ডাক্তার মিত্র। আর এই কৌতূহলহীনতাই আরও সন্দিগ্ধ করে তুলেছে কৃশান্থকে। ওর মতে ডাক্তার মিত্রের এই চিকিৎসা বন্ধ রাখার ব্যাপারটা বিনা প্রশ্নে মেনে নেওযার মধ্যে আছে গিল্ট-কনসাসনেস। স্বাহার সঙ্গে আলাপটা আরও অন্তরঙ্গ হয়েছে ইতিমধ্যে। দু একবার দু জনে একসঙ্গে বেড়াতেও গেছে। আলগা আলাপ হয়েছে—মনেব দ্বার খোলেনি স্বাহা, তবু সে যে অসুখী এটা আকারে ইঙ্গিতে জানতে দিয়েছে কৃশান্থকে। সেদিন বিকালে সেই যে ছুটে পালিয়ে এসেছিল স্বাহা, তারপর আব মধ্যরাত্রে গানের আসর বসেনি দ্বিতলের নিজন কক্ষে। স্বাহা যেন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য সে একাই কোথায় বেরিয়ে যায়। নিশ্চুপ বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একবার দোতলায় উঠে আলাপ করতে গিয়ে পা টিপেই ফিরে এসেছে কৃশান্থ। ওর টেবিলে একটি চিঠির প্যাডের উপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছিল স্বাহা। অপরেশবাবুও তখন ছিলেন না বাড়িতে। সুব্রত দাসের সঙ্গে স্বাহার সম্পর্কটা এতটা ঘনিষ্ঠ নয় যে এমন একটা মুহূর্তে ওর পিঠের উপর একটা হাত রাখবে কৃশান্থ। নিঃশব্দে নেমে এসেছিল নীচে। মনে মনে ধিক্কার দিয়েছিল ওর বন্ধু কৃশান্থ রায়কে।

দিন সাতেক পরে জগদীশবাবুর কাছে চূড়ান্ত সংবাদ পাওয়া গেল। পাটনা অফিস থেকে জবাব এসেছে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অফিস থেকে জানা গেছে যে সতেরই আগস্ট লেট প্রতুল মিত্র বার-এ্যাট-লর কন্যা ডাক্তার স্বাহা মিত্র এম.বি. বি এস-এর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে মিস্টার এম চৌধুরীর। পাটনা অফিস আরও লিখেছে যে ব্রাইডগ্রুম পাটনারই ছেলে—বিয়ের পরই সস্ত্রীক কোথায় চলে গেছে। লিখেছে, মিস্টার চৌধুরী ইতিপূর্বেও একবার বিবাহ করেছিলেন। সে মেয়েটি আত্মহত্যা করে। এ নিয়ে খুবই স্ক্যাণ্ডেল হয়। প্রতিবেশীরা সন্দেহ করেছিল—আত্মহত্যা নয়, হত্যাই করা হয়েছিল হতভাগিনীকে অথবা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছিল তাকে। যদিও প্রমাণাভাবে পুলিস কেস চালায়নি। এ সব কথা পাটনার লোকেরা না জানে তা নয় তবু কেন যে ডাক্তার মিস মিত্র তাকেই বিবাহ করেন এবং তাঁর দাদা, (চিঠিতে বলা হয়েছে দাদাই অভিভাবক, এবং তিনি বিলাতী ডিগ্রিধারী উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তার) কেন যে এ বিয়ে অনুমোদন করলেন সেটা অনেকের কাছেই রহস্যজনক। পাটনার অফিস জানতে চেয়েছে এ বিষয়ে কেন প্রশ্ন করা হল এবং আরও কোনও বিস্তারিত সংবাদ চাই কি না।

টাইপ-করা চিঠিখানা জগদীশবাবুর হাত থেকে নিয়ে নিজেই পড়ল কৃশানু, একবার দুবার—তারপর ফেরত দিল।

এনি মোর ডিটেলস ?

হ্যাঁ চাই। চৌধুরীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কি ভাবে মৃত্যু হয়। সে ধনীর কন্যা ছিল কি না। তাঁর মৃত্যুতে স্ত্রীর সম্পত্তি সে পেয়েছে কি না। ডাক্তার অপরেশ মিত্র, মানে স্বাহার দাদার সঙ্গে এই চৌধুরীর কতদিনের আলাপ। বস্তুত ঐ চৌধুরীর সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ আমি বিস্তারিত জানতে চাই।

জগদীশ বলেন, কিন্তু এবার তো আমাকে বলতে হবে কেন এত কথা জানতে চাইছেন। অফিসিয়ালি এসব খবর বিস্তারিত জানতে চাইলে—

অফ কোর্স। থামিয়ে দেয় কৃশানু তাঁকে। সংক্ষেপে জানায় স্বাহা এবং চৌধুরীর কথা। ডাঃ মিত্রের কথাও। বলে, সে সন্দেহ করে চৌধুরী তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে হত্যার বদলে পাগল প্রতিপন্ন করতে চাইছে—হয়তো সত্যিই পাগল করে তুলেছে তাকে। নিঃসন্দেহে স্বাহার পৈতৃক সম্পত্তিটাই তার লক্ষ্য। উপসংহারে বলে, একটা জিনিস শুধু বুঝে উঠতে পারছি না

আমি। ডাঃ মিত্র কেন রাজি হলেন এমন একটি ছেলের সঙ্গে বোনের বিয়ে দিতে। এতবড় স্ক্যাণ্ডেলটা শুনতে পেলেন না তিনি পাটনায় বসেও?

জগদীশবাবু নির্বিকারভাবে বলেন, তার একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর এই যে, যে সন্দেহ করছেন আপনি চৌধুরীর উপর, ডাক্তার মিত্রকেও দিতে হয় তার অংশ। ধরে নিতে হয় যে ওঁরা দুজনে মিলে এটা করছেন।

কৃশানু জবাব দেয় না। গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে যায় ক্রমে।

জগদীশবাবুই আবার বলেন, আমি বরং ভাবছি অন্য কথা। চৌধুরী পাটনার ছেলে, স্বাহা দেবীও পাটনা কলেজে পড়েছেন। স্ক্যাণ্ডালটা তো তাঁরও শোনা উচিত। তিনিই বা রাজি হলেন কেন?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কৃশানু বলে, তার কারণটা আমি অনুমান করতে পারি। অন্য এক জায়গা থেকে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সে সময় ওর মনটা প্যারালাইজড হয়ে ছিল।

এবার নীরব হতে হয় জগদীশবাবুকে।

প্রাতরাশের টেবিলে গত এক সপ্তাহের মধ্যে একদিনও যোগ দেননি চৌধুরী। আজও তিনি অনুপস্থিত। ডাক্তার মিত্র চা পান করতে করতে বলেন, আমি কাল কলকাতা নামছি স্বাহা। দিন সাতেক দেরী হবে ফিরতে।

স্বাহার মুখে হঠাৎ ঘনিয়ে ওঠে একটা আতঙ্কের আভাস। সামলে নিয়ে বলে, দেরী কর না যেন।

চা পর্বের শেষে স্বাহা উঠে গেল উপরে। একটা আড়ামোড়া ছেড়ে ডাক্তার মিত্রও উঠে পড়েন। কৃশানু বলে, একটা কথা ডাক্তারবাবু। আপনি কি জানতেন মিস্টার চৌধুরী আগেও একবার বিবাহ করেছিলেন?

ডাক্তারবাবু একটু চমকে ওঠেন যেন, সামলে নিয়ে বলেন, হ্যাঁ জানতাম। কেন বলুন তো? আপনি জানলেন কি করে?

একথাও কি আপনি জানতেন যে চৌধুরীর প্রথমা স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন?

অপরেশবাবুর দৃষ্টিটা কঠিন হয়ে ওঠে। অত্যন্ত দ্রুত কয়েকটা চিন্তা তাঁর মনে জাগল এটা বোঝা যায়। একটু দেরী হয় তাঁর জবাবটা দিতে, কিন্তু জবাব যখন দিলেন তখন কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার কোন অভাব ছিল না।

ডাক্তার মিত্র বললেন, মিস্টার রায়, সেদিন আপনি আমাকে দুখানা টিকিট

কাটতে বলেছিলেন। আমিই বাধা দিয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে ভুল করে-ছিলাম। দুখানা টিকিটই কেটে আনব আজ। আপনি বরং তৈরী হয়ে নিন।

কথা শেষ করে আবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন ডাক্তার মিত্র। রহস্যটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছে, তাই কৃশানু বলতে পারে, কিন্তু যাবার ইচ্ছেটা যে আমার একেবারে চলে গেছে ডাক্তার মিত্র।

স্বেচ্ছায় আপনি আসেননি, না হয় স্বেচ্ছায় নাই বা গেলেন।

কিন্তু আপনার তরফেই বা হঠাৎ এমন তাগিদ দেখছি কেন?

তাগিদ এজন্য যে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্য আপনাকে এখানে আনিনি আমি। এনেছিলাম আমার বোনের চিকিৎসায় সাহায্য হবে বলে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সেকাজ আপনাকে দিয়ে হবে না। আপনার চিকিৎসা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার মনের গোপন রহস্য খুঁজে বার করা আমার সাধ্যাতীত; কারণ আপনি সজ্ঞানে তার চতুর্দিকে একটা প্রাচীর খাড়া করে রেখেছেন। আপনি আমাকেই সন্দেহ করছেন, তাই কোনদিনই আমার কাছে মন খুলতে পারবেন না আপনি। অতএব আপনার এখানে থাকাটা এখন নিরর্থক।

একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল কৃশানু। প্রয়োজন হল না। দ্বিতলের সিঁড়ির মুখ থেকে স্বাহা ডেকে উঠল, দাদা!

দুজনেই মুখ তুলে তাকায়।

তুমি ফিরে আসা পর্যন্ত অন্তত উনি থাকুন। একা বাড়িতে—

বেশ, থাকুন। একটু রাগ করেই বেরিয়ে যান অপরেশবাবু।

যেন অপরাধী মনে হয় নিজেকে, তবু অস্বোয়াস্তিটা ঝেড়ে ফেলে কৃশানু বলে, আমাদের সব কথাই শুনেছেন নিশ্চয় আপনি?

স্বাহা জবাব দেয় না।

আপনিও কি বিয়ের আগে জানতেন এসব কথা?

জানতাম।

তবু কেন রাজি হয়েছিলেন এ বিয়েতে?

কারণটা না হয় আপনার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। কথাটা বলে স্বাহা আর দাঁড়ায় না। দ্রুতবেগে উঠে যায় দ্বিতলে। কৃশানু কিন্তু এ সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। সেও উঠে আসে উপরে। দরজাটা ভেজানো। বাইরে থেকে কৃশানু ডাকে, ভিতরে আসতে পারি?

একটু দেরী করে স্বাহা বলে, আসুন।

ঘরে ঢুকে একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে বসে। বলে, কথা দিয়েছিলাম, বন্ধুর প্রসঙ্গ তুলব না। আপনিই তুলেছেন প্রথমে। আপনি জানেন তার অধুনাতন খবর ?

দেওয়ালের দিকে মুখ করে স্বাহা বলে, জানি। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে বড় চাকরি করছেন, একজন বড় পুলিস অফিসারের মেয়েকে বিয়ে করেছেন—

ভুল শুনেছেন আপনি। কৃশানুর কণ্ঠে দৃঢ়তা।

ভুল শুনেছি ? চমকে ফিরে তাকায় স্বাহা।

হ্যাঁ, তাই। কৃশানু আজও অবিবাহিত, তার ধারণা আপনিও তাই। সে আজও প্রতীক্ষা করে আছে।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যায় স্বাহার চোখ দুটি। তারপর হঠাৎ পিছন ফিরে সে অশ্রুগোপনের চেষ্টা করে বুঝি। আর কোন সঙ্কোচ বোধ করে না কৃশানু। উঠে এসে দাঁড়ায় ওর খাটের পাশে, বলে, ভেঙে পড়লে তো চলবে না স্বাহা দেবী। আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করুন। আমি কৃশানুকে আসতে লিখে দিই।

না, না, না—এখন আর কোন উপায় নেই।

বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে কৃশানুর। মনে মনে তীব্র একটা ঈর্ষা বোধ করে। ঈর্ষা হয় কৃশানু রায় নামে একটি ছেলেকে। ও যদি এই মুহূর্তে সুব্রত দাশ না হয়ে কৃশানু রায় হত, তাহলে ঐ কান্নায় ভেঙে-পড়া মেয়েটিকে বুকে তুলে নিয়ে আশ্রয় দিতে পারত। ওর অশ্রুসজল চোখ দুটির উত্তাপ মুছে নিতে পারত অধরোষ্ঠের নিষ্পেষণে।

আমাকে একটু একা থাকতে দেবেন ?

উপায় নেই। আজ এই মুহূর্তে সে আর কৃশানু রায় হতে পারে না। সে যা, তা সে আর নয়। জন্মগত অধিকারকে সে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছে। নিজের দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে নেমে আসা ছাড়া ওর আর পথ কি ?

ঘটনা ঘটল পরের দিন রাত্রে। অপরেশবাবু সকালেই চলে গেছেন কলকাতায়। চৌধুরী এসেছেন অনেক দিন পর। কৃশানুর সঙ্গে বাক্যালাপ হয়নি। সোজা উপরে উঠে গেছেন। কৃশানুর অনুসন্ধিৎসু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছিল নেপথ্যে একটা কিছু ঘনিয়ে উঠছে। সন্ধ্যা থেকেই কি যেন

একটা বোঝাপড়া হচ্ছে দ্বিতলে দুটি একান্তবাসী নরনারীর মধ্যে। ওদের স্বামী-স্ত্রীর বোঝাপড়ার ভিতর কৃশানুর কোন স্থান নেই,—কিন্তু উৎকর্ণ না হলেও উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করে সে এর ফলাফলের। রাত বাড়ল। ওঁরা ডিনার খেতে নামলেন না কেউ। একাই আহার সমাধা করতে হল কৃশানুকে বাহাদুরের অনুরোধে। আহারান্তে নিজের ঘরে এসে বসে থাকে চুপ করে। ঘুম আসে না। প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে। উপর মহল থেকে ভেসে আসছে একটা চাপা উত্তেজনা। কথা কাটাকাটির একটা আভাস। মাঝে মাঝে উষ্ণ বাক্যবিনিময় যখন উঠছে ক্লাইম্যাক্সের শিখরে তখন এক-আধটা ছুটকো শব্দ ভেসে এসে উতলা করে তুলছে ওকে। আবার নিথর হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব-চরাচর পরমুহূর্তেই। রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ নেমে এলেন চৌধুরী। এবার আর পিছনের দরজা দিয়ে নয়—সামনের সিঁড়ি দিয়েই। সদর খুলে বেরিয়ে গেলেন সদর্পে। ঠিক পরমুহূর্তেই ছুটে নেমে এল স্বাহা। দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকল পিছন থেকে, শোন, শুনে যাও একটা কথা।

ফিরলেন না চৌধুরী। টর্চের গোল আলোর রেখাটা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেল পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে কার্ট রোডের দিকে। কি করবে বুঝতে পারে না কৃশানু। ঠিক সেই সময়েই সদর দরজার কাছে ভারী কিছু একটা পড়ে যাবার শব্দ হল। নিজের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল কৃশানু। খোলা দরজার উপরেই বসে পড়েছে স্বাহা—শুয়েই পড়েছে বলা উচিত। স্খলিত আঁচলটা লুটাচ্ছে মেঝেতে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভ্রূক্ষেপ নেই তার। পড়ে আছে সম্মোহিত স্থাণুর মত। হিষ্টিরিয়া আছে নাকি ওর?

কাছে গিয়ে স্পর্শ করাতেও সম্বিৎ ফিরে আসে না স্বাহার। দাঁতে দাঁত লেগে আছে। হ্যাঁ, ফিটই হয়েছে তাহলে। আর ইতস্তত করার মানে হয় না। পাঁজা-কোলা করে তুলে এনে ওকে শুইয়ে দেয় একটা সোফায়। চোখ দুটি নিমীলিত, চোয়াল দৃঢ়নিবদ্ধ, হাত মুষ্টিবদ্ধ। মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া উচিত বোধ হয় এখন। হিষ্টিরিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসায় বুকের বোতামগুলো খুলে দেওয়ার নির্দেশ আছে না? কিন্তু কিছুই করতে পারে না কৃশানু। দু হাতে তুলে ওকে সোফার উপর শুইয়ে দেওয়াতেই বুঝি সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। ক্ষণিকের জন্য কৃশানুর জীবনে

ফিরে এসেছে মাঝগঙ্গায় হারিয়ে যাওয়া একটা মুহূর্ত। রোগের আক্রমণের পরিচিত অনুভূতি নয়, তবু কেমন যেন একটা সিরসিরানি বোধ করে স্নায়ুতন্ত্রে। বাহাদুরকে এখন ওর ডাকা উচিত—তার স্ত্রী এসে আলগা করে দিতে পারে ওর অন্তরবাস, ঢিলে করে দিতে পারে নীবীবন্ধ। সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল হওয়া দরকার। কিন্তু অবশ কৃশানু কিছুই করে উঠতে পারে না।

হঠাৎ নজরে পড়ে, স্বাহার দৃঢ়মুষ্টিতে কি যেন একটা ধরা আছে। জোর করে মুঠি খুলে নিতেই বেরিয়ে পড়ে একটা ছোট্ট হোমিওপ্যাথিক শিশি আর এক টুকরো কাগজ। ভাঁজ খুলে লেখাটা পড়তেই একটা হিমপ্রবাহ খেলে যায় ওর সর্বাঙ্গে। লেখা আছে আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়—স্বাহা।

শিশিতে কি ছিল তাহলে ?

পাপপুণ্য ভালোমন্দ বিবেচনা করবার সময় নেই। কাগজটা ছুঁড়ে সে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে। গালের উপর গাল রেখে অনুভব করতে চায় ওর উত্তাপ। না, শরীর তো এখনও গরম। বুকের উপর কানটা চেপে ধরে অনুভব করতে পারে দ্রুতস্পন্দিত জীবনছন্দের পরিচয়।

থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে স্বাহা।

. ঠিক তখনই দ্বারের কাছ থেকে অদ্ভুত ব্যঙ্গভরা গলায় চৌধুরী বলে ওঠে, চমৎকার !

কখন ফিরে এসেছে সে ? কিন্তু সে কথা ভাববার মত মনের অবস্থা নেই কৃশানুর ; বলে, এর মানে কি ?

কিন্তু কিসের মানে ? না সেই কাগজের টুকরা, না ছোট শিশিটা। সে দুটি আগেই হস্তগত করেছে চৌধুরী। সে হেসে বলে, সেটাই তো আমার প্রশ্ন দাশ সাহেব, এর মানে কি ?

স্বাহা উঠে বসেছিল, চৌধুরীকে বলে, চলে যাও তুমি।

ন্যাচারালী ! হাসে চৌধুরী, কিন্তু তাহলে একমাত্র কৃশানু রায়ই নয়, সুব্রত দাশও তোমার ফ্রেণ্ড !

নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার। দাঁতে দাঁত চেপে বলে স্বাহা।

কৃশানু স্বাহাকেই প্রশ্ন করে, তুমি ওটা একটুও খাওনি তো ?

কোনটা ?

যেটা খাবে বলে স্বীকারোক্তি লিখেছিলে এইমাত্র।

স্বাহা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। জামাকাপড় সামলে নিয়ে বলে, কী যা-তা বলছেন ?

এবার সামলে নিতে হয় কৃশানুকেই, বলে, মানে ? আপনিও অস্বীকার করতে চান ? আপনার হাতে একটা শিশি ছিল না ? আর চিঠি ?

স্বাহা তখনও তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টে চৌধুরীর দিকে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলে, কেলেঙ্কারী অনেক দূর হয়েছে। এবার শুতে যান। আমার হাতে কিছুই ছিল না। যেন সম্মোহিত মানুষ স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে।

চৌধুরী আবার হেসে বলে, কিন্তু আমার হাতে যে একটা টর্চ ছিল স্বাহা দেবী। আমি তো অন্ধ নই।

স্বাহা উপরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে ছিল। এ কথায় হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। যেন ছুটে গেছে ওর স্বপ্নের ঘোর। দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে, যাও। আমার সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

এবার স্বাহার দৃষ্টিতে চৌধুরী কি দেখল সেই জানে। লগুড়াহত কুকুরের মতই সসঙ্কোচে সরে পড়ল সে।

যান শুতে যান। কৃশানুকে প্রায় আদেশের ভঙ্গিতে বলে উপরে উঠে গেল স্বাহা।

কিন্তু কৃশানুর রক্তে তখন জেগেছে তুফান। দুঃসাহসী রাঘবন আর ইন্দ্রজিতের সহযাত্রী হিসাবে দুর্যোগের রাত্রে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষবার স্পর্ধা নিয়ে একদিন রাত্রে যাত্রা করেছিল যে কৃশানুর রায়—সে তাহলে মরে যায়নি দুর্ঘটনায়। কিসের জন্য এ জীবন, কিসের পরোয়া ? এইভাবে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকতে হবে ? আর তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঐ নরকের কীটটা তিল তিল করে বিষপ্রয়োগে হত্যা করবে তার জীবনের প্রথম প্রেমকে !

ঘরে এসে সুটকেশটা খোলে। তুলে নেয় ছোট্ট কালো যন্ত্রটা। দুর্ঘটনার পর আর হাতে তোলেনি এটাকে। প্রয়োজনও হয় নি। এটা ওর ব্যক্তিগত সম্পত্তি—জমা দিতে হয়নি মালখানায়। না, কাঁপলে চলবে না হাত। টর্চটা তুলে নেয়, ওভারকোটটাও। নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে গেট খুলে। যাওয়ার সময় গাড়িটা মেরামত করতে দিয়ে গিয়েছিলেন ডাঃ মিত্র—কথাটা জানা ছিল। তাই কৃশানু জানত হেঁটেই ফিরতে হবে আজ চৌধুরীকে, যদি না পথচলতি ট্যাক্সি পেয়ে যায়।

ফলো করার কায়দাটা ভুলে যায়নি তালে। সামনের পঞ্চাশ গজ দূরের আলোকবর্তিকাটার সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রেখে বিনা আলোয় সেও নেমে এল কাট রোডে। বড় রাস্তায় উজ্জ্বল বিজলি বাতি—দূরত্বটা বাড়াতে হল তাই। আচমকা দুই একটা রাত্রিচর গাড়ির গা ঘেঁষে ছোটা। নৈশ প্রহরীর খট্ খট্ বুটের শব্দ। স্থির সুস্থ মস্তিষ্কে ও অনুসরণ করে চৌধুরীকে। না, ম্যালের দিকে নয়, ক্যালকাটা রোড ধরে চৌধুরী চলল ঘুমের দিকে। কনকনে শীত। কুয়াশায় দেখা যায় না বেশী দূর। প্রায় পঁচিশ মিনিটের পথচলা শেষ হল একটা ছোট বাংলো বাড়ির সামনে। কড়া নাড়বার প্রয়োজন হল না; ভিতরে আলো জ্বলছিলই। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কে যেন খুলে দিল দরজা। একটি মেয়ে। মহিলাই বলা উচিত। যেন প্রতীক্ষাতেই ছিল সে। ঘন কুয়াশা ভেদ করে স্পষ্ট দেখা যায় না মেয়েটিকে এত দূব থেকে। আগন্তুক প্রবেশ করতেই রুদ্ধ হয়ে গেল দরজা। কৃশানু ঘড়িতে দেখল রাত তখন বারোটা দশ।

পরের সমস্তটা দিন কাটল নিশ্ছিদ্র নিঃসঙ্গতায়। চৌধুরী আসেনি সারাদিন। অপবেশবাবুও কলকাতায়। স্বাহা নীচে নামল না একটি বারের জন্যও। বাহাদুব মারফত খবর পাওয়া গেল মাইজির তবিয়ত নাকি খারাপ। নিজের ঘরে বসে সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে পাকিয়ে পাকিয়ে মন্থরগতিতে মিলিয়ে গেল মুহূর্তগুলো। পরিস্থিতিটা মনে মনে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে থাকে কৃশানু। অপবেশবাবু কোন্ পক্ষে তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। অত্যন্ত বুদ্ধিমান তিনি। মাইলোমিটারেব কাঁটাটা গ্যারেজের ভিতরেই রাতারাতি বেড়ে যেতে দেখেই যে সে ধরে ফেলেছিল তাঁকে, এই সূক্ষ্মসূত্রটা অনুভব করবার মত তীক্ষ্ম বুদ্ধি তার আছে। অথচ তিনি খবর নিয়ে দেখেননি সত্যই কোন হোটেলে উঠেছে কি না চৌধুরী? এতটা অনবধানতা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়? তাছাড়া চৌধুরীর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু-ইতিহাস জানতে চাওয়ায় তিনি ওভাবে ক্ষেপে গেলেন কেন? সুতরাং ডাক্তার অপরেশ মিত্র এখনও রহস্যের ভিতরেই রয়ে গেছেন। কিন্তু চৌধুরী আজ পড়া শেষ ডিটেকটিভ নাটকের মতই মুক্ত-রহস্য। তার কথা জানতে আর বাকি নেই কিছু। এখন কৃশানুর একমাত্র কর্তব্য স্বাহার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ানো। তাকে ভরসা দেওয়া, আশ্বাস দেওয়া, তাকে বুঝতে দেওয়া যে মৃত্যু ছাড়াও

তার উদ্ধারের পথ আছে। কিন্তু সে আশ্বাসবাণী সুব্রত দাশ আনতে পারে না। সে আশ্বাসবাণীর একমাত্র বাহক হতে পারে কৃশানু রায় যাকে স্বাহা একদিন ভালবেসেছিল হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই আজও বাসে। তাই আত্মপরিচয় দেবার শুভলগ্ন উপস্থিত বলেই মনে হল তার। অনেক ভেবে সে স্থির করে একখানা চিঠিতে সব কথা লিখে সে পাঠাবে দ্বিতলে বাহাদুরের হাতে। দেখবে কি প্রতিক্রিয়া হয় তাতে। কাগজ কলম নিয়ে বসতে যাবে, হঠাৎ বাহাদুরই ওর হাতে এনে দিল একখানা বন্ধ খাম। স্বাহার চিঠিই। খামটা খুলতে গিয়ে এত দুঃখেও হাসি এল কৃশানুর—এবার খামের উপরে রামনন্দন কাহার নয়, কৃশানু রায়ও নয়—লেখা আছে সুব্রত দাশের নাম।

ছোট্ট চিঠি। কোন সম্বোধন নেই তাতে। স্বাহা লিখছে, 'তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। তুমি লিখলাম বলে কিছু মনে করলে না তো? আমি জানি তুমি শ্রদ্ধার দূরত্ব রাখতে চাও না, আমিও না। যে কথা তোমাকে বলতে চাই অমন শ্রদ্ধাস্পদ দূরের লোককে তা বলা যায় না। আজ রাত্রে চৌধুরী আবার আসবে আমি নিশ্চিত জানি, আমার মন বলছে। হয়তো কাল তোমাকে এ কথা বলার সুযোগ পাব না। তাই আজই সব কথা বলে ফেলতে চাই। এ কথা কাউকে কখনও বল না, দাদাকেও নয়। স্বাহা।'

আশ্চর্য মানুষের মন। চিঠিখানা পেয়ে কোথায় খুশী হয়ে উঠবে, তা নয়, কোথায় যেন খচখচ করে ব্যথা বোধ হতে থাকে। এ পাগলামির কোন মানে হয়? বসে বসে ভাবে কৃশানু।

তুমি একটা মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছ। অবস্থাগতিকে সে কথা তুমি স্বীকার করতে পারছ না। যাকে মিষ্টি নামে কানে কানে ডাকতে চাও তার সঙ্গে দূরে বসে আপনি-আজ্ঞে করতে হচ্ছে। এমন যখন অবস্থা তখন সেই মেয়েটিই তোমাকে লুকিয়ে চিঠি লিখল। জানলাম সেও তোমাকে নাম ধরে ডাকার নৈকট্যে আসতে চায়। তখন তুমি কি করবে? খুশীয়াল আনন্দে অধীর হয়ে আকাশে ডানা মেলবে, না নিঃশেষিতপ্রায় স্টাম্প থেকে জ্বালিয়ে নেবে আবার একটা সিগারেট গুমরে-মরা মনের মত ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে?

ও কি সত্যই আজ দুঃখ বোধ করছে কোন এক হারিয়ে যাওয়া কৃশানু রায়ের জন্যে? ও? সুব্রত দাশ? কৃশানু রায়ের কাছে ছাড়া অন্য কারও

কাছে স্বাহা মনের বোঝা নামিয়ে ফেলতে উদ্যত দেখেই কি ওর এই গুমরানি?
কিন্তু এ কি ছেলেমানুষী! এত রোমান্টিক মধ্যযুগীয় মন কেন ওর? না হয় নেপথ্যেই থাক না কৃশানু রায়, সুব্রত দাশই আজ নতুন করে জয় করুক না স্বাহা দেবীকে—তাতে ওর কি ক্ষতি। ছায়া হয়ে মিলিয়ে যাওয়া কৃশানু রায়কে স্বাহা যদি ভুলে গিয়ে নতুন করে বাঁচতে চায় ওর হাত ধরে, সুব্রত দাশের হাত ধরে—তা হলে তার ক্ষুব্ধ হবার কি আছে?

নিজের মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে শেষে। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে। ঘর খোলাই ছিল। স্বাহা নিশ্চুপ বসে আছে একটা ইজিচেয়ারে। ও গিয়ে চুপিসাড়েই বসে পড়ে খাটের এককোণে।

খুব অবাক হয়ে গিয়েছ নয়?

মোটেই নয়। আলতো হাসে কৃশানু।

তোমার বন্ধুর কথা সেদিন বলতে চেয়েছিলে—কোথায় আছেন তিনি?

এবার সত্যি কথাটা মুখে এল, কিন্তু সামলে নেয় নিজেকে। হয়তো যে কথা বলার জন্য স্বাহা তাকে ডেকেছে তা আজ শুধু সুব্রত দাশকেই বলা যায়, কে জানে। কথাটা জানার আগে তাই আত্মপরিচয় দেওয়াটা হয়তো সঙ্গত হবে না, তাই বলে, তার কথা থাক। তোমার কথা বল। সময় হয়তো অল্প।

স্বাহা একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে, বলব বলেই তো ডেকে পাঠিয়েছি। কিন্তু এখানে কেমন যেন নিরাপদ মনে হচ্ছে না। ও এখনই এসে পড়তে পারে।

তাহলে?

দরজাটা বরং বন্ধ করে দাও।

কৃশানু উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসে। খিলটা লাগাতে লাগাতে অনেকদিন আগেকার একটা দিনের কথা মনে পড়ে ওর। আইভির কথা। রুদ্ধদ্বার কক্ষে একটি নারীর সান্নিধ্য হঠাৎ মনে পড়িয়ে দেয় সেই অদ্ভুত মেয়েটির কথা।

ফিরে এসে বসে আবার নিজের জায়গায়।

কৃশানু রায়ের কথাটা তুমি এড়িয়ে গেলে কেন?

এড়িয়ে যাইনি তো।

গেলে বইকি। সেদিন আমিই তার কথা আলোচনা করতে চাইনি,

আজ তুমিই প্রসঙ্গটা চাপা দিলে। আমি জানি, কেন আজ আর তার কথা আলোচনা করতে চাও না তুমি।

কেন ?

আজ তুমি কৃশানুকে ঈর্ষা কর।

ঈর্ষা ? হঠাৎ ঈর্ষা করতে যাব কেন ?

কারণটা তো তুমিই জান। নাই বা বলালে আমাকে দিয়ে। কিন্তু ধারণাটা তোমার ভুল, একদিন হয়তো তোমার সেই বন্ধুকে ঘিরে আমার মনে নানান স্বপ্ন বাসা বাঁধত। আজ আর বাঁধে না। ভুলেও মনে পড়ে না তার কথা।

চুপ করে থাকে কৃশানু। এ কথায় সে খুশী হবে, না দুঃখিত হবে ? মানুষ তার অতীত সত্তাকে বেশী ভালবাসে, না বর্তমানের ছদ্মবেশকে ? এই কদিন আগে স্বাহা যখন উদ্গত কান্নাকে রোধ করে চাপা আর্তনাদে বলে উঠেছিল, না না না, এখন আর উপায় নেই। তখন সে সত্যিই ঈর্ষা বোধ করেছিল কৃশানু রায়কে—সে সুব্রত দাশ। মনে হয়েছিল সে যদি জন্মসত্তাকে অস্বীকার না করত তাহলে ওই দুর্লভ মুহূর্তটিকে সার্থকতা দান করতে পারত সে। কিন্তু আজ সে ঈর্ষার বিন্দুমাত্রও নেই। আজ দিনান্তে একবারও কৃশানু রায়ের কথা ওর মনে পড়ে না শুনে উল্লসিত হয়ে উঠতে পারা গেল না। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার কদর্থ হতে পারে জেনেও সে বলে, কি বলবে বলে ডেকেছিলে আমাকে ?

জবাব না দিয়ে স্বাহা ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দাঁড়ায় জানলার কাছে। পিছন ফিরে। এক মিনিট, দু মিনিট। চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকে। যেন সে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করছে। অনেক—অনেকদিন পরে এই নীরব মুহূর্তটিতে আবার একটা অতি পরিচিত অনুভূতি কৃশানুর স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে অবশ করে তোলে। পায়ের পাতা থেকে একটা সিরসিরানি মেরুদণ্ড বেয়ে দ্রুত উঠে আসছে মস্তিষ্কের দিকে। মুখটা শুকিয়ে আসছে, জিবটা আঠা আঠা। চোখ ফেটে জল আসে কৃশানুর। ওই মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে পিছন-ফেরা মেয়েটির অঙ্গাবরণ। কিন্তু না, কিছুতেই এ দুর্ঘটনাকে ঘটতে দেওয়া চলবে না। এর অব্যর্থ ঔষধ জানা আছে। দাঁড়িয়ে ওঠে কৃশানু। আর পরমুহূর্তেই সম্বিৎ ফিরে বসে পড়ে; পায়ের আহত বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরে। স্বাহা জানতেও পারে না। সে কি কাঁদছে ?

অনেক পরে ও পাশ ফিরেই বলে, মাপ কর তুমি। আমি বলতে পারব না।

আহত আঙুলটাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে কৃশানু। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ওর ঠাণ্ডা রক্তহীন হাতটা তুলে নেয় আলতোভাবে। বলে, বলতে তোমাকে হবেই স্বাহা। না শুনে তো আমি যাব না। সব কথা বলতে হবে আমাকে।

থরথর করে কেঁপে ওঠে স্বাহার ঠোঁট দুটো। বলে, আমার মাথাটা ঘুরছে, মনে হচ্ছে ফিট হবে আমার।

মনকে শক্ত কর তুমি।

না, এখানে পারব না। চল, বাইরে যাই। বেড়াতে বেড়াতে নির্জনে কোথাও গিয়ে বসব। সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসবে, অন্ধকারে যখন আর দুজনকে দেখতে পাওয়া যাবে না, তখন বলতে পারব হয়তো সব কথা। যাবে?

বেশ, চল।

তুমি তাহলে বস, আমি কাপডটা পালটে আসি।

কাপড-জামা নিয়ে পাশের বাথরুমে ঢুকে যায় স্বাহা। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কৃশানু। সত্যিই কাপড বদলাতে গেল তো ও? না কি এই ছুতোয় কেঁদে মনটা হালকা করে নিতে চায়? আজ বাবে বারে ঘুরে ফিরে আইভির কথাটাই মনে পডছে। এই শহরেই আর একটি ঘরে একদিন ওকে এমনি ভাবেই অপেক্ষা করতে হয়েছিল—পাশেব বাথরুমে স্নান করতে গিয়েছিল আইভি। মনে পড়ে, সে সময়ে ওর মনে হয়েছিল হয়তো মানসিক রোগটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। তাই মনে মনে পার্টিশান দেওয়ালটাব উপর ইরেজার ঘষবার দুঃসাহস হয়েছিল সেদিন। সে দুঃসাহসের কণামাত্র আজ আব অবশিষ্ট নেই। সে জানে বোগটা মনেব কোন গোপন গহ্বরে লুকিয়ে আছে মাত্র, মরেনি।

ডাক্তাব মিত্র বলেছিলেন, অবচেতন মনে বাসা-বাঁধা কোন নিরুদ্ধ কামনাই এ রকম রোগেব উৎপত্তিস্থল। এমন উৎঘুটে ইচ্ছা কেন বাসা বেঁধেছে তার অবচেতন মনে? বেঁধেছে কোন্ সূত্রে? জীবনে অনেক বার এসব কথা ভেবেছে. আজও অপেক্ষা করার অবসরে মনে মনে উজান বেয়ে চলে যায় স্মৃতির প্রান্তরাজ্য পর্যন্ত। শৈশবকাল পর্যন্ত। কই, এমন কোন ঘটনার কথা তো মনে পড়ে না—যার সূত্র ধরে এই মানসিক রোগের বীজাণু এসে আশ্রয়

নিল ওর মনের মাঝখানে। যক্ষ্মার বীজাণুও চোখে দেখা যায় না, তবু রঞ্জন-রশ্মিতে তাকে ধরা যায়, কিন্তু ওর অবচেতন মনের এই গোপন রোগকে ধরার মত যন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয়নি। ডাক্তার মিত্রের সেই মনঃসমীক্ষণের চিকিৎসা? সেটা নেহাৎ বুজরুকি।

হঠাৎ বাথরুমে একটা শব্দ হল। পড়ে গেল নাকি স্বাহা? হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ নয় তো? বাথরুমের কাছে এসে বার দুই তিন ডাকল নাম ধরে। কোন সাড়া নেই। কলটা খোলা আছে, জল পড়ে যাচ্ছে একটানা। বাথ-রুমের দরজায় করাঘাত করতেই খুলে গেল দরজাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে আপাদমস্তক একটা ইলেকট্রিক স্পার্ক দিল যেন।

স্বাহা মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে বাথরুমের মেঝেতে। চোখ দুটি বন্ধ, মুষ্টিবদ্ধ হাত। কিন্তু এ কী! একটু আগে পায়ের বুড়ো আঙুলটা দুমড়ে অসহ্য যন্ত্রণা স্বীকার করেও যে কাল্পনিক চিত্রটার উপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল ওর ভদ্রমন—সেই বাস্তব চিত্রটার সম্মুখে সামান্য আয়াসেও তো সে বন্ধ করতে পারল না চোখ দুটো। মাটি নয়, ব্রোঞ্জ নয়, মার্বেলে গড়া নয় এ মূর্তি! সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে যেমন বিস্ফারিত বিহ্বল নেত্রে তাকিয়ে দেখেছিল আদিমতম মানব বালার্ক সূর্যের প্রথম অরুণোদয়—তেমনি অপার বিস্ময়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল কৃশানু,—দেখল অনুদ্‌ঘাটিতপূর্ব এক অপূর্ব বিস্ময়কে।

তারপর হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। জোর করে শান্ত করে দ্রুতস্পন্দিত হৃদপিণ্ডটাকে। এখনই প্রতিকার না করলে ঠাণ্ডার এক্সপোজার লাগতে পারে। গতকাল যেমন অনায়াসে দু হাতে তুলে নিয়েছিল ওকে আজও তেমনি পাঁজাকোলা করে তুলে নিল স্বাহাকে। আলতো করে শুইয়ে দিল খাটে। কিন্তু কী যেন হল কৃশানুর—তখনই ছেড়ে দিতে পারল না। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তখন ওর শুরু হয়েছে আগুনের হোরিখেলা। একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ তখনও বইছে স্নায়ুতন্ত্রের বিজলি তারে।

পৃথিবী যেন নেই—ক্ষয় হয়ে গেছে সূর্য—স্থান-কাল-পাত্রের সব কিছু অনুভূতি যেন ঝাপসা হয়ে, বিন্দু হয়ে, ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেল নিঃশেষে। নত হয়ে আসে কৃশানুর মুখ—যুগযুগান্তরের আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে।

সময়ের মাপকাঠি কি? মিনিট না মিলেনিয়াম? কতগুলো সময়ের সেই য়ুনিটকাল ধরে একটি নরম বুকের দ্রুতস্পন্দন তেহাইয়ের বোল তুলেছিল কৃশানুর বুকের মৃদঙ্গে? সমে ফিরে আসতে কি যুগযুগান্তর পার হয়ে যায়নি?

এক মিনিট? দু মিনিট? ঝিনুক দিয়ে কি সমুদ্র মাপা যায়, না মিনিট দিয়ে কল্লান্ত?

কিন্তু না, মূর্ছাহত এই মেয়েটিকে এ ভাবে জড়িয়ে পড়ে থাকা যায় না। বাস্তবে ফিরে আসে কৃশানু, সম্বিৎ ফিরে পায়। মুক্ত করে নেয় নিজেকে। কম্বলটা টেনে দেয় ওর গায়ে। কী করবে এখন? মুখে চোখে জল দেবে? ডাকবে বাহাদুরের বউকে?

হঠাৎ বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে আর্তকণ্ঠে স্বাহা বলে ওঠে, ওগো, এবার রেহাই দাও আমাকে—যাও তুমি।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে প্রায় লাফিয়ে ওঠে কৃশানু, বলে, তার মানে! তুমি···তুমি অজ্ঞান হওনি?

বালিশটাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে স্বাহা, প্লিজ কৃশানু, নীচে যাও তুমি। একটুও দয়া নেই তোমার?

প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সশব্দে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে পড়ে ওর সংযমের প্রাসাদ। কৃশানু রায় ও নয়, সুব্রত দাশও নয়—ও আদিমতম মানুষ। অজ্ঞান স্বাহা হয়নি, একটি খণ্ড অনুপলের জন্যও চেতনা হারায়নি তাহলে। স্বাহা তাকে চিনতে পেরেছে—কখন, কেমন করে এসব কথা তার মনে এল না। ভালো মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সব চেতনা মিলিয়ে যায় একটি মুহূর্তের জন্যে। পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়ার উপর থেকে উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যেন!

চোখ বুজে আছে স্বাহা—ভয়ে নয়, উত্তেজনায়, উচ্ছ্বাসের উদ্দামতায়। কৃশানু নিবিড় হয়ে হারিয়ে যেতে চায়, ফুরিয়ে যেতে চায় যেন। ওর ভদ্র শিক্ষিত মনের ভিতরে কোথায় ছিল একটা গোপন গহ্বর—সেখান থেকে হঠাৎ বের হয়ে এল আদিম হিংস্র একটা প্রাগৈতিহাসিক জীব। তাকে সে চেনে না। তাব অস্তিত্বটাও জানা ছিল না এতদিন, কিন্তু কই, স্বাহাও তো ভয় পেল না সেই আদিম বর্বরটাকে!

শিথিলপ্রায় স্বাহার গায়ের উপর কম্বলটা আবার টেনে দিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে নীচে নেমে এল কৃশানু নিজের ঘরে। ওর মনের মধ্যে ধীরে ধীরে থেমে আসছে ঝড়ের তাণ্ডব। কালবৈশাখী ঝড় থেমে গেছে—প্রবল বর্ষণের পর স্তব্ধ গাম্ভীর্যে থমকে আছে আকাশ। এখানে ওখানে জমে আছে ঝড়ে ঝরে পড়া গাছের পাতা আর বৃষ্টির চিকচিকে জল; তাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে মেঘ সরে-যাওয়া আকাশের দু একটা উঁকিমারা তারার।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ক্রমে। আর বেড়াতে বের হয়নি ওরা—এখন সেটা সম্ভবও নয়। কিন্তু কেমন করে ওকে চিনল স্বাহা? কখনই বা চিনল প্রথম? ওকে উপরেই বা ডেকে নিয়ে গিয়েছিল কি উদ্দেশ্যে? যে কৃশানুর কথা দিনান্তে একবারও মনে পড়ে না স্বাহার তার এ আচরণের উদ্দেশ্য কি? কখন, কেন, কি জন্যে? প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো রিবেটের মাথায় ইলেকট্রিক হাতুড়ির মত বারে বারে আঘাত করতে থাকে ওর মস্তিষ্কে। কিন্তু কিছুতেই সাহস সঞ্চয় করে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারে না। মুখচোরা লাজুক যে কৃশানুকে ও হারিয়ে ফেলেছিল বছর কয়েক আগে জীবনের পথের বাঁকে, সেই যেন এসে অধিকার করেছে ওর মনকে। সেযুগে ট্রামের লেডিস সীটের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস ছিল না ওর, আজও সাহস হল না দ্বিতলে উঠে গিয়ে প্রশ্নবোধক একঝুড়ি চিহ্ন নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে ওর দিকে তাকাতে।

বাহাদুর এসে দিয়ে যায় এক কাপ চা আর একখানা চিঠি। এবার খামের উপর কারও নাম লেখা নেই। তাড়াতাড়ি খামটা খুলে পড়তে থাকে কৃশানু। 'আমাকে উদ্ধার করতে তুমি আসনি, আমি জানি। এসেছিলে আমার দাদার কাছে তোমার রোগমুক্তির সন্ধানে। তোমার বিশল্যকরণী দাদার কাছে ছিল না, ছিল আমার কাছে। ওষুধ তো পেলে, এবার বিদায় হও তুমি, ধূপছায়া রঙের শাড়ি-পরা, পায়ে-আলতা, কপালে-টিপ সেই মেয়েটির ধ্যান করগে। মানসী যখন অটুট আছে, তখন মানবীর এ মর্মন্তুদ মৃত্যুতে কাতর হওয়া তোমার মত আর্টিস্টের তো শোভা পায় না!

অবাক হয়েছ কি? হওয়া উচিত নয় তোমার মতো ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের বিজ্ঞ অফিসারের। অবশ্য বোকামিটা যখন করেছিলে তখনও গোয়েন্দা হওনি তুমি। হ্যারিসন রোডের মেসেই তুমি নির্ভুল পরিচয় দিয়েছিলে নিজের। নিজে চোখে সমস্ত দেখে, সমস্ত বুঝেও নীরবে ফিরে এসেছিলাম আমি অপমানের পসরা মাথায় নিয়ে। আশা করি তুমিও আজ নিজে চোখে আমার পরিণাম দেখে, সমস্ত বুঝেও অমনি নীরবে নিঃশব্দে ফিরে যাবে।

কি করে চিনেছিলাম? তোমার খালিগায়ে উপবীতটা স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল। সুব্রত দাশের বদলে কোন ব্রাহ্মণের ছদ্মনাম নেওয়া উচিত ছিল তোমার। দ্বিতীয়তঃ তোমার রোগের আক্রমণ দেখলাম। তৃতীয়তঃ তোমাকে শুইয়ে দিয়ে মাথার নীচে বালিশটা ঠিক করতে গিয়ে দেখলাম

আমার খোলা চিঠিটা। সেটা তুমি খুলে পড়েছিলে। পড়েও আমাকে স্বীকার করনি। মনে আছে নিশ্চয়, সে চিঠিতে আমি একটি মাত্র সাক্ষাৎ ভিক্ষা করেছিলাম—প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তারপর তোমার আর আইভিব জীবনের মাঝখানে আমি এসে দাঁড়াব না কখনও। সব জেনে শুনেও দ্বার থেকে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে।

'কেন সব কথা শুনেও চৌধুবীকে বিয়ে কবতে বাজি হয়েছিলাম এ কথা জানতে চেয়েছিলে একদিন। যাওযাব আগে জবাবটা জেনে যাও। যা চাই, সহজে তা পাব বলে। জানতাম, কষ্ট কবে আমাকে কিছু কবতে হবে না, চৌধুবীই করবে আমার সম্পত্তিব লোভে।

'একটু দুঃখ পেলে, নয়? ও কিছু না। সেন্টিমেণ্টাল অভিনেতা যখন কোন মেলোড্রামায বোমান্টিক পার্ট করে তখন দু এক ফোঁটা চোখেব জল তাকে ফেলতেই হয়।

'তুমি একদিন রোমান্টিক ভাষায লিখেছিলে যদি এই পৃথিবীর কোন প্রান্তে দৈবাৎ দেখা হয তোমাতে আমাতে, তা হলে যেন তোমাকে আমি ভাবতে পাবি ও একজন মানুষ। মাপ কব কৃশানু, আমি প্র্যাগম্যাটিক, তোমাব ও অনুবোধটা তাই আমি রাখতে পাবব না। শিল্পী ভাবতে পাবি, ভাবুক ভাবতে পাবি, কবি ভাবাও অসম্ভব হবে না, কিন্তু কিছুতেই ভাবতে পারব না ও একজন বক্তে মাংসে গডা মানুষ।'

'আমাব শেষ অনুরোধ, সেই দুর্ভাবনার মধ্যে তুমি আমাকে ফেল না। আমার সামনে এসে দাঁড়িও না কখনও।'

চাবুকের পব চাবুকের প্রহারে জর্জবিততনু কৃশানু তখনই উঠে দাঁড়ায়। ওর শেষ অনুরোধটা প্রথমেই ভাঙতে হবে। দ্বার খুলে উঠে যায় উপরে, কিন্তু নেমে আসতে হয আবার। চৌধুরী এসেছেন ইতিমধ্যে।

বাহাদুর ডাকতে এল। গেল না। খাবে না। ক্ষুধা নেই। কেমন করে একবার সাক্ষাৎ কবা যায স্বাহার সঙ্গে জনান্তিকে? সে সুযোগ পাওয়া গেল না। নেমে এলেন একটু পরে চৌধুরী সাহেব। সিগাবেটটা নিপুণ-ভাবে ধরিযে বসলেন একখানা চেযার টেনে, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হযেই ছিল কৃশানু, বললে, বলুন।

আপনি কবে কলকাতা যাচ্ছেন?

কৃশানু হেসে বলে, জানি, আপনার অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু উপায় কি বলুন ? আমার কলকাতা যাওয়ার দেরী আছে।

একটু দৃঢ়ভাবে চৌধুরী বলেন, আর তাশ লুকোবার চেষ্টা করে লাভ নেই মিস্টার রায়। আপনাকে আমি চিনি। ডিটেকটিভ কৃশানু রায়ই একমাত্র বুদ্ধিমান লোক নন এই দুনিয়ায়। স্ক্যাণ্ডাল তো যথেষ্ট হল, এবার আপনার নীরব প্রস্থানটাই সবচেয়ে শোভন নয় কি ?

কৃশানু তৈরী হয়েই নেমেছে বাকযুদ্ধে, বলে, পরিচয় যে শুধু আপনি পেয়েছেন আমার তাও তো ঠিক নয়। আপনার পরিচয়টাও আমি সংগ্রহ করেছি কিছু কিছু। আপনার প্রথম স্ত্রীর আত্মহত্যা করার কথাটা পুলিসে ঠিক বিশ্বাস করেনি একথা জানেন নিশ্চয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর আত্মহত্যা করার সম্ভাবনার কথাও পুলিসে জানে। সে দুর্ঘটনা ঘটলে সহজে পার পাবেন না আপনি। স্বাহা দেবীর আত্মহত্যা করার কোন কারণ আপনি দেখাতে পারবেন না।

চৌধুরী হেসে বলে, আপনার সেজন্যে আশঙ্কা করার কিছু নেই। প্রমাণ সংগ্রহের দায়িত্বটা না হয় আমার উপরেই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু আমি বলছিলাম কি, আপনি এমনিতেই নিউরটিক রুগী, বেশী উত্তেজনা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালোও নয়। তাছাড়া একটা স্ক্যাণ্ডেলের মধ্যে কেন মিছিমিছি নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন। আপনি বরং কাল সকালেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।

কৃশানু গর্জে ওঠে, দেখুন—

বাধা দিয়ে চৌধুরী বলে, আস্তে। আপনি কি বলতে চাইছেন জানি। বেশ, রাজি আছি, চুপচাপ সরে পড়লে আপনাকেও বঞ্চিত করব না একেবারে।

স্তম্ভিত কৃশানুর বাক্য স্ফুরণের আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় চৌধুরী।

ঘুমের কথা চিন্তাও করা যায় না। অশান্তভাবে পায়চারি করতে থাকে ঘরময়। চৌধুরীর প্রস্থানের প্রহর গোনে। আজ রাত্রেই স্বাহার সঙ্গে খোলাখুলি সব কথা বলতে হবে।

বাহাদুর এসে জানতে চায় কাল সকালে সেও যাবে কি না। সেও যাবে কি না ! কোথায় ? বাহাদুরের কাছে খবরটা পাওয়া যায়। চৌধুরী আর স্বাহা ভোর রাত্রে উঠে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাবে। সেই আয়োজনই হচ্ছে উপরের ঘরে। বাহাদুর ওদের জন্য সকালের নাস্তা বানাচ্ছে,

তাই সে জানতে চায় কৃশানুর ব্রেকফাস্ট´ও কি টিফিনকেরিয়ারে তুলে দেবে, না বাড়িতেই খাবে সে।

টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাবে চৌধুরী? স্বাহাকে নিয়ে? এর অর্থ কি? আকস্মিক দুর্ঘটনা? অর্থাৎ আজ রাত্রে এখানেই থাকছে চৌধুরী। বোধ হয় স্বাহাকে একা রেখে যেতে আর সাহস পাচ্ছে না এখন। কিন্তু ওরা যাবে কি করে? গাড়ি তো রিপেয়ারে গেছে। বাহাদুরকে প্রশ্ন করে জানতে পারে—না গাড়ি সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসেছে। ওরা অবশ্য এ গাড়ি নিয়ে যাবে না। টাইগার হিলের খাড়া রাস্তায় ফোর-হুইল গাড়ি ছাড়া যাওয়া যাবে না। একটা জীপ কোথা থেকে এনেছে চৌধুরী। তাতেই ওরা যাবে। তা যাক। অনিমন্ত্রিত সে ওদের সঙ্গে কেমন করে যাবে? তাছাড়া অমন খাড়া রাস্তায় যাবেই বা কি করে?

সারারাত ঘুম হল না বেচারীর। জেগে বসে রইল ঠায়। অসময়ে মেঘ করেছে আজ। অবশ্য দার্জিলিঙের মেঘের চিরকালই সময়জ্ঞান নেই। টিপিটিপি বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। আকাশে একটিও তারা নেই। ঠাণ্ডাটা যেন আরও বেড়েছে আজ। প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল। কৃশানু অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল শুধু। স্বাহার ব্যবহারে ও প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়েছে। আইভিকেও চিনতে ভুল হয়েছিল প্রথমে তবু পরে তাকে চেনা গিয়েছে। ইভাই চিনিয়ে দিয়েছিল তাকে। আইভি কালাপাহাড—সে শুধু ভাঙতেই চায়, ভাঙার আনন্দেই সে বিভোর। সমাজ যে শৃঙ্খলার মূর্তিটা গড়েছে সেটা ওর কাছে মনে হয়েছে শৃঙ্খল। সেই পাষাণমূর্তির নাক ভেঙে দেওয়াতেই ওর কালাপাহাড়ী উল্লাস। কিন্তু সেখানেই আইভি-কাব্যের শেষ ট্রাজেডি নয়। রাতের অন্ধকারে সেই মেয়েই নাকি আবার কাঁদতে বসে। সরোজ অফ সেটান বইটার কথা মনে পড়ে কৃশানুর। মনে মনে আইভি যে ঘোর পিউরিটান এটাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখবার জন্যেই তার বাহ্য আবরণ ম্যান-ইন-ব্ল্যাকের মত বিপরীতধর্মী। আইভি ওকে দিতে চেয়েছিল রোগমুক্তির অমোঘ ঔষধ—নিঃস্বার্থ যদিও নয় সে দান। এই সুযোগে উচ্ছৃঙ্খলতায় আর এক ধাপ উপরে ওঠার বাসনা ছিল তার। হয়তো দূরে বসে ছবি আঁকিয়েই তৃপ্ত থাকত না সে। কোন সূত্রে সংবাদটা প্রকাশ করিয়ে দিত ওর বাপের কাছে। কিম্বা হয়তো তাও ঠিক নয়—কে জানে হয়তো পরিপূর্ণভাবেই সে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল কৃশানুর কাছে। যে

কৃশানুকে জামাতা হিসাবে অনুমোদন করবেন না ভবতারণ ঘোষাল, সে কৃশানুর হাত ধরে বিদ্রোহীর মত বাপের ঘর ছেড়ে সে নেমে আসত পথের ধুলায়। কৃশানু যদি ভবতারণ ঘোষালের ট্রাম্পকার্ডটা সেই মুহূর্তে প্রকাশ না করে দিত —যদি তাকে পূর্বেই সাবধান করে দিত ইভা তাহলে হয়তো আইভির জীবনটা এমন ভাবে ব্যর্থ হয়ে যেত না। হয়তো সেও স্বাভাবিক জীবনেই ফিরে আসতে পারত !

ইভাকেও বোঝা যায়। ইভা যদিও ক্ষণিকবাদিনী নয় তবু কৃশানুকে অঞ্জলিভরে দিতে চেয়েছিল আরোগ্য। সলজ্জ সে দান তবু নিঃস্বার্থ! শুধু কৃশানুর রোগমুক্তিই ছিল তার লক্ষ্য। কিন্তু ঠিক কি তাই? তামা-তুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে শপথ করতে পারেনি কৃশানু! যতই বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাক ইভা, যতই দাদামশায়ের নজির দেখিয়ে আতুরের প্রতি উদারতা দেখাক— কৃশানু জানে ইভার অন্তরে নিশ্চয় জেগেছিল ওদের প্রেমকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটা কামনা। নরনারীর প্রেম—নিকষিত হেম হতে পারে না। কৃশানু যদি ঈক্ষণকামেচ্ছার একটি ক্রনিক রোগী হয় তবে ইভাও অন্তত হয়েছিল একদিন বিলসনকামেচ্ছার সাময়িক শিকার। শৈশবেই দাদামশাই আর মায়ের প্রভাব পড়েছিল তার উপর। সে ব্রত উপবাস করে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, গঙ্গাবক্ষে নৌকায় ওঠার আগে মাথায় স্পর্শ করায় গঙ্গাজল। সে চিরন্তনী ভারতীয় নারী। সংস্কার তার মজ্জায় মজ্জায় জড়ানো। অথচ লরেটো-লালিত এই মেয়েটি বেড়ে উঠেছে আধুনিক উচ্চকোটি সমাজের বাতাবরণে। সে প্রভাবটাও তাই একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই মাথা পেতে মালাটা গ্রহণ করতে তার ক্ষণিক আগ্রহ। তাই রোগমুক্তির নলচের আড়ালে সে দিতে চায় প্রেমাস্পদকে পরশ-বাঁচানো এমন একটা কিছু যাতে তার আজন্ম-সংস্কারে আঘাত না দিয়েও দেবে পূর্ণতা। যা শুধু নেওয়ার মধ্যেই নয়, দেওয়ার মধ্যেও আছে আনন্দ। দুই ভিন্ন সংস্কৃতি, দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারার মধ্যে এমনিভাবেই আপোষ করতে চেয়েছিল ইভা। কিম্বা কে জানে হয়তো তাও ঠিক নয়। এইমাত্র স্বাহার আর্ত অনুরোধ 'প্লিজ, নীচে যাও তুমি' কথা কটার মাধ্যমে কৃশানু যেমন বুঝেছিল—ওটা প্রত্যাখ্যানের নয়, আমন্ত্রণেরই আকুল আহ্বান, তেমনি ইভার বারেবারে উল্লেখ করা সাবধানবাণীর মধ্যেও কি ছিল কোন গভীরতার অন্তরলোকের ইঙ্গিত? যা বলতে চেয়েছে তা কি উল্টো করে বলেছিল ইভা? ওর সেই

চিঠি "তুমি মহীয়সী!" পড়ে কি কেঁদেছিল ইভা? সে কান্নার উৎস কোথায়?

সে যাক। কিন্তু স্বাহা? সে কি চায়? সে কি চেয়েছিল? আজ সে কৃশানুকে তীব্রভাবে ঘৃণা করে। কৃশানুই তার জীবনের কুগ্রহ। কৃশানুই অপমান করেছে তার প্রেমকে, তার নারীত্বকে। ভাববিলাসী, আইডিয়ালিস্ট একটা আর্টিস্ট উপেক্ষা করেছে ওর জৈবিক ক্ষুধাকে। মানসীকে সে নাকি বড় করেছে মানবীর চেয়ে। প্র্যাগম্যাটিক লেডি ডাক্তার স্বাহা চৌধুরীর বৈজ্ঞানিক মন এ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। তাই সে আজ কৃশানুকে মানুষ ব'লে স্বীকার করে না। কিন্তু কতদিন আগে স্বাহা আবিষ্কার করেছে ওর পরিচয়? কেনই বা সে লুকিয়ে রেখেছিল এ কথা এতদিন? স্বাহা কি মনে মনে চেয়েছিল কৃশানু রায় দেখে যাক নিজের চোখে তার উপেক্ষার ফলাফল? প্রতিশোধ নেবার জন্যেই কি এই অদ্ভুত আচরণ? সে কি পীড়ন করতে চায় কৃশানুকে দৈহিক না হলেও মানসিক?

কেনই বা তাহলে ধরা দিল সে? কৃশানুর প্রতি যদি শুধু ঘৃণাই পোষণ করে এসে থাকে এতদিন, তাহলে তার বন্ধনে ধরা দিল কেন শেষ পর্যন্ত? হয়তো এ আচরণের যুক্তি অন্যরকম। যে অহেতুক সন্দেহে দীর্ঘদিন ধরে চৌধুরী ওকে পীডন করছে, সেই অপরাধটা সত্যি সত্যি অনুষ্ঠান করেই স্বাহা এভাবে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে চৌধুরীর উপর। কে জানে, হয়তো ভালবেসে সে আত্মদান করেনি মোটেই, এ শুধু স্বামীর উপর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছারই একটা তির্যক প্রকাশ।

রাত ফুরিয়ে আসে। ঘড়িতে আড়াইটা। ওরা উঠেছে। উপরে নড়া-চড়ার শব্দ হচ্ছে। নেমে আসছে ওরা।

দ্বার খুলে বেরিয়ে আসে কৃশানু মাঝের হলকামরায়। যেন ওকে ওখানে দেখবে বলে দুজনেই প্রস্তুত ছিল। স্বাহার গা ঘেঁষেই নেমে এসেছে চৌধুরী। স্বাহা চোখ তুলে তাকায় না, বলে, দাদার একটা চিঠি এসেছে সকালের ডাকে, দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

একটা বন্ধ খাম সে বাড়িয়ে দেয় কৃশানুর দিকে।

বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে সেটা কেড়ে নেয় চৌধুরী, দেখি দেখি।

একটু আরক্ত হয়ে ওঠে স্বাহার গাল দুটো। নীরব ভৎর্সনায় সে তাকিয়ে থাকে চৌধুরীর দিকে।

পোস্ট-অফিসের ছাপমারা বন্ধ খামটা টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে ফেরত দেয় চৌধুরী। আধো অন্ধকারে মুখটা ভাল করে দেখা যায় না তবু অদ্ভুত লাগে স্বাহার দৃষ্টি। যেন কি বলতে চাইছে সেই ব্যাকুল চোখের দৃষ্টি।

চৌধুরী বলে চলো।

চলতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে স্বাহা। হঠাৎ ঘুরে বলেই ফেলে, আপনিও গেলে পারতেন। টাইগার হিলে সানরাইজ একটা দুর্লভ দৃশ্য।

কৃশানু বলে, তাই তো শুনেছি; কিন্তু যেতে ডাকেননি তো আমায় আপনারা?

যাবেন আপনি? আগ্রহে কাঁপতে থাকে স্বাহার কণ্ঠস্বর, হঠাৎ স্টার্ট-নেওয়া গাড়ির গতিবেগের কাঁটাটার মত।

কৃশানু জবাব দেওয়ার আগেই তাকে ব্রেক কষে থামিয়ে দেয় চৌধুরী, ওঁকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেবে কে? এই টিলায় উঠতেই ওঁর মাথা ঘোরে, উনি উঠবেন টাইগার হিলে! না না মশাই, রেস্ট নিন আপনি।

স্বাহা হয়তো আরও কিছু বলতে চায়, তাকে সে সুযোগ না দিয়েই চৌধুরী ওর বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করে, এস তুমি, দেরী হয়ে গেলে সব মাটি।

ওরা চলে যায়।

কৃশানু ঘরে এসে বসে। আলোটা জ্বালে। চিঠিখানা খুলে পড়ে। ডাক্তার মিত্র লিখছেন কলকাতা থেকে। গত পরশুর তারিখ। ইংরাজি চিঠি। তর্জমা করলে দাঁড়ায়, আপনাকে কথা দিয়েছিলাম আপনার মনের নির্জ্জান-লোকের গোপনতম সংবাদটি আমি খুঁজে বার করবই। তা এতদিনে করেছি। খুব ভুগিয়েছেন আপনি। দোষ অবশ্য শুধু আপনারই নয়। য়ুরোপীয়ান পেন্টিংসের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ছিল অল্প। ছবির আমি ভক্ত নই। তাই ক্লুটা আমার নজর এড়িয়ে গেছে। সেটা ধরা পড়েছে এখানে এসে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে। আপনার কাছ থেকে গয়া অথবা গোয়া শব্দটা পেয়েছিলাম। সম্মোহিত অবস্থায় যখন মনের অধিশাস্তা ঘুমিয়ে পড়ে তখন অনেক সময় রোগী এমন কয়েকটা শব্দ অসতর্কভাবে উচ্চারণ করে যা তার নির্জ্জান মনের নিরুদ্ধ কামনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আপনি সম্মোহিত অবস্থায় ঐ শব্দটা আমাকে 'ক্লু' হিসাবে দিয়াছিলেন। গয়া এবং গোয়া দুটি স্থানের নাম। এইমাত্র ধারণা ছিল আমার। এনসাইক্লোপিডিয়াতে দেখলাম গঅা অথবা গইয়া

একজন নাম করা স্প্যানিস আর্টিস্ট। মাদ্রিদের গ্যালারিতে, গীর্জায়, প্রাসাদগাত্রে তাঁর অনেক চিত্র সংরক্ষিত আছে। তাই সেদিন গোয়া বন্দর থেকে পর্তুগাল স্পেন হয়ে মাদ্রিদে চলে গিয়েছিল আপনার চিন্তাধারা।

স্বাহাকে আপনি বহুদিন আগে একটি চিঠিতে আপনার বাল্যজীবনের একটা ঘটনার কথা লিখেছিলেন। আপনাদের স্কুলের একটি ছেলে গোপাল-গোবিন্দ না কি যেন নাম, একদিন একটা ছবির বই এনেছিল ক্লাসে। লুকিয়ে টিফিন পিরিয়ডে ছেলেরা ছবির বই দেখেছিল। একটা কথায় আমার খটকা লাগে। ছেলেরা টিফিন পিরিয়ডেও লুকিয়ে ছবি দেখবে কেন? নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল ছবিব বইতে যা ছুটির ঘণ্টাতেও লুকিয়ে দেখতে হয়। শুধু তাই নয়, আপনি যখন ঔৎসুক্য দেখালেন তখন সেই ছেলেটি বলেছিল—ভাল ছেলেদের এসব দেখতে নেই। সুতরাং নিষিদ্ধ কোন ছবি নিশ্চয়ই ছিল বইটাতে।

দুটো ক্লু পেলাম আমি। প্রথমত আপনার অবচেতন মনের প্রহরীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে দৈবাৎ বেরিয়ে আসা শব্দটা হচ্ছে গোয়া অথবা গইয়া। অথচ গয়া নয়, গোয়া নয়। গইয়া একজন স্প্যানিশ চিত্রকর। দ্বিতীয়ত আপনি একটি ছবির এ্যালবামে কী একটা ছবি না দেখতে পেয়ে এতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন যে আপনার বাল্যবন্ধুর সঙ্গে আর জীবনে কথা বলেননি। ইস্যু করালাম গইআব ছবির সঙ্কলন। পাতা উল্টাতেই রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। ম্যালেরিয়ার কুইনিন, টাইফয়েডে ক্লোরোমাইসিটিনের মতই অব্যর্থ এই ঔষধ। দু'একদিনের মধ্যেই ছবির এ্যালবামটা নিয়ে যাচ্ছি এবং আজীবন রোগমুক্তির গ্যারাণ্টি দিচ্ছি আপনাকে।

গইআর দুটি ছবি সেযুগে খুব আলোডন তুলেছিল। হয়তো মনে পড়েছে আপনার সব কথা এতক্ষণে। একটি ছবিব নাম পোর্ট্রেট অফ ডাচেস্ অব আলভা আর একটি ছবির নাম মাজা, দি ন্যুড। ডিউক অফ আলভার আমন্ত্রণে গইয়া ডাচেসের ছবি আঁকতে যান। অর্ধশায়িতা রাণীর অপূর্ব একটি চিত্র তিনি আঁকেন। ছবিটির খুব সুখ্যাতি হল। এর কিছুদিন পরে গইয়া একটি শ্রমিক রমণীর নগ্ন চিত্র আঁকেন। তার নাম দেন, মাজা, দি ন্যুড। আশ্চর্য, শ্রমিক রমণীটি ঠিক রাণীর ভঙ্গিতেই অর্ধশায়িতা, তার অঙ্গসৌষ্ঠব এমন কি মুখাকৃতির সঙ্গে রাণীর অদ্ভুত সাদৃশ্য। এ ঘটনায় সেযুগে স্পেনের রাজনীতিতেও নাকি অনেক আলোড়ন হয়েছিল। অনেকে সন্দেহ করে—রাণী দুটো করে সিটিং দিতেন। একটা ডিউকের জ্ঞাতসারে, একটা তাঁর

অলক্ষ্যে। দ্বিতীয় ছবিটাও নাকি রাণীর—চিত্রকর একটি কাল্পনিক প্রেমিক রমণীর নামে সেটা প্রকাশ করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাণীর চিত্রটি আপনি বন্ধুর এ্যালবামে দেখেছিলেন, গল্পটিও শুনেছিলেন, কিন্তু মাজা, দি ন্যুড আপনাকে দেখতে দেওয়া হয়নি। তাই বন্ধুবিচ্ছেদ হয়েছিল আপনাদের। আপনি ডাচেস্ অফ আলভার চিত্রটিকে বস্ত্রহীন অবস্থায় বারে বারে কল্পনা করতে চেয়েছেন তখন, কিন্তু সফলকাম হননি। মাজা, দি ন্যুড আপনার কল্পনেত্রে ভেসে ওঠেনি। হয়তো আপনার বন্ধুও ছবিটি পরে আপনাকে দেখাতে চেয়েছিল—কিন্তু আপনি সঙ্কোচে রাজি হননি। তারপর ক্রমশঃ এ চিন্তাকে অশ্লীল মনে হয়েছে, আপনার চেতন মন সেই অতৃপ্ত বাসনাকে অশোভন, অসামাজিক, অশ্লীল বলে জোর করে ঠেলে দিয়েছিল নিজ্ঞানের অন্ধকূপে। ক্রমে সবকিছুই আপনি ভুলে গেছেন; কিন্তু অবচেতন মনের নিরুদ্ধ কামনা কখনও কখনও মনের প্রহরীর চোখ এড়িয়ে আপনার চোখে আজও মোহাঞ্জন এঁকে দেয়। চোখের সামনে বাস্তব ডাচেসদের আপনি মাজা হয়ে যেতে দেখেন। খেয়াল করলে আপনার মনে পড়বে অর্ধনগ্ন অতি আধুনিক পোশাকে যেসব মেয়ে গা দেখিয়ে চটুলভাবে ঘুরে বেড়ায় তারা আপনার চিত্তবিকার ঘটাত না। আপনার বিকৃতি ঘটত তখনই যখন সারা দেহ আবৃত করে কেউ স্থির হয়ে কয়েকটা মুহূর্ত ছবির মত দাঁড়াত আপনার সামনে।

আপনার বিশল্যকরণী যে বিরাট গন্ধমাদনে আছে সেই ভল্যুমটা ইস্যু করিয়েছি। জয়রাম বলে এবার দমদম থেকে এক লাফ মারলেই আপনার শক্তিশেল সমূলে উৎপাটিত করব।

ব্যস্ আর কিছু নয়। স্বাহার সম্বন্ধে একটি কথা নয়, চৌধুরীর প্রসঙ্গে একটি বাক্যও নয়। চিঠিখানা খামে ভরে রাখতে গিয়ে হাতে ঠেকল এক টুকরা কাগজ। বার করে অবাক হতে হয় কৃশানুকে। লিখছে স্বাহা—দাদার খাম খুলে এই কাগজটা ভরে দিলাম। দাদার চিঠি পড়েছি। বোধ হয় ঠিকই ওষুধ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। অবশ্য এখন আর বোধ হয় তার প্রয়োজন ছিল না।

তোমাকে একটা কথা না বলে যেতে পারছি না। টাইগার হিলে জীবনের শেষ সূর্যোদয় দেখতে যাচ্ছি।

ভয়ানক বাঁচতে ইচ্ছে করছে কৃশানু! অথচ মরতে আমি রাজি

হয়েছিলাম। কাল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম চৌধুরীকে। কিন্তু আজকের সারা দিনটায় এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটল যাতে মরতে এখন আর ইচ্ছা করছে না। চৌধুরীকে অনুনয়-বিনয় করা বৃথা। মরতে এখন আমাকে হবেই। কেন কথা দিয়েছিলাম ওকে ?

কাল পর্যন্ত ধারণা ছিল ব্যর্থ আমার এ নারী জীবন ; কিন্তু আজ তো সে ধারণাটা নেই—আজ মনে হচ্ছে হয়তো তুমি আমাকে বাঁচাতে পারতে। চৌধুরী যে আমাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করছে এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে আমার হাতে। সেটা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা চলত। আবার মানুষ হয়ে উঠতে পারতাম তাহলে। যে অদ্ভুত একটা জীবনের স্বপ্ন দেখতাম একদিন ফুলেশ্বরীর বকলমে চিঠি লিখতে লিখতে, সে স্বপ্নটা বাস্তবরূপ নিত হয়তো। কিন্তু তা হবার নয়। তুমি দুর্বল। চৌধুরীর সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা নেই তোমার। ট্রিগার টানার পরে হাহুতাস করার আর কোন অর্থ হয় না। অব্যর্থ লক্ষ্যে গিয়ে লাগবে সেই বুলেট।

জানি, দুর্ঘটনা একটা ঘটবেই আজ। আর সেই দুর্ঘটনায় আমিই মারা যাব, অদ্ভুতভাবে বেঁচে যাবেন আমার স্বামী, আমার সম্পত্তির ওয়ারিশান হয়ে। ধূর্ত সন্ধানী জাত-ক্রিমিনাল সে। দুর্ঘটনাটা নিশ্চয়ই এমনভাবে সাজাবে যাতে কোন সন্দেহ উদ্রেক না করে। কিন্তু আমাকে সে চেনে না। তার উপর চরম প্রতিশোধ নিতেই এ চিঠি লিখে গেলাম। তুমি দুর্বল নিউরটিক রোগী—পাহাড়ে উঠতে পারবে না। পারবে না আমাকে খাদের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু আমার মৃত্যুর পরে এ চিঠি পুলিসের হাতে পৌঁছে দেবার মত সাহস নিশ্চয়ই হবে তোমার।

কিন্তু সত্যিই এমন শোচনীয় মৃত্যু ছাড়া আমার কি আর কোন মুক্তির পথ নেই কৃশানু ?

চিঠির শেষে বাংলায় আর ইংরাজিতে দুটো সই করেছে স্বাহা !

চিঠিখানা পকেটে ফেলে উঠে পড়ে কৃশানু। রিভলভারটা ভরে নিল পকেটে। সমস্ত রক্ত উঠেছে মাথায়। এ রকম উত্তেজনা জীবনে বোধ করেনি। না, সে দুর্বল নয়, নয় সে নিউরোটিক রোগী। খাদের মুখ থেকে সে ছিনিয়ে আনবে স্বাহাকে। সমস্ত মাংসপেশী কঠিন হয়ে ওঠে ওর, স্নায়ুতন্ত্রে বৈদ্যুতিক শিহরণ !

না, এত উত্তেজিত হয়ে ওঠা ঠিক নয়। মনে পড়ল ভবতারণ ঘোষালের উপদেশ। 'এ পথের প্রত্যেকটি যাত্রীকে হতে হবে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের মত—দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ!' ধীর স্থির মস্তিষ্কে লক্ষ্যে পৌছতে হবে তাকে। উত্তেজিত হয়ে একটি মাত্র ভ্রান্ত পদক্ষেপের অর্থ শুধু তার মৃত্যু নয়, তার প্রিয়তমারও!

বাহাদুরকে ডাকে। গ্যারেজের তালাটা ভাঙতে হবে। তার প্রয়োজন হল না। বাহাদুরের কাছে চাবি পাওয়া গেল। গ্যারেজের এবং গাড়িরও। স্বাহা রেখে গেছে নাকি! স্বাহা? সে কি ক্ষীণতম একটি আশা নিয়ে গেছে তাহলে? তাই কি সে চাবিটা রেখে গেছে? তাই কি পত্রশেষে মৃত্যু ছাড়াও মুক্তিপথের ইঙ্গিত দিয়েছে! নিঃশ্বাস ঘন হয় কৃশানুর।

বৃষ্টি হয়েছে সারারাত। এখনও হচ্ছে। সূর্যোদয় দেখা যাবে না আজ। তা জেনেই সস্ত্রীক রওনা হয়েছে চৌধুরী। এটাও একটা প্রমাণ। সম্ভবত এই দুঃসাহসী দম্পত্তি ছাড়া আর কেউ এই মেঘে ঢাকা দুর্যোগরাত্রে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাবে না। চৌধুরী এই নির্জনতার সুযোগ নিতে চায়। লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। একচক্ষু হরিণের মতই খেয়াল করেনি সে, যে তাকে একদিন জবাব দিতে হবে পাবলিক প্রসিকিউটারের সেই সঙ্গত প্রশ্নটির, মেঘে ঢাকা অমন দুর্যোগ রাত্রিটিকেই কেন বেছে নিলেন আপনি, টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাবার জন্যে?

ঘড়িতে দেখে তিনটে পাঁচ। থানায় যাবে নাকি একবার? জগদীশকে ডেকে নেবে? তাতে কেসটা আরও জোরালো হয় বটে, কিন্তু দুর্ঘটনা যদি তার আগেই ঘটে যায়? একটি মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। এ গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে তো? নিশ্চয় যাবে। সখের প্রমোদভ্রমণের পক্ষে হয়তো এ গাড়ি নিয়ে টাইগার হিলে ওঠা চলে না, কিন্তু মৃত্যুর মুখ থেকে স্বাহাকে ছিনিয়ে আনবার শেষ অস্ত্র হিসাবে নিশ্চয় হাতিয়ারটা যথেষ্ট।

প্রায় দু ঘণ্টা পরে গাড়িখানা এসে পৌছাল টাইগার হিলের উপরে ডাকবাংলোর গায়ে। সানরাইজ-পয়েণ্ট থেকে শ' দুয়েক ফুট নীচুতে। সমুদ্রতল থেকে প্রায় দশ হাজার ফুট উপরে উঠে এসেছে কৃশানু। মাটিতে নেমে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস পড়ে এতক্ষণে। এই কর্দম-পিচ্ছিল পাহাড়ি রাস্তা পাড়ি দিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌছাল তাহলে! কিন্তু কেমন করে এটা সম্ভব

হল ? দাঁতে দাঁত চেপে ড্রাইভ করতে করতে এতক্ষণ ওর মনে পড়ছিল সেই অদ্ভুত রোগিণীটির কথা। আড়ামোড়া ভাঙতে গিয়ে যার হাত আটকে যায়। টানাটানি করে কেউ নাকি তার হাত নামাতে পারেনি। তারপর এক বিচক্ষণ প্রবীণ ডাক্তার এসে অদ্ভুত উপায়ে সারিয়ে দিলেন তার অসুখ। একঘর লোকের সামনে আচমকা টেনে খুলে ফেলতে চাইলেন তার লজ্জাবরণ। মর্মান্তিক প্রয়োজনে নেমে এসেছিল মেয়েটির হাত লজ্জানিবারণের ঐকান্তিক আকুলতায়। কৃশানুর অবস্থাও আজ ওই রকম। বরফ-জমা শীতের মধ্যেও গাড়ি থেকে নেমে মুছতে হল কপালের ঘাম। উত্তেজনার শ্রম-জল।

ডাকবাংলোর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটা জীপ। ওরা পৌঁছেছে তাহলে। ত্রিসীমানায় আর কোন গাড়ি নেই, লোকজনের চিহ্নও নেই। ঘড়ির দিকে আর একবার তাকায়, পাঁচটা বারো। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ডাকবাংলোর দিকে। বৃষ্টিটা থেমেছে অনেকক্ষণ। পূব আকাশটা একটু একটু করে ফর্সা হয়ে আসছে। ডাকবাংলোর ভিতরে আলো জ্বলছে একটা। মোমবাতির আলো। নিঃশব্দে ও এসে দাঁড়ায় দরজার সামনে। অর্ধেক কাঁচ, অর্ধেক কাঠের পাল্লা। ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরে একটা নেয়ারের খাটে অর্ধশায়িত চৌধুরী একটা সিগার টানছে কম্বলে আকণ্ঠ ঢেকে। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে স্বাহা। তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এ কী, এ তো স্বাহা নয়! স্বাহা এর তুলনায় দীর্ঘাঙ্গী। এ কি তবে সেই মেয়েটি ? দরজায় টোকা মারে কৃশানু।

ফুৎকারে নিভিয়ে দেয় চৌধুরী মোমবাতিটা। বলে, কে ?

দরজা খুলুন, দৃঢ়স্বরে বলে কৃশানু।

মেয়েটি এসে খুলে দেয় দরজা। পূর্ব আকাশটায় ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠছে। আবছা আলোয় গাছপালা জেগে উঠছে একে একে। চৌধুরী সেই আধো অন্ধকারের মধ্যেই বলে, কে আপনি ?

কৃশানু প্রতিপ্রশ্ন করে, স্বাহা কোথায় ?

চৌধুরী জবাব দেয় না। মোমবাতিটা জ্বেলে দেয় শুধু। আলো ফুটতে দেখে মেয়েটি প্রণাম করছে তাকে। বিস্ময়ের তখনও কিছুটা বাকী ছিল। সেটুকু শেষ হল সে মুখ তুলে তাকানোতে।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল কৃশানু।

ইভা!

ওর হাত ধরে আকর্ষণ করে ইভা, বলে, আসুন, ভিতরে এসে বসুন। বড্ড ঠাণ্ডা বাইরে।

দরজাটা বন্ধ করে দেয় আবার।

কৃশানু বসে পড়ে একটা চেয়ারে।

আমার স্বামী—যাঁর পুডিং-এ ভাগ বসিয়েছিলেন একদিন। আর ইনি হচ্ছেন সেই ভদ্রলোক যিনি আমাকে এই দার্জিলিঙ পাথরের মালাটা উপহার দিয়েছিলেন।—বুকের মালাছড়া মোমবাতির আলোয় তুলে দেখায় ইভা।

সুকান্ত চৌধুরী যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলেন, আপনিই কৃশানুবাবু? কী সৌভাগ্য। আপনার সম্বন্ধে অনেকদিন অনেক কথা শুনেছি আমার স্ত্রীর মুখে।

দাঁতে দাঁত চেপে কৃশানু বলে, কোন স্ত্রী?

নিখুঁত বিস্ময়ের অভিনয় করে চৌধুরী বলেন, মানে? স্ত্রী আমার একটিই, আপনার সামনে বসে আছেন।

আর স্বাহা দেবী? হিংস্র লাগছে কৃশানুকে।

চোখ দুটি বন্ধ করে চৌধুরী বলে, চিনতে পারলাম না তো। স্বাহা দেবী? কে তিনি?

দুরন্ত একটা ক্রোধে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে কৃশানুর অন্তঃকরণ। এই লম্পট বদমায়েশটার স্বরূপ এখনই সে প্রকাশ করে দেবে। তাতে যতই ব্যথা পাক না কেন ইভা। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়। বাধা দেয় ইভা। ওর হাত দুটি ধরে বসিয়ে দেয়, বলে, স্থির হোন আপনি।

সুকান্ত শুয়ে শুয়েই বলে, না না, বাধা দিও না। বলতে দাও ভদ্রলোককে। স্বাহা দেবীটি কে?

ইভা ধমক দেয় চৌধুরীকে, এনাফ অব দ্যাট। উনি আমার বন্ধু। বিপদে বন্ধু রক্ষা না করলে কে রক্ষা করবে ওঁকে?

ব্লাউজের ভিতর থেকে একখানা বন্ধ-খাম বার করে সে কৃশানুর হাতে দিয়ে বলে, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়, আপনি ততক্ষণ চিঠিখানা পড়তে থাকুন, আমি খাবারটা বার করি। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই সানরাইজ হবে।

ইভা টিফিনক্যারিয়ার খুলতে উঠে যায়। অলসভাবে সিগার টানতে থাকেন চৌধুরী। কৃশানু খামটা খুলে পড়তে থাকে চিঠিটা। স্বাহারই চিঠি।

'সবার আগে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। সত্যগোপনের অপরাধে অপরাধী আমি। কথাটা অনেক বার বলতে চেয়েছি, বলতে পারিনি। দাদা বলতে দেয়নি। নতুন জামাইকে ঠকানোর একটা চিরাচরিত প্রথা আছে, সেটা এমন কিছু নতুন নয়। সে ক্ষেত্রে নববধূর পক্ষে কোন তরফে যোগ দেওয়া উচিত বলা শক্ত। কিন্তু এটা তো সেই জামাই ঠকানোর মজার খেলা নয়, এ ছিল জীবনমরণের প্রশ্ন ; তোমার আমারও।

খুলেই বলি। তোমার বিশ্বাস তোমার কোন খবর আমি রাখতাম না। সেটা তোমার ভুল ধারণা। তোমার লেখা চিঠি ফেরত গেছে বটে কিন্তু তোমাব সব খবরই আমি রাখতাম। তুমি জান, মৃত্যুপণ করেছিলাম একদিন তোমাকে জয় করার জন্য। খবরের কাগজে তোমার এ্যাক্‌সিডেণ্টের সংবাদ পড়ে দাদা কলকাতা যান তোমার অফিসে খোঁজ নিতে। আমিই পাঠিয়ে ছিলাম। তোমার অসুখ এবং চিকিৎসাপদ্ধতির কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, ও ভাবে হবে না। ইভার সঙ্গে আমার পত্রালাপ ছিলই। ওরা পূজার ছুটিতে দার্জিলিঙে বেডাতে এল। আমরাও এখানে বেড়াতে এলাম। ইভার সঙ্গে মণিমালাদির আলাপ ছিলই। ওঁরাও তোমাকে চেনেন। একদিন আমাদের আসরে তোমার কথা উঠল। দাদা হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। প্রথমটা সকলে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলে তাঁর থিয়োরিটা মন দিয়ে শুনল। বিশ্বাস না হলেও তাঁর প্রস্তাবে সবাই একটা ট্রায়েল দিতে রাজি হল।

নাটকের নায়িকা যদিও আমি, কিন্তু অভিনয় আমরা কেউই মন্দ করিনি, কি বল? নেভের ভূমিকায় মিস্টার স্বকান্ত চৌধুরীর অভিনয় তো অনবদ্য। সহনায়কের মিষ্টিক চরিত্রে ডাক্তার অপরেশ মিত্রও কি কম যান? রঙ্গমঞ্চে না এসেও নেপথ্য থেকে অপূর্ব অভিনয় করেছে ইভা। আর সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন বোধ হয় এক সীনের এ্যাপিয়ারেন্সে দার্জিলিঙ থানার দারোগা জগদীশবাবু। নিজের টাইপরাইটারে নিজেই টাইপ করে পাটনা অফিসের চিঠিখানা দাখিল করে রহস্যকে আরও গাঢ করে তুললেন তিনি। না হলে তুমি হয়তো ধরে ফেলতে আমাদের চালাকি। তবু আমি বলব সবার চেয়ে ভালো অভিনয় করেছ হিরোর রোলে তুমি। তবে দুঃখের বিষয়, তোমার ধারণা ছিল একটা ক্রাইমড্রামার গোয়েন্দার চরিত্র তোমার, আসলে বুঝতে পারনি নাটকটা একটা প্রহসনমাত্র!

কী যা তা বকছি! আবার মাপ চাইছি। ঠাট্টা নয় কৃশানু, প্রহসন এটা নয়। আবার বলছি, এ ছিল আমাদের জীবনমরণের প্রশ্ন। দেখলাম দাদার ভবিষ্যদ্বাণী কেমন তিল তিল করে ফলল। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলে তুমি। পাহাড়ে উঠতে শিখলে, নামতে শিখলে—প্রথমে হাত ধরে, পরে হাত ছেড়ে। মিথ্যা রহস্যের এ কুহক না থাকলে স্বেচ্ছায় তুমি কখনও এ সব করতে না। পারতে না। আজ পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে তুমি একেবারে রোগমুক্তির পরিচয় দিয়েছ। নার্ভাস নিউরটিক রুগী তো দূরের কথা, সুস্থ সবল একজন সাধারণ ড্রাইভার এ ভাবে আজ টাইগার হিল জয় করতে পারত না!

আজ বুঝেছি কত বড় দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক আমার দাদা। তার সামনে আমরা টুপি খুলতে বাধ্য।

একটি মাত্র দৃশ্যে অবশ্য নাট্যকারের অজান্তে মৌলিক অভিনয় করেছিলাম আমি। না, ভুল বললাম। বিশ্বাস কর কৃশানু সেটুকু আমার অভিনয় নয়।

তোমার জন্যে পাহাড়ের মাথায় অপেক্ষা করছি। আর প্রতীক্ষা তো করছি সারাজীবনই। উঠে এস আমার সমতলে। দুজনে এক সঙ্গে প্রণাম করব প্রভাতসূর্যকে।

নিন, খাবারটা খেয়ে নিন।

এক প্লেট সন্দেশ আর একগ্লাস জল। হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে ইভা, যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকত সে এককালে জোড়া হাতি আঁকা শান্তি-নিকেতনী পর্দাটা সরিয়ে। এতক্ষণে লক্ষ্য হল কৃশানুর, ইভার পরিধানে একটি চাঁপা রঙের শাড়ি, গায়ে ডিপকাট লাল ব্লাউজ।

হেসে ফেললে কৃশানু। না কি কেঁদেই ফেললে সে? বোকার মত বলে, এখন নয়। ওপর থেকে ঘুরে আসি একবার।

দ্যাটস ইট! লাফিয়ে ওঠে সুকান্ত। আমার দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎটা আগে সেরে আসুন। আয়াম সরি। তৃতীয় পক্ষ! মাঝের একপক্ষ তো আবার আত্মহত্যা করে বসে আছেন! মনেও থাকে না সব সময়। কী নাটকই লিখেছিলেন ডক্টর মিত্র!

ইভা ধমক দেয়, কেন আর অপ্রস্তুত করছ ভদ্রলোককে। না মাস্টারমশাই, আমারই ভুল হয়েছে। সন্দেশের চেয়েও যা মিষ্টি লাগবে তেমন কিছু বরং

খেয়ে আসুন উপরে গিয়ে। তবে বেসামাল হয়ে পড়বেন না যেন। আমরাও এখুনি উপরে উঠব। সূর্যোদয় হবে এইবার।

কৃশানু পা বাড়ায়। লাফ দিয়ে উঠে আসেন সুকান্তবাবু, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার কথাটা শুনে নিই। বলি হ্যাঁ মশাই, আমাকে ক্ষমা করে গেলেন তো?

কৃশানু কথা খুঁজে পায় না। দু হাতে চেপে ধরে স্পোর্টসম্যান সুকান্ত চৌধুরীর সবল বলিষ্ঠ হাত। একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দেয়। তার মধ্যেই বোঝা যায় ওর অন্তরের কথা।

ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ডাকবাংলো থেকে আরও শ দুয়েক ফুট উঁচুতে সানরাইজ পয়েন্ট। যেখান থেকে সূর্যোদয় দেখবার জন্য ছুটে আসে সারা বিশ্বের লোক। ছোট একটা ঘর আছে উপরে, আর খানকয় কাঠের বেঞ্চি। আজ এই বৃষ্টিঝরা সকালে স্থানটা নির্জন। শুধু ফর্সা হয়ে আসা পূব আকাশের পশ্চাৎপটে দেখা যায় কুয়াশায় ঢাকা কালো ফার-কোটে ঢাকা একটি মেয়ের সিলুয়েট।

পাহাড়ী ছাগলের মত লাফ দিতে দিতে উঠতে থাকে কৃশানু। আজ যেন নবজন্ম হল তার। ঐ মেয়েটির সঙ্গে আজ সে যুগলে প্রণাম করবে এই নবজীবনের প্রথম উদয়ভানুকে।

সমাপ্ত